

মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর উপর আরোপিত

ভুলগুলো কি আসলেই ভুল !!!

আল-জাদ্দু পাবলিকেশন্স
বাউনিয়া, তুরাগ, ঢাকা।

কিতাবের নাম

ঃ মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর উপর আরোপিত
ভুলগুলো কি আসলেই ভুল !!!

সম্পাদনা ও নজরে সানি ঃ

আল্ হামদু লিল্লাহ, বিপুল সংখ্যক হযরত ওলামায়ে
কেরাম ও মুবাল্লিগিন হযরতগণ আমাদের এই কিতাবটির
সম্পাদনা করে সহযোগিতা করেছেন এবং কষ্ট করে অনেক
হযরতগণ নজরে সানি করে পরিমার্জিতও করেছেন। আমরা সবার
কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সবার নাম এখানে উল্লেখ করা
সম্ভব নয়। অল্প কয়েকজন হযরতের তা'আরুফ পেশ করছি।

১. হযরত মাওলানা মুফতি আতাউর রহমান সাহেব (দাঃবাঃ),
প্রায় ৫০ টি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক,
মুহতামিম, মাদ্রাসায়ে মুঈনুল ইসলাম, বারিধারা, ঢাকা।
২. হযরত মাওলানা মুফতি সাইফুল্লাহ সাহেব বিন্দুরি (দাঃবাঃ),
সাবেক শিক্ষক, মাদ্রাসায়ে উলূমে দ্বীনিয়া, কাকরাইল, ঢাকা।
৩. হযরত মাওলানা মুফতি মোঃ শামছুদ্দীন সাহেব (দাঃবাঃ),
মুহাদিস, জামিআ মুহাম্মাদিয়া হুসাইনিয়া (দশতলা),
মোগরখাল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
সাবেক মুহাদিস, ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বাইতুস সালাম
মাদ্রাসা, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।
৪. হযরত মাওলানা মুফতি মীযানুর রহমান সাহেব (দাঃবাঃ),
মুহতামিম, দারুল উলূম হাক্কানিয়া, উত্তরখান, ঢাকা।
মুহতামিম, দারুল উলূম গাজীবাড়ী, আশুলিয়া, ঢাকা।
মুফতি, মারকায়ু বাহসিল ইলমি, মাদারবাড়ী, উত্তরখান, ঢাকা।
৫. আলহাজ্জ হাফেয মাওলানা মুফতী ফয়সাল হোসাইন (দাঃবাঃ)
প্রতিষ্ঠাতা ও মুহতামিম, আল- কাউসার তাহফীজুল কুরআন
মাদ্রাসা, পাগাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর।
সিনিয়র খতিব, বাইতুন নূর জামে মসজিদ, টেকপাড়া, টঙ্গী,
গাজীপুর।
সভাপতি, মরিচালা খামার বাজার আস-সুফফা নুরানী হাফিজিয়া
মাদ্রাসা, গৌরিপুর, ময়মনসিংহ।
উপদেষ্টা, আল-জামিয়াতুস সুফফা আল-ইসলামিয়া, পাগাড়া, টঙ্গী,
গাজীপুর।
উপদেষ্টা, বিস্মিল্লাহ নুরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা, পাগাড়া, টঙ্গী,
গাজীপুর।

৬. হযরত হাফেজ মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব (দাঃবাঃ),
খতিব, হালিশহর শাহী জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, দারুল কুরআন আল-ইসলামিয়া,
লালখান বাজার, খুলশী, চট্টগ্রাম।
৭. হযরত মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব (দাঃবাঃ),
মুহাদ্দিস, আল-মাদ্রাসাতু মুঈনুল ইসলাম, ঢাকা।
৮. হযরত হাফেজ মাওঃ সিরাজুল ইসলাম সাহেব খুলনবি (দাঃবাঃ)
মুহতামিম, মাদ্রাসায়ে মদিনাতুল উলূম, বাউনিয়া, তুরাগ, ঢাকা।
৯. হযরত হাফেজ মাওলানা মুফতি মাসউদুল কারিম সাহেব (দাঃবাঃ)
মুহাদ্দিস, মাদ্রাসায়ে মুঈনুল ইসলাম, বারিধারা, ঢাকা।
১০. হযরত মাওলানা জাকির হুসাইন সাহেব (দাঃবাঃ),
মুহতামিম, মাদ্রাসায়ে আয়েশা, পাবনা।
১১. হাফেজ মাওলানা মুফতি আসাদুল্লাহ সাহেব (দাঃবাঃ)
মুহতামিম, মাদ্রাসায়ে হেরা, মুন্সিগঞ্জ।
খতিব, কালেক্টরেট জামে মসজিদ, মুন্সিগঞ্জ।
১২. হযরত মাওলানা আবুল হাসান সাহেব (দাঃবাঃ)
মুহতামিম, পাইকপাড়া মারকাযুস সুন্নাহ, পাইকপাড়া, তাড়াহিল,
কিশোরগঞ্জ।
১৩. হযরত মাওলানা মুআজ বিন নূর সাহেব (দাঃবাঃ)
শিক্ষক, তাফসির বিভাগ, মারকাযুল কুরআন মাদ্রাসা, রোড-২১,
সেক্টর-৫, উত্তরা, ঢাকা।
১৪. হযরত মাওলানা জাবের আহমদ
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, বাউনিয়া, তুরাগ, ঢাকা।
১৫. প্রিন্সিপাল মোঃ আব্দুল হান্নান সাহেব
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, দারুল ইসলাম মাদ্রাসা,
হাউজ-১০, রোড-৩ ডি, সেক্টর-৯, উত্তরা, ঢাকা।
১৫. জনাব মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ সাহেব,
সভাপতি, রওজাতুল উলূম মাদ্রাসা, পরাণ মন্ডলের টেক, বড়
দেওড়া, গাজিপুর।

১৬. জনাব মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ সাহেব
সভাপতি, রওজাতুল উলূম মাদ্রাসা, পরাণ মন্ডলের টেক, বড়
দেওড়া, গাজিপুর।

১৭. ডক্টর মুহাম্মাদ শহিদুল ইসলাম
এসোসিয়েট প্রফেসর এবং হেড অব দ্যা ডিপার্টমেন্ট,
বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন, বি.জি.এম.ই.এ।

১৮. জনাব প্রকৌশলি খন্দকার হুমায়ূন কবির সাহেব
প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকাশণায়

ঃ জনাব মসিউর রহমান সাহেব।
সম্পাদক, আল-জাদু পাবলিকেশন্স,
বাউনিয়া, তুরাগ, ঢাকা।
মোবাঃ +৮৮০১৭১৫৮১৯০৬৩
mushiur226@yahoo.com
sales@iristcl-marine.com

প্রাপ্তিস্থান :

ঃ ১. আল- জাদু পাবলিকেশন্স,
৩৫, বাউনিয়া, তুরাগ, ঢাকা।
মোবাঃ+8801678200251 (WhatsApp for softcopy)

২. হাসান স্টোর, শান্তিনগর বাজার মসজিদ, ঢাকা।
৩. ঢাকা মিরপুর-৬, ডি ব্লক, মারকায মসজিদের সামনের
দোকান।

প্রকাশকাল

ঃ মে, ২০১৮ ইসায়ী।

সত্ব

ঃ সংরক্ষিত।

প্রাইজ

ঃ ৬৫ টাকা

আমাদের এই কিতাবটি পড়ে কারো কোনো পরামর্শ অথবা সুন্দর ও পরিমার্জিত করণমূলক কোনো
বক্তব্য কিংবা কোনো মন্তব্য থাকলে আমাদের ঠিকানায় যোগাযোগ করলে আমরা বেশ খুশি হতাম। বিশেষ
করে কোনো ওলামা হযরতের সুচিন্তিত কোনো মতামত, পরামর্শ কিংবা সংশোধনি থাকলে আমাদেরকে
জানাতে আমরা বেশ উপকৃত হবো এবং দ্বিতীয় সংস্করণে শুধরানোর ফিকির করবো।

আরজগুজার
মুহাম্মাদ মসিউর রহমান
সম্পাদক, আল-জাদু পাবলিকেশন্স,
বাউনিয়া, তুরাগ, ঢাকা।

সূচীপত্র :

সংখ্যা ও নাম

পৃষ্ঠা

অভিমতসমূহ	
১. অবতরনিকা.....	
২. প্রথম পরিচ্ছেদ.....	
৩. ভোটের চেয়ে নামাযের গুরুত্ব বেশি.....	
৪. দলিলভিত্তিক তাফসির তাফসির বির রায় নয়.....	
৫. ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল ব্যবহার প্রসঙ্গ.....	
৬. মোবাইলে কুরআন শরিফ পড়া প্রসঙ্গ.....	
৭. ইলমের বিনিময় প্রসঙ্গে উমর রাদি. এর উক্তি.....	
৮. যাকাত প্রদানের হকদার কারা.....	
৯. পূর্ণ বাইয়াত প্রসঙ্গ.....	
১০. তিন প্রকার সুন্নাত প্রসঙ্গ.....	
১১. দাওয়াত ও তাসাউফ.....	
১২. তাশকিল, তারগিব ও তারতিব প্রসঙ্গ.....	
১৩. দাওয়াতের কারণে ঈশার নামায বিলম্ব করা প্রসঙ্গ.....	
১৪. ইউসুফ আ. এর অতিরিক্ত বছর জেলে থাকা প্রসঙ্গ	
১৫. বনি ইসরাইলের ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার উম্মত বিদ্রান্ত হওয়া	
১৬. যাকারিয়া আ. এর ঘটনা.....	
১৭. মাওলানা ইলিয়াস ও ইউসুফ রহ. এর মালফূজাত পড়ার গুরুত্ব.....	
১৮. মুযিজা প্রসঙ্গে আলোচনা.....	
১৯. মূসা আ. কওমকে ছেড়ে তুরা করা প্রসঙ্গ.....	
২০. হারুন আ. কে স্থলাবিষিক্ত বানানো প্রসঙ্গ.....	
২১. আল্লাহ আল্লাহ যিকির প্রসঙ্গ.....	
২২. তাবলিগের কাজ নবীওয়ালা কাজ.....	
২৩. মাদ্রাসার উস্তাদদের আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া.....	
২৪. তালিম ও গাশত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়া.....	
২৫. সাহাবিদের ইখতিলাফ.....	
২৬. হিদায়াত আল্লাহ তা'আলার হাতে.....	
২৭. কুরআন শরিফ বুঝে শুনে তিলাওয়াত করা.....	
২৮. খুরুজ না হওয়া বড় গুনাহ.....	
২৯. যিকিরের আসল অর্থ আল্লাহর আলোচনা করা.....	
৩০. স্বশরিরে গিয়ে দাওয়াত দেওয়া	
৩১. আযান আগে, নামায পরে	
৩২. খুরুজ তাওবার পূর্ণতার শর্ত.....	
৩৩. খারিজি লুকমা গ্রহণযোগ্য নয়.....	
৩৪. আসহাবে কাহাফের বাঘ.....	
৩৫. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ.....	
৩৬. তাবলিগ না করে জান্নাতে যাওয়া.....	
৩৭. ফরজ নামাযের পর হাত উঠিয়ে দুআ না করা	
৩৮. মাশওয়ারার জন্য মসজিদে আসা	

৩৯. ইন্তেযামি বিষয়ে মাশওয়ারা.....
৪০. আমীর না মানা প্রসঙ্গ.....
৪১. আমীরত্ব ছেড়ে গুরা মানা.....
৪২. তাকবিরে ইন্তেকালি.....
৪৩. এই রাস্তায় সবকিছু আছে.....
৪৪. মাসনুন তাসবিহাতের ইহতেমাম.....
৪৫. কিয়ামত পর্যন্ত মারকায.....
৪৬. হেদায়াত পাওয়ার জায়গা মসজিদ.....
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ :
৪৭. একটি ফাতুয়া ও তার পর্যালোচনা.....
- চতুর্থ পরিচ্ছেদ : যে অভিযোগগুলো মূলত মালফূজ(বাণী) হতে পারে।
৪৮. গোপনে গুনাহ নির্লজ্জতা
৪৯. রেওয়াজি তরিকায় দাওয়াত.....
৫০. দাওয়াত ও ইবাদতকে জমা করা.....
৫১. ইসলামি তাআল্লুক দাওয়াতের সাথে.....
৫২. ছয় নম্বর পুরা দ্বীন.....
৫৩. তাবলিগে বের হওয়া ইবাদতে মাকসূদা.....
৫৪. মারকায থেকে আলাদা হওয়া.....
৫৫. দাওয়াতকে উঁচু ছাত থেকে নিচে নামানো.....
৫৬. দায়ী দ্বীনের নুসরতকারী.....
৫৭. রমজানের রোযা ভাঙ্গা.....
৫৮. নিজামুদ্দিন মারকাযের ইহতেমাম.....
৫৯. আমল নিয়ে দাওয়াত দেওয়া আইনি সুনাত.....
৬০. আলমি মারকায ও আলমি মাশওয়ারা ভিন্ন নয়.....
৬১. কিসরার হুকুমত টুকরা টুকরা হওয়া.....
৬২. আমীরের সামনে গুরার অবস্থান.....
৬৩. খুরুজ ব্যতীত দাওয়াত অকল্পনীয়.....
৬৪. সফলতা আসবাবে নয় হুকুম পুরা করার মধ্যে.....
- পঞ্চম পরিচ্ছেদ :
৬৭. মুসলিম জামাত ও ইমারত.....
৬৮. শিক্ষাস্পন্দ চমৎকার সাক্ষাৎকার.....
৬৯. বিজ্ঞজনদের মতে আমাদের ৩ টি করণী.....

প্রায় ৫০ টি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, আল- মাদ্রাসাতু মুঈনুল ইসলাম, পূর্ব
বারিধারা, ঢাকা এর মুহতামিম ও মুহাদিস হযরত মাওলানা মুফতি আতাউর রহমান
সাহেব (দাঃবাঃ) এর অভিমতঃ

“মুহতারাম মাওলানা সা’আদ সাহেব (দাঃবাঃ) এর উপর আরোপিত ভুলগুলো কি আসলই ভুল!!!” নামক বইখানার পাণ্ডুলিপি দেখার সুযোগ হয়েছে। সংকলনকারীদের লেখনি থেকে প্রমাণ হয় যে, তাঁরা বাস্তব ও সত্য বিষয়টাকে ফুটিয়ে তুলতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। আশা করি, এই বইখানার দ্বারা ‘দাওয়াত ও তাবিলেগ’ এর বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে ধুমুজাল বা ঘোলাটে পরিবেশ তৈরি হয়েছে তা খুব ভালোভাবেই পরিস্কার হয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহ। যাদের মধ্যে হক কবুল করার যোগ্যতা সামান্য পরিমাণও বিদ্যমান তাঁরা তার দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হবেন এবং হককে বুঝে সঠিক পথে পরিচালিত হবেন বলে আশা করা যায়, (তবে নসীব বা তাকদীরের ব্যাপার ভিন্ন)। আল্লাহ তা’আলা এই বইখানাকে কবুল করুন এবং আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন, আমীন।

বান্দা

মোঃ আতাউর রহমান

১৪-০৪-২০১৮ ঈসায়ী

মাদ্রাসায়ে উলূমে দ্বীনীয়া, কাকরাইল, ঢাকা এর সাবেক শিক্ষক হযরত হাফেজ
মাওলানা সাইফুল্লাহ সাহেব বিননুরী (দাঃবাঃ) এর
অভিমতঃ

হাদিস শরিফে আছে, “মিথ্যাবাদি হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, যা শুনে তাই বলে।” বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় একটি সংক্ষিপ্ত সফরে এই দৃশ্য নজরে আসে যে, আমাদের কিছু সাথী ভাইয়েরা এই হাদিসের লক্ষবস্তু বনে গেছেন। মাওলানা সা’আদ সাহেব সম্পর্কে এমন কিছু বিভ্রান্তিকর মিথ্যা তথ্য সাথীদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে, যা মাওলানা সা’আদ সাহেব বনেননি। বরং তাঁর কথাগুলো বিকৃত করে প্রকাশ করা হচ্ছে। এই বিভ্রান্তিকর বিকৃত কথাগুলোর বুনিয়াদ তালাশ করতে গিয়ে হঠাৎ একটি চটি বই নজরে পড়লো, যার লেখক বাংলাদেশের একটি স্বনাম ধন্য মাদ্রাসার একজন শাইখুল হাদিস। তখনই খেয়াল জাগলো, বিশ্বব্যাপী প্রশিদ্ধ একজন দায়ী, মুবাল্লিগ ও আলেম মাওলানা সা’আদ সাহেবকে মিথ্যা ও বিকৃত কথার দ্বারা যে ব্যক্তি অপমান ও অপদস্থ করেছে তাকে অবশ্যই সতর্ক করা দরকার এবং জনগণের বিভ্রান্তি নিরসন করা দরকার। সেই মুহূর্তেই কিছু ওলামায়ে কেরামদের সংকলিত একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি নজরে পড়লো যার নাম “মুহতারাম মাওলানা সা’আদ (দাঃবাঃ) এর উপর আরোপিত ভুলগুলো কি আসলই ভুল!!!”। পাণ্ডুলিপিটি পড়ে খুবই খুশী হলাম। কেননা, বর্তমানে বিশ্বে সবচে’ বড় মাজলুম (অত্যাচারিত) ব্যক্তি হলেন মাওলানা সা’আদ সাহেব। তাঁকে বিভিন্নভাবে অপবাদ দিয়ে লাঞ্চিত করা হচ্ছে। এই বইটি মাজলুমের সাহায্যকারী হিসাবে গণ্য হবে বলে মনে করি।

চটি বইয়ে অভিযোগকারীর উপস্থাপিত কথাগুলি মাওলানা সা’আদ সাহেবেরই কথা এবং তিনি এইভাবেই বলেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। যদি বলে থাকেন তার ব্যাখ্যা কী সেই ব্যাপারেই কুরআন, হাদিস, সাহাবায়ে কেরাম ও আসলাফগণের বর্ণনার দ্বারা বক্ষমান বইটি সংকলন করা হয়েছে। আমি মনে করি যারা

মাওলানা “সা’আদ সাহেবের আসল রূপ” চটি বইটে পড়ে বিভ্রান্ত হয়েছে তাদের সকলের উচিত এই বইটি পড়ে মাওলানা সা’আদ সাহেবের ব্যাপারে যে বদগুমানি পয়দা হয়েছে তা দূর করা।

উল্লেখ্য যে, দারুল উলম দেওবন্দের পক্ষ থেকে যে ভুলগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে তিনি রুজু করেছেন। অর্থাৎ সে কথাগুলি তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং ভুল স্বীকার করেছেন। বর্তমানে মাওলানা সা’আদ সাহেবের যে কথাগুলির ব্যাপারে অপপ্রচার হচ্ছে ওই কথাগুলো তিনি রুজু (প্রত্যাহার) করার পর আর বলেননি। তাই সাথী ভাইদের নিকট বিনীত নিবেদন, প্রত্যাহারকৃত কথাগুলি পুনঃপ্রচার করে নিজেরা গুনাহগার হবেন না এবং অন্যকেও গুনাহগার করবেন না।

বান্দা

মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
১৫-০৪-২০১৮ ঈসায়ী

আল-মাদ্রাসাতু মুঈনুল ইসলাম, ঢাকা এর মুহাদ্দিস, হযরত মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব (দাঃবাঃ) এর অভিমতঃ

الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد

ওলামায়ে কেরাম কর্তৃক সংকলিত “মুহতারাম মাওলানা সা’আদ (দাঃবাঃ) এর উপর আরোপিত ভুলগুলো কি আসলই ভুল!!!” নামক প্রামাণিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখে মনে হলো এই গ্রন্থটি বর্তমানে দাওয়াত ও তাবলিগের চলমান সংকট অবসান কল্পে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

‘ইখতিলাফ’ প্রশংসনীয় ও রহমত সরূপ যত্নস্বর্ণ তা ‘জিদাল’ এর রূপ না নেয়। ‘জিদাল’ও অবশ্যাবী নয়। কারণ, তাগুতি শক্তি কখনোই বসে থাকে না। হক্ পন্থীদের মাঝে ‘জিদাল’ ও ‘কিতাল’ হতে পারে। কুরআনে পাকেও এই বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে।

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

হক্ পন্থীদের মধ্যেও যে ‘জিদাল’, এমনকি ‘কিতাল’ও হতে পারে তা কুরআনে পাক দ্বারা স্বীকৃত। সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর যুগেও ‘যঙ্গে সিফ্যীন’ ও ‘যঙ্গে জামাল’ সংঘটিত হয়। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আবাদি ও স্থায়ী সম্ভষ্টির ফায়সালা থাকা সত্ত্বেও। এ জাতীয় ঘটনা উম্মতের খাইরুল কুরান থেকে গুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত ঘটতে থাকবে। এই জন্যেই তো ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. আইম্মায়ে কেরাম ও ওলামায়ে কেরামের ইজতেহাদি খাতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখা উম্মতের জন্য জরুরী মনে করে

رفع الملام عن أئمة الأعلام নামক কিতাব লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সর্বশেষ হযরত শাইখুল হাদিস যাকারিয়া রহ. পাক-ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনে উভয় পক্ষের ওলামায়ে কেরাম সম্পর্কে উম্মতকে সংযত হয়ে চলার জন্য الإعتدال في مراتب الرجال নামক কিতাবখানা উপহার দেন। যাই হোক, আলোচ্য কিতাবখানা কমপক্ষে তাওয়াক্কুফ (চুপ থাকা) অবলম্বনে সহযোগি হোক এই দুআ করি।

দাওয়াত ও তাবলিগের বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে ওলামায়ে কেরামগণের প্রামাণিক এই কিতাবখানা সংকট নিরসনে সহায়ক হবে বলে মনে করি। উভয় পক্ষকে ধর্য ও সংযমের পরিচয় দেওয়া সময়ের দাবি। কোনো ক্রমেই সীমা লঙ্গন অনাকঙ্কিত। আল্লাহ পাক সবাইকে কবুল করুন, আমীন।

বিনীত

মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক।

১৫-০৪-২০১৮ ঈসায়ী।

আল- কাউসার তাহফীজুল কুরআন মাদ্রাসা, পাগাড়, টঙ্গী, গাজীপুর এর প্রতিষ্ঠাতা
ও মুহতামিম,

বাইতুন নূর জামে মসজিদ, টেকপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর এর সিনিয়র খতিব,
মরিচালা খামার বাজার আস-সুফফা নুরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা, গৌরিপুর,
ময়মনসিংহ এর সভাপতি,

আল-জামিয়াতুস সুফফা আল-ইসলামিয়া, পাগাড়, টঙ্গী, গাজীপুর, এর উপদেষ্টা,
বিস্মিল্লাহ নুরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা, পাগাড়, টঙ্গী, গাজীপুর এর উপদেষ্টা।

আলহাজ্ব হাফেয মাওলানা মুফতী ফয়সাল হোসাইন (দাঃবাঃ) এর

অভিমতঃ-

বর্তমানে কিছু লোক হজরতজী মাওলানা সা'দ সাহেবের ব্যাপারে উম্মতের মাঝে বিদ্বেষ ছড়াইতেছে যে, মাওলানা সা'আদ সাহেব মনগড়া বয়ান করেন। একজন তো উনার ২০ বছরের বয়ান থেকে ৪০ টি ভুল বের করেছেন। অথচ সেগুলো ভুল ছিল না বা মনগড়াও ছিল না। উনি যা বলেছেন তা কোনো নির্ভযোগ্য কিতাব অথবা মুত্তাকি মফতিগণের ফাতওয়া থেকে বলেছেন। “মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর উপর আরোপিত ভুলগুলো কি আসলই ভুল!!!” নামক কিতাবের পাণ্ডুলিপি মুতালাআ করে বুঝতে পারলাম হযরতজির সকল বয়ান ছিল দলিলভিত্তিক। আশা করি এই কিতাবখানা উম্মতের সঠিক পথে থাকার জরীয়া হবে। দুআ করি আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই কিতাবখানার রচনা ও সংকলন পরিষদের সদস্যদের জন্য, হে আল্লাহ, তুমি তাদেরকে জাযায়ে খাইর দান করুন। আমীন।

বান্দা

মুহাম্মাদ ফায়সাল হুসাইন

১৫-০৪-২০১৮ ঈসায়ী

অবতরনিকা

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لمن لا نحصى ثناء عليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

হযরত মাওলানা সা'আদ সাহেবকে আমরা বুঝেছিলাম এবং ওনাকে ভালো করে চিনেছিলাম ওনার নুরে ঝলমল করা বয়ান শুনে এবং বয়ানের আন্দায় দেখে। বর্তমান কালে সবচে' বড় মজমায় সবচে' বেশি বয়ান করণে-ওয়ালা যদি কোনো মর্দে মুজাহিদ পৃথিবীতে থেকে থাকেন ওনি হলেন শাইখুল হাদিস হাফেজ মাওলানা সা'আদ দামাত বারাকাতুহুম। কুরআন-হাদিসের নির্যাস এক কলব থেকে লাখো কলবে স্থানান্তরিত হতে দেখেছি ওনার প্রতিটি বয়ানে। আরব-আজম, সাদা-কালো, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, তথা পুরা আলমের শতধা বিভক্ত মুসলিম উম্মাহকে এক ফিকিরে, এক মেহনতে, এক জামাআতে, এক ইত্যাতে, সাহাবাদের জীবন-চরিতে, দ্বীনের মেহনতে, দাওয়াত এবং জিহাদে জান-মাল খরচের সাহাবাওয়ালা জযবায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি। হযুর সাব্বাহু আল্লাইহি ওয়া সাব্বাহুর কুরাইশ খান্দানের আবু বকর সিদ্দীক রা. এর সিদ্দিকী বংশধারার মাওলানা ইলিয়াস রহ. মাওলানা ইউসুফ রহ. মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. ও মাওলানা যোবায়ের হাসান রহ. এর উত্তরসূরী হিসেবে ওনাদের রেখে যাওয়া পথ ধরে, দিন-রাত, শীতে, গরমে, সারা বছর সবসময় মেহনত ও ফিকির করে যাচ্ছেন আব্বাহ তা'আলার এই বান্দা। দাওয়াত ও তাবলিগের তারতিবের ব্যাপারে, তালিম ও তরবিয়তের ব্যাপারে আব্বাহর নবী ও চার খলিফার আদর্শিক যুগকে সামনে নিয়ে চলার যে পবিত্র মেযাজ আমরা মুহতারাম মাওলানার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এবং সময়ের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা সকল রুসুম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার যে এক ঐশি শক্তি ওনার সংস্কার-মূলক বয়ান ও হিদায়াতের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, এসবকিছু আমাদের মনে করিয়ে দেয় আবু দাউদ শরিফসহ হাদিসের একাধিক কিতাবে উল্লেখিত সেই হাদিসটির কথা, যা আব্বাহর নবী থেকে হযরত আবু হুরাইরা রাদি. বর্ণনা করেছেন। নবী সাব্বাহু আল্লাইহি ওয়াসব্বাহাম বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

অর্থঃ নিশ্চয় আব্বাহ তা'আলা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক একশ' বছরের মাথায় এমন একজন ব্যক্তি প্রেরণ করেন যে ব্যক্তি উম্মতের জন্য দ্বীনকে সংস্কার করেন।

(আবু দাউদ-২/৫১২, মুস্তাদরাক লিল হাকিম-৮/১২৮)

মুজাদ্দিদে দ্বীন হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর শুরু করা এই মেহনতেরও প্রায় একশ বছর হতে চলেছে। সেই হিসাবে দ্বিতীয় নতুন শতাব্দির নতুন মুজাদ্দিদ মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ)কেই হয়তো আব্বাহ তা'আলা প্রকাশ করছেন।

এত সুন্দর, এত সুশৃংখলতা, এত মান্যতা এবং ভাই ভাই হয়ে চলা মেযাজের সাথে প্রায় এক শতাব্দি ধরে চলে আসছে সাহাবাদের এই হরকত-মুজাহাদা। হঠাৎ করে কি যেন কী হয়ে গেলো! লক্ষ লক্ষ আব্বাহওয়ালা ও মুত্তাকিদের কলব ভেঙ্গে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কী হতে চলেছে! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। একদল তো বুঝে, না বুঝে আম উম্মতের হিদায়েত নিয়ে খেলা করছে। আরেক দলের ব্যাপারে এতটুকু বলবো, যারা আম উম্মতের হেদায়াতের এই মেহনতে অন্যদের খেলার সুযোগ করে দিয়েছে তারা নিজেরাই অতি শীঘ্রই খেলার সামগ্রীতে পরিণত হবে। আর মুখলিছদের ব্যাপারে এ কথা অবশ্যই বলতে পারি যে,

জামাআতের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে, যে জামাআতের প্রতিটি মুসলমান আমিরের ইতায়াতের সূতায় গাঁথা রয়েছে।

কিছু দিন আগে মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (রাঃ) এর বয়ানের কিছু কথা নিয়ে এক মন্তব্যকারীর মন্তব্য সম্বলিত একটি 'চটি' বই পড়ে আমরা রীতিমত অবাক হয়ে যাই। বইটি পড়ে মিথ্যা ও অপবাদের ভয়ানক পরিণতির হাদিসের থেকে বেশি মনে পড়েছে তিরমিযি শরিফের ওই হাদিসটির কথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“তোমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টিজনক এমন কথা বলে ফেলে যাকে সে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। কিন্তু উক্ত কথার কারণে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তার প্রতি রাজি থাকার ফয়সালা করেন। অপরদিকে তোমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অসম্ভষ্টিজনক এমন কথা বলে ফেলে যাকে সে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। কিন্তু উক্ত কথার কারণে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তার প্রতি অসম্ভষ্টির ফয়সালা করেন।”

যাদের ভিতরে আল্লাহ তা'আলার ভয় থাকে তারা খুব সাবধানতা ও সতর্কতার সাথে কথা বলেন। কারো বিষয়ে কিংবা কোনো বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে হলে ওই ব্যক্তি ও বিষয়কে ভালো করে জানতে হয়, বুঝতে হয়, দীর্ঘ সময় সুহবতে থেকে উপলব্ধি করতে হয়। তারপর অত্যন্ত সচেতনতা ও যবানকে হিফাজত করার সাথে বলতে হয়। না জেনে, না বুঝে, না যাচাই করে কয়েকজনের মতবিরোধিতাকে ভিত্তি বানিয়ে এবং বর্তমান যামানার সবচে বড় দাজ্জাল এলেকট্রিক মিডিয়ার উপর ভরসা করে কারো বিষয়ে সঠিক কোনো মন্তব্য করা যায় না।

পরে দেখলাম, 'চটি' বইটি রচনা করেছেন বারিধারা মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক সাহেব। তাঁর নাম দেখে পুরাপুরি বুঝতে পারলাম, তাহকিকবিহীন চক্রান্তে আক্রান্ত কথা তাঁর কাছে পৌছেছে। চটি বইয়ে উনার দেওয়া রেফারেন্স হলো, মাওলানা সা'আদ সাহেবের কথা হিসেবে যা তিনি লিখেছেন সেগুলোর রেকর্ড দেওবন্দে সংরক্ষিত আছে। রেকর্ড, নেটিভিক মাধ্যম তাহকিকের মাধ্যম হতে পারে না। কারণ, এগুলোর মধ্যে কারসাজি করার অনেক সুযোগ রয়েছে। আমরা ফোনালাপে ওনার কাছে (ফোনালাপের রেকর্ড প্রকাশনিত পাওয়া যাবে) দেওবন্দের সংরক্ষিত সেই রেকর্ডগুলো চাইলে,

“ তাঁর কাছে না থাকার কথা বলেন এবং মিরপুরের মাও. শাহরিয়ার মাহমুদের কাছে অনেকটা আছে বলে জানান এবং মাও. শাহরিয়ারের নাম্বার তাঁর কাছে আছে, কিন্তু পরে ফোন করে নিতে বলেন। পরে ফোন করে মাও. শাহরিয়ারের নাম্বার চাওয়া হলে তাঁর কাছে নাম্বার নাই বলে জানান এবং বলেন, দেওবন্দের মুহতামিম মাও. আবুল কাশেম নোমানী ও মাও. শাহরিয়ার মাহমুদ উত্তরায় আছেন, কোন ইমামের মাধ্যমে তাঁদের কাছে সরাসরি পৌছে যান, রেকর্ড আমার কাছে নেই, আমার মোবাইলও সেরকম না, আমি দেওবন্দ থেকে লিখে এনেছি। মাও. উবাইদুল্লাহ সাহেবকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, প্রথমে আপনার পক্ষ থেকে ২৭টি ভুল সম্বলিত চটি বই ছেপেছিলেন, এখন ৩২টি ভুল সম্বলিত চটি বই দেখা যাচ্ছে। উত্তরে তিনি বলেন, এটা দ্বিতীয় সংস্করণ, ভুলতো আরো আছে।... আমরা আমাদের কাজ করেছি, আপনি মানলে মানেন, না মানলে নাই, আমাদের কি ক্ষতি হবে, এত লম্বা ফোনালাপের দরকার নাই (রাগত স্বরে)।”

এর থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এবং এই পবিত্র মেহনত হিংসাক্ততা ও চক্রান্তের শিকার। তাই আমাদের নিজেদের ফরিজা (অবশ্য কর্তব্য) মনে করলাম, উক্ত বইটির মধ্যে যাকিছু মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর কথা হিসাবে বলা হয়েছে, এসব যদি ওনার কথা হয়েই থাকে তাহলে ওনাকে আমরা যদুর জেনেছি ও বুঝেছি এবং ওনার সম্পর্কে তাহকিক করণে-ওয়ালা ওলামায়ে কেরামের বিশাল জামাতের কাছ থেকে যা জেনেছি এবং মাওলানার সুহবত থেকে যদুর উপলব্ধি করতে পেরেছি সেই অনুপাতে ওনার কথাগুলোর তাফসিল (বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং আসল কথা) হওয়া দরকার।

আমাদের এই গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য গ্রন্থের ভিতরস্থ সুস্পষ্ট হিংসা ও ক্রোধাক্ততায় রঞ্জিত অভিযোগগুলোর প্রচার-প্রসার নয়, বরং মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক সাহেবদের কাছে সঠিক তথ্যগুলো পেশ করা এবং যাদের হাতে এই বইটি গেছে তারাও যেন সঠিক তথ্য পায় সেই জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। সহজ সরল যে সব মুসলিম ভাইয়েরা তার এই বই পড়ে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আছে এবং হক, নাহক নিয়ে যে সব সাথীরা অস্থিরতায় সময় পার করছেন তাদের সামনেও বিষয়টি খুলে ধরা।

প্রথমে আমরা মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর কথাগুলো যেভাবে মন্তব্যকারী উল্লেখ করেছেন ঠিক সেভাবেই নকল করেছি। তারপর 'তাফসিল' এর অধীনে সেই কথাগুলোর ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। তারপর মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর কথাগুলোর উপর যে ভুল মন্তব্য দেওয়া হয়েছে সে মন্তব্যগুলো উল্লেখ করেছি। তারপর এই ভুল মন্তব্যের ভুলটা কী তা পরিস্কার করার জন্য 'মন্তব্যের জবাব' এর অধীনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেছি।

তারপর আরও কিছু অভিযোগ, মন্তব্য ও ফতুয়া যেগুলো বিভিন্ন কাগজপত্রের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, (যেগুলোর মধ্যে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্যাডে প্রকাশিত ফতুয়াও রয়েছে) সে বিষয়গুলোও পরিস্কার করা হয়েছে। কারণ, ফোনলাপে মাও. উবাইদুল্লাহ ফারুক সাহেব বলেছেন, মাওলানা সা'আদ সাহেবের আরও অনেক ভুল আছে।

সবশেষে 'মুসলিম জামাত ও ইমারত' বিষয়ে ছোট্ট একটি প্রবন্ধ অতি সংক্ষেপে আপনাদের কাছে পেশ করেছি। তারপর পাণ্ডুলিপি তৈরি করে সেটি এই কাজের হাকিকত জাননে-ওয়ালা অনেক বিজ্ঞ মুফতি ও মুহাদ্দিস সাহেবদের হাতে তুলে দেই। ওনারা আগাগোড়া সবটুকু পড়ে বইটির বিষয়বস্তুর উপর যখন সত্যায়ন করলেন তখন আমরা সাহস করলাম, ইনশা আল্লাহ, বইটি ছাপা হলে হয়তো কিছু সাথীর উপকার আসবে। কারো কারো কুয়াশার অন্ধকার কেটে যেতে পারে। বইটির নাম "মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর উপর আরোপিত ভুলগুলো কি আসলেই ভুল !!!" নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিশেষে এই মুহর্তে আল্লাহর কাছে কামনা করি, আল্লাহ, তুমি আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াসকে, আমাদের আমল তো পেশ করার মত নয়, তোমার ফজল ও করমে কবুল করে নাও। আমীন। আমাদের সাথে আমিন যারা বলবে, তাদেরকেও কবুল করে নাও।

মুহাম্মাদ মসিউর রহমান
(সম্পাদক, আল-জাদু পাবলিকেশন্স।)

১০ জমাদিউস সানি ১৪৩৯

তাং-২৭/০২/২০১৮

মঙ্গলবার

প্রথম পরিচ্ছেদ :

আল্লামা মন্জুর নোমানি রহ. লিখেছেন,

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলেছেন,

“আমার অবস্থান একজন সাধারণ মুমিনের চেয়ে উচু মনে করো না। শুধু আমার বলার উপর আমল করা বদ দ্বীনি। আমি যা কিছু বলি তাকে কুরআন ও সুন্নাহের উপর পেশ করে, স্বয়ং নিজে চিন্তা ফিকির করে নিজের যিম্মাদারিতে আমল করো। আমি তো শুধু পরামর্শ দিয়ে থাকি।

তিনি আরও বলেন,

“হযরত উমর রাদি. নিজের সাথীদের বলতেন, তোমরা আমার মাথার উপর বহুত বড় যিম্মাদারি ঢেলে দিয়েছো। তোমরা সবাই আমার আমলসমূহের নেগরানি করো।”

“আমারও আমার দোস্তোদের নিকট খুব তাকিদ ও কাকতি-মিনতির সাথে দরখাস্ত এইয়ে, তারা যেন আমার নেগরানি করে, যেখানে ভুল করি সেখানে টুকে দেয় এবং আমার ‘রুশ্দ’ (হেদায়াত ও সরল পথ) এবং ‘সাদাদ’ (সঠিক ফায়সালা ও ইলহাম) এর জন্য দুআও করে।”

(মালফূজাত (উর্দু) : মাওলানা ইলিয়াস রহ. মালফূজ নং-২১০)

সারা বিশ্বে সমাদৃত তাবলিগ জামাতের বৈশ্বিক বিভিন্ন ইজতিমায়, পুরানোদের জোড়ে এবং আলমি মারকাযে প্রায় দুই যুগ ধরে হাজার হাজার লম্বা লম্বা বয়ান করণে-ওয়ালা, গোটা উম্মতকে নবী-ওয়ালা এক মেহনতে ও এক ফিকিরে ওঠানোর জন্য অবিরাম মেহনত ও ফিকির করণে-ওয়ালা মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেব (দাঃবাঃ) এর কিছু বয়ানের কিছু অংশের উপর হঠাৎ করে আরোপ করা হয় অনেকগুলো ভুল। অস্থির মনে হক তালাশের উদ্যমতা নিয়ে মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক সাহেব ও অন্যান্য অভিযোগকারীদের উপস্থাপিত ভুলগুলোর তাহকিক আমরা শুরু করলাম। কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকহ, আকায়েদ, জরাহ-তা'দিল ও আমাদের আকাবির হযরতগণের ফতুয়া, প্রবন্ধ ও মালফূজাতের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করে বিশ্বের বহুত উলামা হযরতগণ ও বিজ্ঞ মুফতি সাহেবানদের মতো আমরাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, মুহতারাম মাওলানা ভুল ধরার মত কোনো ভুল করেননি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা বিরূধী কোনো কথা মুহতারাম মাওলানার বয়ানে নেই।

আমরা আরও বুঝতে পারলাম, মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক সাহেবের লেখা ‘সা'আদ সাহেবের আসল রূপ’ বইটির শুরুতেই যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, তিনি উল্লেখ করেছেন, মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর ইত্তিকালের পর মাওলানা সা'আদ সাহেবের আসল রূপ বেরিয়ে আসে। অথচ যে খন্ড বক্তব্যগুলোর উপর ভিত্তি করে তাঁর এই মন্তব্য সে বক্তব্যগুলোর অনেকাংশই মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ. এর ইত্তিকালের বর্ষ ২০১৪ সালের অনেক আগে থেকেই তিনি করে আসছেন। সুতরাং এই

কথাগুলো মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর ইত্তিকালের পর বলা হয়েছে বলা ভুল এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিপক্ষে হয়েছে বলা তো চরম ভুল।

ইখলাস ও সীরত ও সুন্নাতের উপর ভিত্তি করে মুজাদ্দিদে দীন মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর শুরু করা একশত বছরের এই মেহনত, কোটি কোটি মানুষের একমাত্র আশ্রয়, হেদায়াতের সার্বজনীন সাহাবা-ওয়ালা তরিকা ও বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের এই জামাত আজ বহিঃশত্রুদের হিংসাত্মক ষড়যন্ত্রের শিকার।

সম্মানিত উলামায়ে কেরাম, তাবলিগের মুরবিয়ানে ইজাম ও আম সাখীবুন্দের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহবান, আসুন, আমাদের আপোষের ভুল বুঝাবুঝি দূর করে আকাবিরদের একশ' বছরের নুরানি ও আলমি মারকায এবং আলমি মারকাযের আলমি যিম্মাদার মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেব (দাঃবাঃ) এর ইতায়াতে থেকে এক সাথে পূর্ণ উদ্যমে মেহনত করি। আর ইয়াহুদি ও খৃষ্টানদের পাতানো ষড়যন্ত্রের নীল নকশা ভেঙ্গে চুরমার করে দেই।

আমাদের প্রিয় পাঠকবৃন্দ, বিস্তারিত তাহকিক আপনারা করবেন, এটা আমাদের অনুরোধ। এখন আমরা আপনাদের খেদমতে উপস্থাপিত ভুলগুলোর কিঞ্চৎ তাহকিক পেশ করছি।

১. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

ভোটের সময় চিহ্ন হিসাবে (আঙুলে) যে রং লাগানো হয়, তার কারণে নামায হয় না। তাই ভোট না দেওয়া উচিত।

তফসিল :

وفي البحر الرائق 35\1

ولو لصق بأصل ظفره طين يابس وبقي قدر رأس إبرة من موضع الغسل لم يجز

১. অর্থঃ বাহরুর রায়েকে আছে, যদি নখের গোড়ায় শুকনো মাটি লেগে থাকে এবং ধোয়ার স্থানসমূহে যদি একটা সুইয়ের মাথা পরিমাণ জায়গা পানি পৌছাতে বাকি থাকে তাহলে (অযু-গোসল) যাবেজ হবে না।

(বাহরুর রায়েক, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫)

وفي الفتاوي الهندية 21\1

إن بقي من موضع الوضوء قدر رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم يجز - وفي موضع من الفتاوي الهندية - (26\1) والخضاب إذا تجسد وبس يمنع تمام الوضوء والغسل

২. অর্থঃ ফাতওয়ায়ে আলমগিরিতে আছে, অযুর অঙ্গসমূহে যদি একটি সুইয়ের মাথা পরিমাণ জায়গা পানি পৌছাতে বাকি থাকে অথবা অযুকারী ব্যক্তির নখের গোড়ায় কোনো শুকনো মাটি অথবা তাজা মাটি লেগে থাকে তাহলে তার অযু বৈধ হবে না। (ফাতওয়ায়ে আলমগিরি, পৃষ্ঠা-২১, খন্ড-১) এই কিতাবের আরেক

জায়গায় আছে যে, খেয়াবের যদি দেহ অর্থাৎ সুক্ষ আবরণ হয় ও শুকিয়ে যায় তাহলে সে খেয়াব সহ অযু-গোসল সম্পূর্ণ হবে না।

(ফাতওয়ায়ে আলমগিরি, ২৬-পৃষ্ঠা, খন্ড-১)

في تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق 26\1

وَالْخِصَابُ إِذَا تَجَسَّدَ وَيَبْسَ يَمْنَعُ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ .

৩. অর্থঃ তাবয়ীনুল হাকায়েক শরহু কানযিদ দাকায়েকে আছে, খেয়াবের যদি সুক্ষ দেহ হয় ও শুকিয়ে যায় তাহলে সে খেয়াব সহ অযু-গোসল সম্পূর্ণ হবে না।

(তাবয়ীনুল হাকায়েক শরহু কানযিদ দাকায়েক, ১/২৬)

৪. আপকে মাসায়েলে আছে,

যদি আঠা অথবা অন্যকিছু (হাত-পায়ে) লাগে যা চামড়া পর্যন্ত পানি পৌছাতে প্রতিবন্ধিকতা সৃষ্টি করে তাহলে অযু গোসল হবে না।

(আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, পৃষ্ঠা-৮০, খন্ড-৩)

অভিজ্ঞ ও ভুক্তভোগি মানুষদের থেকে জানা গেছে, ভোট প্রদান কালে নখের গোড়ায় যে অমোচনীয় কালি লাগানো হয় সে কালি সুক্ষ আবরণ বিশিষ্ট হয়ে শুকিয়ে ১/২ দিন থেকে যায়। সহজে ওই কালিকে ওঠানো যায় না। যদি এমনিই হয় তাহলে ওই কালি রেখে অযু করলে অযু হবে না। মাওলানা ফারুক সাহেবও মন্তব্যের মধ্যে কালি ওঠিয়ে অযু করতে হবে বলেছেন। মুহতারাম মাওলানা কোনো সময় হয়তো বলেছেন, আংগুলে ভোটের কালি থাকলে, যেহেতু উক্ত কালি এক দুই দিন লেগেই থাকে, স্বাভাবিকভাবে দূর করা যায় না, তাই সে কালিসহ অযু হবে না। অযু না হলে নামায হবে না। সুতরাং ভোট না দিয়ে হলেও নামাযকে কায়েম রাখতে হবে। ওনি ভালো পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ, নামাযের মত ভোট এত গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়। আমাদের আহলে ফাতুয়া হযরত আকাবির, বিশেষত ফকিহুল উম্মত হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি রহ. ‘ফাতুয়ায়ে মাহমুদিয়া’ এর মধ্যে (৪/৬২০) এবং মুফতি আ’জম, হিন্দুস্তান, মাওলানা কিফায়াতুল্লাহ রহ. ‘কিফায়াতুল মুফতি’ এর মধ্যে (৯/৩৯৩) জুলুম থেকে বাঁচার জন্য, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য যেভাবে ভোট প্রদান করার অনুমতি দিয়েছেন অনুরূপ কেউ যদি ভোট নাও দেন, ভোট দান থেকে বিরত থাকেন তারও অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং ভোটতো এত গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নয়। ভোটের চাইতে নামাযের গুরুত্ব অনেক বেশি। একজন মুমিনের কাছে এক ওয়াক্ত নামাযের দাম সারা দুনিয়ার চাইতেও বেশি।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

ভোটদান থেকে বিরত থাকা নয়, বরং রং উঠিয়ে অযু করে নামায পড়তে হবে। পুরো ভারতের কোনো মুফতি এই তাহকিকে পৌছতে পারলেন না যে, ভোটদান থেকে বিরত থাকতে হবে। শুধু সা’আদ সাহেবই তা বুঝতে পারলেন? এই ফতোয়া দিয়ে ভারতের মুসলমানদের ভোট থেকে বিরত রেখে সা’আদ সাহেব কার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতেন।

মন্তব্যের জবাব :

মাওলানা সা'আদ সাহেব সতর্কতামূলক তাকুওয়াপূর্ণ পরামর্শ দিলেন। নামাযকে খুবই গুরুত্ব দিলেন। কিন্তু এই ভালো পরামর্শের মন্তব্য করলেন, ভোটদান থেকে বিরত রেখে মাওলানা সা'আদ সাহেব কার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছেন? জানি না এই মন্তব্যের উদ্দেশ্য কি? আমরা যদি বলি, মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেব মাওঃ ফারুক সাহেবের কথা মত ভোট দান থেকে বিরত রেখে, আল্লাহর নবী ও খুলাফায়ে রাশিদিনের এজেন্ট হয়ে সেই খাইরুল কুরুনের সিরত-সুরত-সুনতকে যিন্দা করার ফিকির করে যাচ্ছেন। যথাসম্ভব বর্তমানের মুসলিম উম্মাহকে প্রচলিত সকল রুসুম-রেওয়াজ থেকে উঠিয়ে সাহাবাদের রপ্তে রঙিন করার মেহনত অবিরাম করে যাচ্ছেন। খুলাফায়ে রাশিদিনের এজেন্ডা সাধ্যমত একটু একটু করে বাস্তবায়নের জন্য আগে বাড়ছেন। তাহলে আশা করি আমাদের কথাটি যথার্থই হবে।

কিন্তু আমরা মাওঃ ফারুক সাহেবের মন্তব্যের জবাবে জাতির সামনে এই প্রশ্ন করবো না যে, ভোট দানের প্রতি জোর দিয়ে তিনি বেখেয়ালে কাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছেন? ভোট, নির্বাচন, প্রচলিত গনতান্ত্রিক পদ্ধতির সকল কার্যক্রম নতুন উদ্ভাবিত এক মতবাদ এবং পশ্চিমাদের আবিষ্কার, যা আহলে ইলম সকলেরই জানা।

ফকিহুল উম্মত হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি রহ. গনতন্ত্র সম্পর্কীয় এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,

“হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ সাহেব মুহাদিসে দেহলভি রহ. গনতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। গনতন্ত্রে কানুন ও বিধানাবলি দলিলাদির উপর ভিত্তি করে হয় না। বরং অধিকাংশের উপর হয়। অর্থাৎ অধিকাংশের রায়ে ফায়সালা করা হয়। যদি অধিকাংশের রায় কুরআন হাদিসের খেলাফও হয় তাহলেও এই (অধিকাংশের রায়ের) উপরই ফায়সালা হয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরিফে অধিকাংশের ইত্যাতেকে গুমরাহি আবশ্যিককারী হিসাবে অখ্যায়িত করেছেন।

وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله

অর্থঃ আর যদি আপনি যমিনে যারা তাদের অধিকাংশকে অনুসরণ করেন তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে সরিয়ে গুমরাহ বানিয়ে দিবে।

(সূরা আনআমের ১১৬ নং আয়াতের প্রথমার্শ)

চার খলিফা হুযুর সা. এর নকশে কদমের উপর চলেছেন। তারা হুযুরের খেলাফ দ্বিতীয় কোনো রাস্তা-পদ্ধতি অবলম্বন করেননি।”

(ফাতুয়ায়ে মাহমুদিয়া, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬০০)

তিনি আরও বলেন,

“বর্তমান গনতন্ত্রের অর্থ হলো, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ, নারী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বুঝমান, সকলেরই ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে। আর অধিকাংশ ভোটের ভিত্তিতে শাসক নির্বাচিত হয়। ইসলামে এরকম গনতন্ত্রের কোথাও অস্তিত্ব নেই। না কোনো সুস্থ বিবেক সম্পন্ন লোক এই গনতন্ত্রের মধ্যে কোনো খাইর ও কল্যাণের কথা ভাবতে পারে। আর এটা স্পষ্ট যে, অধিকাংশরা নাদান ও জাহিলই হয়। তারা এরকম একজনকেই ভোট দিবে যার দ্বারা তারা তাদের খাহেশাত পুরা করার আশা করতে পারে। আর এটা নিশ্চিত যে, তাদের খাহেশাতের মধ্যে খাইর বা কল্যাণ গালিব

অর্থাৎ প্রাবল্য থাকে না। বরং শার্ব অর্থাৎ অকল্যাণেরই প্রাবল্য থাকে। তো অকল্যাণ প্রচারকারীকে নির্বাচিত করা কোন্ ধরনের বিবেক-বুদ্ধির কথা। ... এরকম মূলক ও হুকুমতের ঠিকানা (গন্তব্য) কী হবে!! যেখানে (মূলক ও হুকুমতের) প্রধান ব্যক্তি নির্বাচনের মাপকাঠি যোগ্যতা ও দলিলাদির উপর না হয়ে চতুষ্পদ জন্তু সদৃশ অধিকাংশ আওয়ামের রায়ের উপর হয়ে থাকে।”

(ফাতুয়ায়ে মাহমুদিয়া, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬০২)

প্রিয় পাঠক, ইসলাম ও গণতন্ত্রের ইতিহাস স্পষ্ট। একটু গোড়া থেকেই বলি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইস্তিকালের প্রায় এক হাজার বছর পর অমুসলিম দেশ ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে গণতন্ত্রের জন্ম হয় এবং এই গণতন্ত্রের প্রথা ধীরে ধীরে তাদের থেকে বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশে চালু হয়ে যায়। আধুনিক গণতন্ত্রের জন্মগুলো ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে হয়। ফরাসী বিপ্লবের পর খৃষ্টীয় ইউরোপের ইতিহাসে এই প্রথম ধর্মহীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদভব ঘটে। এর আগে বিভিন্ন ভূ-খন্ড খৃষ্ট ধর্মযাজকরা (বিকৃত) ঐশি বাণী ও বিধানাবলির আলোকে শাসন করতো।

(সূত্র : এনসাইক্লোডিয়া অব পলিটিক্স)

গণতন্ত্র (Democracy) যেহেতু খেলাফতে রাশেদার সময় হতে অনেক পরে জন্ম নেওয়া এক নতুন মতবাদ, এই জন্য এর আসল হাকিকত ও পরিচয় কুরআন - হাদিসে তো নয়ই, গণতন্ত্রবিদদের থেকে জেনে নিতে হবে। গণতান্ত্রিক রাজনীতি অধ্যয়ন করে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

‘গণ’ এর অর্থ জনগণ। ‘তন্ত্র’ এর অর্থ আইন ও বিধান বা কর্তৃত্ব। সুতরাং ‘গণতন্ত্র’ এর অর্থ জনগণের আইন বা জনগণের কর্তৃত্ব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬ তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন (মৃত-১৮৯৮ ইং) গণতন্ত্রকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করে,

‘Democracy is a government of the people by the people and for the people’

অর্থঃ গণতন্ত্র হলো, জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের সরকার।

আরেক গণতন্ত্রবিদ বলেন, ঐশিতান্ত্রিক পরিচালিত না হয়ে নিজেদের প্রস্তাবিত বিধিতে দেশ পরিচালনার নাম গণতন্ত্র।

আধুনিক সভ্যতায় গণতন্ত্র হচ্ছে, সংখ্যাগুরু শাসন। গণতন্ত্রের মূল শিক্ষাই হলো, অধিকাংশের ইচ্ছার ভিত্তিতে জনসম্মুখীন শাসন করা। কোনো বিষয়ের সমাধানের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল তথা কুরআন সুন্নাহর দ্বারস্থ না হয়ে গণপ্রতিনিধি অথবা গণভোটে অধিকাংশ জনগণের হাতে সোপর্দ করা গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য। প্রজারা নির্ধারিত সময়ের জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নেতা নির্বাচিত করবে। নির্বাচিত নেতা আইন তৈরি করে প্রজাদের শাসন করবে। সহজ করে যদি বলি, সব ধর্মীয় কৃষ্টিকালচার ও ঐশি জীবন-ব্যবস্থা হতে পৃথক থেকে রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্রের জনগণের জন্য যে মতবাদ ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইস্তিকালের প্রায় এক হাজার বছর পর থেকে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, মানুষের চিন্তা-প্রসূত সেই মতবাদের নামই গণতন্ত্র। প্রচলিত হরতাল, মিটিং-মিছিল, রাস্তা - অবরোধ ও অনশন ইত্যাদি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মসূচি। এসব ইসলামের তরিকা নয়। হক রায়ে সিদ্ধান্ত প্রদানই হলো ইসলামের শিক্ষা, হক রায় প্রদানকারীর সংখ্যা যতই কম হোক না কেন ! ভোটাভোটি ইসলামি তরিকা নয়। পরিচালনায় দেশটা যাদের কাছে একটা পরিবারের মত, সেই বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিদের ভোট আর দিন-মজুর বেচারাদের ভোট

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমান ক্ষমতা রাখে। একটা মহল্লা পরিচালনায় অযোগ্য এক রিকশা-ওয়ালা একটা ভোট একটা সরকার পাণ্ডিত্যে দিতে পারে। এরকম বিবেকহীন নিয়ম ইসলামে নেই। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক সত্য যে, খেলাফতে রাশেদার পর উমায়ী ও আব্বাসীয় আমিরগণ ইসলামের ইমারত ও খেলাফতকে বাহ্যত মৌলিকভাবে ধরে রাখলেও পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে সবকিছু ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বহুত মুসলিম ভূ-খন্ডে রাজতন্ত্র কায়েম হয়ে যায়। আজ থেকে প্রায় দু'একশ বছর পূর্ব থেকে বেশ কটি মুসলিম দেশে আমেরিকার অশুভ তৎপরতায় গণতন্ত্রও ঢুকে পড়ে। তবে একথা বাস্তব সত্য, গণতন্ত্র আবিষ্কার পরবর্তী দু'তিনশ' বছরের ইতিহাসে গণতন্ত্রের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েম হয়নি এবং হবেও না। যদিও হয় সেটি ইসলাম হবে না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হলে গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হবে, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে না। গণতন্ত্র ইসলামি তরিকা নয়।

গণতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে বিশাল ফারাক। ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকাল পর্যন্ত নবুওয়তের তেইশ বছর এবং অনুসরণীয় ও শ্রেষ্ঠত্বের সনদপ্রাপ্ত সোনালি তিন যুগের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করলে একথা স্পষ্টভাবে প্রমানিত হয় যে, সব মুসলমান মিলে তাদের এক জামাত থাকবে, যে জামাতের একজন আমির থাকবে। মুসলিম অধ্যুষিত ভূ-খন্ডের বিশালতার কারণে আমিরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে গভর্নর, কাযি ইত্যাদি প্রেরণ করা হবে। আমির মামুর সবাই মিলে আল্লাহর আইন ও বিধান মেনে চলবে। মামুরগণ আমিরকেও মেনে চলবে। আমির মামুর মিলে **ما أنزل الله** (আল্লাহ যাকিছু নাযিল করেছেন) এর বাস্তবায়ন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করে জান্নাত লাভ করবে। এ-ই হলো ইসলামি খেলাফত।

আজ থেকে প্রায় একশ' বছর পূর্বে সাহাবা-ওয়ালা খেলাফতের আদর্শ বাস্তবায়নের স্বপ্ন নিয়ে যে মানুষটি মর্মজালায় ও অস্থিরতায় সবসময় ছটফট করতেন সেই মহা মনিষী মাওলানা ইলিয়াস রহ. বুঝতে পেরেছিলেন, বর্তমানে রুসুম রেওয়াজ, মানব রচিত মত ও পথকে পরিহার করে ইসলামি খেলাফতের সূচনা আমির কর্তৃক মুসলিম জামাত দাওয়াত ও তাবলিগের ময়দানে কাপিয়ে পড়ার মাধ্যমেই হবে। এছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

সাইয়েদ মাওলানা আবুল হাসান আলি নদভি রহ. “দ্বীনি দাওয়াত” গ্রন্থে লিখেছেন,

“মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর চিন্তায় ইসলামি ইতিহাসের যে সারনির্যাস বিদ্যমান ছিল তার ভিত্তিতে তিনি এক সতন্ত্র চিন্তাধারা গড়ে তুলে ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, কয়েক শতাব্দি ধরে উম্মত রাজনৈতিক যোগ্যতা ও শক্তি সামর্থ্যহারা হয়ে আছে। সুতরাং এখন একটা দীর্ঘ সময় পরিপূর্ণ ধৈর্যের সাথে দাওয়াতের উসূল ও তরিকা মোতাবেক কাজ করে যাওয়া প্রয়োজন, যাতে মুসলমানদের মধ্যে প্রবৃত্তি ও স্বার্থের আকর্ষণ উপেক্ষা করে নিয়ম শৃঙ্খলা ও আইন কানুনের অধীনে কাজ করার মনোভাব ও যোগ্যতা তৈরি হয়। প্রাথমিক রাজনীতির জন্যও বিরাট পরিমান দাওয়াতি প্রস্তুতি প্রয়োজন। দাওয়াতি পর্যায়ে যত বেশি তাড়াহুড়া হবে এবং যে পরিমান দুর্বলতা থেকে যাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই পরিমান খুঁত ও শূন্যতা থেকে যাবে। তেমন রাজনীতি হয়তো অস্তিত্বের মুখই দেখতে পাবে না কিংবা অস্তিত্ব লাভ করলেও তার ধ্বংস অবশ্যজ্ঞাবী।

বাস্তব ঘটনা তাই। খেলাফতে রাশিদার যে শক্তি ও সংহতি এবং মুসলমানদের সুশৃঙ্খলা ও আনুগত্য রক্ষার যে যোগ্যতা আমরা দেখতে পাই তা ছিল সেই সুদীর্ঘ দাওয়াতি মেহনতের ফল ও ফসল যা নবুওয়তের প্রথম বছর থেকে শুরু হয়ে খেলাফতে রাশেদা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পক্ষান্তরে পরবর্তীতে যে সামষ্টিক দুর্বলতা ও অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল তা দাওয়াতের প্রতি অব্যাহত উদাসিনতারই কুফল, যা বনু উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফত কালে উম্মতের মাঝে দেখা দিয়েছিল।

হযরত হাসান রাদি. হযরত হুসাইন রাদি. কে যে মহা মূল্যবান অছিয়ত করেছিলেন তা মাওলানা রহ. প্রায়ই উল্লেখ করতেন। হযরত হাসান রাদি. বলেছিলেন, এখন থেকে উম্মতের কাজ দাওয়াতের তরিকায় হবে।

মাওলানা রহ. এমন কোনো দল বা জামাতে অংশগ্রহণ না করার চুরান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যেখানে যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হয় নিছক আইন কানুন, প্রশাসনিক কাঠামো ও উর্ধ্বতন-অধঃস্তন নীতির ভিত্তিতে। কেননা, তার মতে বর্তমান অনৈক্য, অস্থিতিশীলতা ও খারাবির মূল কারণ হলো দাওয়াতের ভিত্তি ভূমি তৈরির আগে রাজনীতি শুরু করার এ ভুল কর্মনীতি এবং পশ্চিমা রাজনীতি ও সংগঠনের ভিত্তিতে দ্বিনি কাজ আঞ্জাম দানে চেষ্টা।

(মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ অনুদিত “দ্বিনি দাওয়াত” পৃষ্ঠা-২৬৪)

আসলে এবিষয়টি বিস্তর আলোচনার দাবি রাখে, যেমন আমির হওয়ার শর্ত, বৈশিষ্ট্য, আমির তায়ীন করার পদ্ধতি ও আমির ও মামূরের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি। এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার জায়গা নয়। শুধু বলতে চাই, মাওলানা ইলিয়াস রহ. থেকে শুরু করে এই সিলসিলার সব আমীর হযরতগণ বিশ্বময় বিপ্লব ঘটানো ও সাহাবা-ওয়ালা খিলাফত ও যিন্দগি নিয়ে চলার গভীর যে মেযাজ ধারণ করেছিলেন সে মেযাজকে নিয়েই মুহতারাম মাওলানা সা’আদ সাহেব (দাঃবা) চলছেন। মুহতারাম মাওলানা ও এই সিলসিলার পূর্ব আমিরগণের গভীর চিন্তা ও ইসলামি জগত ও খিলাফতকে উপলব্ধি করার জন্য সাইয়েদ আবুল হাসান নদভি রহ. এর সংকলিত ‘মাওলানা ইলিয়াস রহ. ও তাঁর দ্বিনি দাওয়াত’, মাওলানা মনজুর নোমানি রহ. এর সংকলিত ‘মালফূজাত : মাওলানা ইলিয়াস রহ. এবং মাওলানা ইউসুফ রহ. এর ‘বয়ানাৎ’ এই তিনটি গ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে আশা করি আমাদের অনেককিছুই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

নিকট অতীতের আমাদের কিছু উলামায়ে কেরাম গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন করেছেন। লক্ষ্য ছিল ভালো। তারা গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজনীতি করেননি। বরং সরকার গঠন করে গণতন্ত্রকে পালটিয়ে ইসলামি শাসন তন্ত্র কায়েম করা, মানব রচিত সংবিধানের জায়গায় কুরআনি সংবিধান প্রতিষ্ঠিত করা ছিল ওনাদের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁদের কেউই উদ্দিষ্ট সফলতার মুখ দেখাতে পারেননি। বরং একদল থেকে উপদল, শাখাদল, বিরোধী দল হয়ে হয়ে ইসলামি দলগুলোই শতধা বিভক্ত হয়ে গেছে। যা থেকে অমুসলিম জাতিসমূহ খুবই লাভবান হচ্ছে। এ পদ্ধতি ধরে রাখলে এই বিভক্তির ধারাবাহিকতা বাড়তে থাকবে। বিজাতীদের সাহায্য হবে। আসলে বিজাতীদের পদ্ধতি গ্রহণ করাটাই ছিল আমাদের একটা বড় ভুল ইজতিহাদ। আল্লাহ তা’আলা ভুল ইজতিহাদের ইখলাছপূর্ণ মেহনতের উপর সাওয়াব দান করেন। এই কারণে আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে সাওয়াব দান করবেন বলে আমরা আশা করি। কিন্তু আমাদের এই চিন্তা ছিল বাস্তবতা বিরোধী ও অপবিত্রতা দিয়ে পবিত্রতা হাসিল করার মত। অধিকাংশ আকাবির ও বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে বিজাতীদের তৈরি ইসলাম বিরোধী তন্ত্র দিয়ে ইসলামি তন্ত্র কায়েম করা যায় না।

আরেকটি কথা, ইংরেজ শাসনামলে আমাদের আকাবিরগণের মধ্যে যারা জালিমের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য এবং ইসলাম ও মুসলমানদের কোনো উপকার হাসিল করার জন্য ভোট দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন বর্তমানে তাদের ফতোয়া বহাল থাকবে কিনা? বর্তমানে এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু, এ বিষয়টি নতুন করে আবার আহলে ইলমদের ভাববার বিষয়!

মাওলানা মানজুর নোমানি রহ. লিখেছেন,

“যারা ব্যক্তিগত কার্যক্রম অথবা সমষ্টিগত বিষয়গুলোতে ইউরোপিয়ান খৃষ্টান জাতীর পদ্ধতির অনুসরণ করে যাচ্ছে এবং সেটাকেই এই যামানার সঠিক কর্মপদ্ধতি বুঝতেছে তাদের এ থিউরির উপর দুঃখ ও আক্ষেপ প্রকাশ করে এক সুহবতে -

মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলেছেন,

“একটু ভেবে দেখো তো! যে জাতীর আসমানি ইলমসমূহ অর্থাৎ ঈসা আ. আনিত ইলমসমূহের বাতি মুহাম্মাদি ইলমসমূহ (কুরআন ও সুন্নাহ) এর সামনে নিভে গেছে। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে এবং সরাসরি এর দ্বারা আলো হাসিল করা সাফ নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। ওই জাতীর খাহেশাত এবং অলীক ও কাল্পনিক বিষয়সমূহকে (ওই ইউরোপিয়ান খৃষ্টান জাতীর নিজেদের তৈরি দৃষ্টিভঙ্গিসমূহকে) এই কুরআন ও সুন্নাহ ধারনকারী উম্মতে মুহাম্মাদি গ্রহণ করে নেওয়া এবং এগুলোকে সঠিক কর্মপদ্ধতি মনে করা আল্লাহ তা’আলার নিকট কি পরিমাণ খারাপ এবং কী পরিমাণ গণ্যব আবশ্যিককারী হবে? যুক্তিগতভাবেও এ কথা কী পরিমাণ ভুল। মুহাম্মাদি অহি (যার মধ্যে যিন্দগির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিত সব শাখাসমূহের সাথে সম্পর্কিত পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা বিদ্যমান) সংরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও যদি খৃষ্টান জাতীর কর্মপদ্ধতির অনুসরণ করা হয়, কী বলেন! এটা মুহাম্মাদি ইলমসমূহের বড় বেকদরি নয় কি?”

(মালফূজাত (উর্দু) : মাওলানা ইলিয়াস রহ. মালফূজ নং-১২৪)

প্রিয় পাঠক, মুহতারাম মাওলানা যদি আকাবির হযরতগণের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক সাহেবের কথা মত তিনি ভোটের প্রতি নিরুৎসাহিতও করেন তাহলে কী আমরা মুহতারাম মাওলানার ভুল হয়েছে বলতি পারি। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থাকা নতুন কিছু নয়।

২. অভিযোগকারীর ভষায় মুহতারাম মাওলানা সা’আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

মুফাস্সিরিন এই আয়াতের কোনো এক তাফসির করেছেন, উলামা কোনো এক তাফসির করে থাকেন, কিন্তু আমি তার এই তাফসির করে থাকি। এটা শুনো। এটাই সঠিক তাফসির।

তাফসিল :

মুহতারাম মাওলানার এই রীতি-নীতিটি প্রায় সমস্ত তাফসির লেখকদের রীতি-নীতি। কিতাব লেখার জগতে প্রথম তাফসির লেখক, বিখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা ইবনে জারির তুবারি রহ. আল্লামা বাগাভি রহ. আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযি রহ. আল্লামা কুরতুবি রহ. ও আল্লামা ইবনে কাসির রহ. সহ প্রায় সব তাফসির লেখক প্রথমে মুফাস্সির, ইমাম ও মুজতাহিদদের রায় ও মতামত উল্লেখ করে অনেক সময় নিজের মতামত পেশ করেন এবং ‘আমার কাছে এ মতটি সঠিক, এ ব্যাপারে আমার রায় হলো, আমি যা বলেছি এটাই বেশি সহিহ’ ইত্যাদি বলে মন্তব্য করে থাকেন। মুহতারাম মাওলানা সা’আদ সাহেব সবসময় কুরআন শরিফের কোনো আয়াতের তাফসির ও তাওজিহ করতে গেলে সাহাবা তাবেয়ী ও মুফাস্সির হযরতদের বিভিন্ন রায় ও উক্তি পেশ করেন। মাঝেমাঝে কুরআনি আলফাজ-শব্দসমূহের ইশারা-ইংগিত বা অন্য কোনো قرينة বা আলামতের কারণে ওনার কাছে যা খুলে বা জাহির হয় তা বলে থাকতেও পারেন। এরকম তাওজিহ ও তাশরিহ তো প্রশংসনীয়। আর তাফাঙ্কুর ও তাদাব্বুরের জন্যে তো আমাদেরকে হুকুম করা হয়েছে। মাওলানার তাওজিহ শুনে সচেতন আলেমগণ বুঝতে পারেন ওনার মন-মেয়াজ কত পবিত্র এবং কুরআন-সুন্নাহর নূরে এবং সালাফ-খলাফদের সিরতে কত নূরানি।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

ইহা তাফসির বির-রায় (মনগড়া তাফসির) যা মওদুদী দর্শন। এ ধরনের মুফাসসিরদেরকে হাদিসে জাহান্নামি বলা হয়েছে। من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار

মন্তব্যের জবাব :

ইহা তাফসির بالرأي (রায় ভিত্তিক তাফসির) নয়। কওমি মাদরাসার ‘জালালাইন’ ক্লাসের পাঠ্যবই ‘আল-ফাওযুল কাবির ফি উসূলিত তাফসির’ কিতাবটির ১৪ নং পৃষ্ঠায় শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রহ. তাফসির بالرأي এর যে সংজ্ঞা করেছেন সে সংজ্ঞা মতে অভিযোগকারীর এরকম মন্তব্যকে আমরা সঠিক মন্তব্য বলতে পারি না। সেখানে আছে,

والتفسير بالرأي هو التفسير بالهوى والتفسير من عند نفسه بحيث يوجب تغييراً لمسئلة إجماعية قطعية أو تبديلاً في عقيدة السلف المجمع عليها وأما التفسير بالدليل والقرينة فهو تفسير صحيح معتبر في الشرع

অর্থঃ “আর তাফসির بالرأي (রায় ভিত্তিক তাফসির) বলা হয় খায়েশাত ও প্রবৃত্তির দ্বারা তাফসির করা এবং নিজের থেকে তাফসির করা, যে তাফসির ইজমা ও অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত কোনো মাসআলাকে পরিবর্তন করে দেয় কিংবা সালাফগণ যে আকিদার উপর ঐক্যবদ্ধ সে আকিদাকে পাণ্ডিত্যে দেয়। আর দলিল এবং قرينة বা আলামত দ্বারা তাফসির করাকে সহিহ তাফসির বলা হয় এবং এ তাফসির শরিয়তে গ্রহণযোগ্য”।

সুতরাং মাওলানা সা’আদ সাহেব মাঝেমধ্যে আয়াতের ألفاظ (শব্দসমূহ) এর ইংগিত কিংবা কোনো দলিল বা অন্য কোনো করিনা ও আলামতের কারণে যে নুকতা ও তাওজিহ বয়ান করেন তাতে ওনার ইলমের গভীরতা প্রমাণ করে। তিনি তাফসির করে অকাট্যভাবে প্রমাণিত সালাফদের ঐক্যবদ্ধ কোনো মাসআলা বা আকিদাকে পাণ্ডিত্যে দিচ্ছেন না। বরং ওনাদের অনুসরণ কাজে কর্মে, বয়ানে তিনিই বেশি করে যাচ্ছেন। একে التفسير بالرأي বলা হয় না। একে যদি التفسير بالرأي বলা হয় তাহলে সালাফ-খলাফদের সবার উপর তাফসির বির-রায়ের ইলযাম (অভিযোগ) লাগানো হয়।

তাছাড়া সব তাফসির বির রায় নিষিদ্ধও নয়, বরং দলিল বা ইজতিহাদ ভিত্তিক তাফসির بالرأي তো প্রশংসনীয়।

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح مقدمة التفسير 128\1

التفسير بالرأي ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : التفسير المبني على الجهل كما قال الشيخ بما لا علم لهم به فهذا مذموم .
القسم الثاني : التفسير المبني على الهوى هذا مذموم كما يفعله أهل البدع .
القسم الثالث : التفسير المبني على اجتهاد هذا ليس مذموم إذا كان المجتهد أهل للاجتهاد .

অর্থঃ শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. শরহে মুকাদ্দামাতুত তাফসিরে বলেন,

التفسير بالرأي (রায় ভিত্তিক তাফসির) তিন প্রকার।

প্রথম প্রকার, যে তাফসির মূর্খতার উপর ভিত্তি করে হয়, যেরকম শাইখ বলে দিলো এমন বিষয় যে বিষয়ের ইলম তার কাছে নেই। তাহলে এ রকম التفسير بالرأي নিন্দনীয়।

দ্বিতীয় প্রকার, যে তাফসির খাহেশাত ও প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করে হয় তাহলে এই রকম التفسير بالرأي ও নিন্দনীয়। যেরকম বিদাতিরা করে থাকে।

তৃতীয় প্রকার, যে তাফসির ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে হয় সে التفسير بالرأي (তাফসির বির রায়) নিন্দনীয় নয়। যদি মুজতাহিদ ইজতিহাদের আহাল হয়ে থাকেন। (১/১২৮)

আল্লামা ইবনে আশুর রহ. তার তাফসিরের কিতাবে লিখেন,

ونحن نشاهد كثرة أقوال السلف من الصحابة، فمن يليهم في تفسير آيات القرآن وما أكثر ذلك الاستنباط برأيهم وعلمهم. قال الغزالي والقرطبي:....فتبين على القطع أن كل مفسر قال في معنى الآية بما ظهر له باستنباطه... وقد ذكر فقهاؤنا في آداب قراءة القرآن أن التفهم مع قلة القراءة أفضل من كثرة القراءة بلا تفهم، قال الغزالي في الإحياء التدبر في قراءته إعادة النظر في الآية والتفهم أن يستوضح من كل آية ما يليق بها كي تتكشف له من الأسرار معان مكنونة لا تتكشف إلا للموفقين قال: ومن موانع الفهم أن يكون قد قرأ تفسيراً واعتقد أن لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن ابن عباس وابن مجاهد، وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي فهذا من الحجب العظيمة

অর্থঃ কুরআনের আয়াতের তাফসিরের ক্ষেত্রে সাহাবা ও তাদের পরবর্তী সালাফদের অধিকাংশ উক্তিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ উক্তিগুলোর অধিকাংশ তাদের রায় ও ইলমের দ্বারা উদঘাটন করা বিষয়। ইমাম গায়ালি ও কুরতুবি বলেন, ...নিশ্চিত রূপে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রত্যেক মুফাসসির আয়াতের অর্থের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও ইস্তিম্বাত দ্বারা তার কাছে যা জাহির হয়েছে তাই বলেছেন।... এবং আমাদের ফুকাহাগণ কুরআন তিলাওয়াতের আদাবের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেন যে, বুঝে বুঝে ও উপলব্ধি করে কম তিলাওয়াত করা না বুঝে, না উপলব্ধি করে অধিক তিলাওয়াত করার চাইতে উত্তম। ইমাম গায়ালি ‘এহইয়াতে’ বলেন, কুরআনের তিলাওয়াতে ফিকির ও تدبر (চিন্তা-ভাবনা) এর অর্থ আয়াতে বার বার দৃষ্টি দেওয়া এবং প্রতিটি আয়াতের যা শান ও উপযুক্ত তা স্পষ্ট করে বুঝার চেষ্টা করা। যাতে করে আয়াতের গোপন রহস্য থেকে আবৃত ভাব ও অর্থ বের হয়ে আসে। আর এটি আল্লাহ তা‘আলার তাওফিকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট ছাড়া আর কারো কাছে বেরিয়ে আসে না। তিনি বলেন, কুরআন বুঝার এক প্রতিবন্ধকতা হলো, কেউ কোনো একটা তাফসির পড়লো আর বিশ্বাস করে নিলো, ইবনে আব্বাস, ইবনে মুজাহিদ প্রমুখ উনাদের থেকে যা বর্ণিত তা ছাড়া কুরআনের শব্দগুলোর আর কোনো অর্থই নেই, এছাড়া যা আছে এসব التفسير بالرأي। এইটা হলো (কুরআনের অর্থ না বুঝার) বড় প্রতিবন্ধকতা সমূহের একটি। (২/৩২)

উলামায়ে কেরাম তাফসির বির রায় মাকবুল হওয়ার পাঁচটি শর্ত উল্লেখ করে থাকেন,

১. التفسير بالمأثور (তাফসিরে নাকলি) এর বিরোধী না হওয়া।

২. শব্দের دلالة (অর্থ) শব্দের সাথে ভাষার দিক থেকে মিল থাকা। কেননা, কুরআন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় অবতীর্ণ।

৩. سباق و سياق (আগ-পর) এর সাথে মুনাসেব ও মিল থাকা।

৪. এই التفسير بالرأي এর দ্বারা শরিয়তের কোনো বিষয়ের মুখালাফাত না করা।

৫. এই التفسير بالرأي করে কোনো বিদাতের জন্ম না দেওয়া।

উপরের এই আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুহতারাম মাওলানা তাফসিরের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো ভুল করেন না। বরং ওনার তাফসিরের মধ্যে আহলে তাফসিরদের ন্যায় গভীর ইলমের সন্ধান পাওয়া যায়। অভিযোগকারী ওনাকে না চেনার কারণেই এরকম ভুল মন্তব্য করতে পারলেন।

বিদ্ভঃ

মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক সাহেব মন্তব্যে যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন ওনার লিখিত শব্দে সে হাদিসটিকে ‘সিহাহ সিদ্দাহ’ সহ অন্যান্য হাদিসের কোনো কিতাবে আমরা পাইনি। তাহলে কি ওনি নিজে থেকে কিছু শব্দ বাড়িয়ে বা পরির্তন করে বলেছেন? ইমদাদুল আহকামে আছে, (১/২৯৭), من فسر القرآن برأيه , এরকম শব্দ দিয়ে শুরু হওয়া তাফসির বির রায়ের কোনো হাদিস আছে কিনা সেটা জানার জন্য মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. কে একজনে প্রশ্ন করেছিল, তখন তিনি উত্তরে তিরমিযির রেওয়ায়াতগুলোর কথা উল্লেখ করেন। من فسر القرآن দিয়ে শুরু হওয়া কোনো রেওয়ায়াতের কথা বলেননি। তাহলে কি মাওলানা সাহেবের লিখিত শব্দের কোনো হাদিস মাওলানা থানভি রহ. ও পাননি।

আমরা জানি আল্লামা তিরমিযি রহ. তার কিতাবে ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত এসম্পর্কে দুটি হাদিস উল্লেখ করেন, একটি হাদিসের প্রথমংশ من قال في القرآن بغير علم । আরেকটি হাদিসের প্রথমংশ

من قال في القرآن برأيه । ইমাম তিরমিযি রহ. প্রথম রেওয়ায়াতটিকে ‘সিহাহ’ এবং দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটিকে ‘হাসান’ বলেছেন। হাদিসবেত্তাগণ নিজেদের রায় দ্বারা তাফসির করার অর্থ করেছেন ইলম ছাড়া নিজে থেকে কোনো প্রকার দলিল ছাড়া তাফসির করা। মুহতারাম মাওলানা দলিল ছাড়া কোনো তাফসির করেন না।

৩. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা’আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল রাখা হারাম এবং পকেটে ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল রেখে নামায হয় না। যে আলেমগণ ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল রাখাকে যায়িজ বলেন তারা উলামায়ে ছু’। বারবার কসম খেয়ে তিনি বলেন, তারা হলো উলামায়ে ছু’। এমন আলেমরা হলো গাধা! গাধা! গাধা!

তাফসিল :

অভিযোগকারী যেভাবে মুহতারাম মাওলানার কথাগুলো লিখেছেন, সে কথাগুলো থেকে আমরা তিনটি জিনিস পাই। এক, ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল হারাম হওয়া। দুই, পকেটে রেখে নামায পড়লে নামায না হওয়া। তিন, যারা এই ক্যামেরাওয়ালা মোবাইলকে যায়িজ বলেন তারা উলামায়ে ছু’ ও গাধা।

প্রিয় পাঠক, প্রথমেই ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল এন্ড্রয়েট সেটের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা থেকে সদ্য প্রকাশিত আট জন মুফতির সাক্ষরিত ফতোয়ার একাংশ তুলে ধরছি- “বলতে গেলে এধরনের সেট পকেট টিলিভিশনের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে তা টিভির

(5)

24

‘আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল’ কিতাবের কয়েকটি ফতোয়া তুলে ধরছি,

(৪) “টিভি দেখা (ভালো-মন্দ) মুতলাকান হারাম।”

(খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৩৪)

(৫) “টিভি হলো نجس العين (মূলগতভাবে নাপাক)। টিভি খারাপ কাজে ব্যবহার করাও খারাপ। ভালো কাজে ব্যবহার করাও খারাপ। বরং অতি খারাপ। কারণ, দ্বীনকে এরকম অপবিত্র জিনিসের সাথে জড়িয়ে দেওয়া আরেক অপরাধ।”

(খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৩০)

(৬) “টিভি এবং টিভির ذريت (বংশধর) ভিডিও, ক্যামেরা মোবাইল, ইত্যাদি কে ‘মুতলাকান’ (ভালো কাজে হোক বা খারাপ কাজে হোক) হারাম মনে করি।

(খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪২৮)

(৭) “টিভি দেখা গুনাহ, শাস্তি আবশ্যিককারী ও লা’নত আবশ্যিককারী। টিভি ঘরে রাখাও লা’নত আবশ্যিককারী। যারা একে বিক্রি করে তারা ওই লা’নতে লোকদের সাহায্য করে।”

(খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৩৮)

(৮) “প্রশ্ন : যদি টিভি দেখা হারাম হয় তাহলে ওলামায়ে কেরাম এতে আসেন কেন? এক মুফতি সাহেব ফতোয়া দিলেন, টিভিতে ইসলাহি প্রোগ্রাম, আখলাকি প্রোগ্রাম, বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম ও দ্বীনি প্রোগ্রামসমূহ দেখার মধ্যে কোনো খারাপি নেই। যে ওলামাগণ ছবি দেখা হারাম বলেন ওনাদের ছবিসমূহ প্রতিদিন পেপার-পত্রিকায় ছাপা হয়। কোনো নতুন জিনিস সত্তাগতভাবে না ভালো, না খারাপ। ভালো এবং খারাপি ওই জিনিসের ব্যবহারের উপর হয়ে থাকে। এরকমি টিভির মাসআলাটি। এখন মাওলানা সাহেব আমরা কি করবো?.....

উত্তর : এই ফতোয়াটি ভুল। টিভি হারাম। কেননা টিভির ভিত্তি হচ্ছে ছবির উপর। আর ছবিসমূহকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপের কারণ বলেছেন। ওলামাদের ছবিসমূহ পেপার-পত্রিকায় ছাপার দ্বারা একটা হারাম জিনিস হালাল হয়ে যায় না। তবে এই হারামে যারা লিপ্ত তারা গুনাহগার হবে। তবে শর্ত হচ্ছে ছবি যদি ওনাদের ইচ্ছা ও অনুমতিতে ছাপা হয়ে থাকে। টিভির অভিশাপে দ্বীন, আখলাক, মানবতা, শিষ্টাচার ও ভদ্রতার শিকরগুলোকে অন্তঃসারশূন্য করে রাখছে। যে ব্যক্তি এই লা’নত ও অভিশাপকে যায়িজ বলেছে সে ব্যক্তি তার পরিণাম ও ফলাফল সম্পর্কে বেখবর এবং সে শরয়ী দলিলসমূহের পরিবর্তে ‘মাসলাহাতে আম্মাহ’ অর্থাৎ, ব্যাপক প্রচলনের প্রয়োজনের উপর ফতোয়ার ভিত্তি রাখছেন। অথচ শরয়ী হুকুম দলিলসমূহ ও আসবাবের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়। জিনিসের ব্যবহারের উপর ফতোয়ার ভিত্তি নয়। হারাম জিনিস ভালোর জন্য কিংবা ভালো নিয়তে ব্যবহার করার দ্বারা হালাল হয়ে যায় না।”

(খন্ড ৮, পৃষ্ঠা ৪৪২)

প্রিয় পাঠক, আমাদের আকাবির হযরতগণ টিভি, ভিডিও ও গ্রামোফোন সম্পর্কে যে কড়া ফতুয়া দিয়েছেন, এর থেকে বুঝা যায় ওনাদের যামানায় আজকের এই ক্যামেরা-ওয়ালা বড় মোবাইলগুলো থাকলে এগুলো সম্পর্কে

ব্যতিক্রম কোনো ফতুয়া দিতেন না। বরং ওনারা বসুন্ধরা ফতুয়া বিভাগের ফতুয়াটির চেয়ে আরও কড়া ফতুয়া দিতেন।

আমাদের অধিকাংশ যুবক যুবতিরা ক্যামেরাওয়ালা বড় মোবাইলের মাধ্যমে ফেসবুক, ইন্টারনেট, মুভি, নাটক, গান, ছবি তোলা, ছবি দেখা, ভিডিও করা, ভিডিও দেখা, ইত্যাদির ক্ষেত্রে এত উপকার(?) ও সুবিধা পাচ্ছে যে টিভিকেও ছাড়িয়ে গেছে। যে সত্য আজকের বিজ্ঞ মুফতিগণ বুঝতে পারছেন। এ সংক্রান্ত আকাবিরদের দেওয়া বিভিন্ন ফতোয়া ও চারিত্রিক অবনতির বর্তমান পরিস্থিতি ইত্যাদি সবকিছুর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে একথা প্রমাণ করে যে, বর্তমান বিশ্বের উলামায়ে কেরামের যে বিশাল জামাত আমাদের আকাবিরদের মেযাজকে ধারণ করে এই ক্রীনট্যাক ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল, টিভি ও ট্যাব ইত্যাদির ব্যবহারকে অপছন্দনীয় ও নাযায়িজ বলে থাকেন তাদের সিদ্ধান্ত সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও খুবই নির্ভরযোগ্য এবং দলিল-প্রমাণের দিক দিয়ে তাদের মতামত অনেক শক্তিশালী। সেই হিসাবে ক্যামেরাওয়ালা মোবাইলের ব্যাপারে মুহতারাম মাওলানার রায়কে ভুল বলতে পারছি না। বরং সর্বাধিক বিশুদ্ধই মনে হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, নামায না হওয়ার বিষয়টি। কিতাবুল ফিকহে (১/৪৩৯) আছে, ছবি যদি মাথার উপর, সামনে, ডানে, বায়ে, কোনো রুমে থাকে তাহলে ওই রুমে নামায পড়লে নামায মাকরুহ হবে। মাসায়েলে নামায, রেফয়াত কাসিমীতে (২৩৮) আছে, لهو و لعب অর্থাৎ খেলা-ধূলা, ফূর্তি-তামাশা-বিনোদন ইত্যাদির জন্য নির্ধারিত স্থানে নামায পড়া মাকরুহ। যে রুমে টিভি চলন্ত ওই রুমে নামায পড়া মাকরুহ। এরকম বিভিন্ন মাসায়েলের উপর নজর দিয়ে যদি মুহতারাম মাওলানা বলে থাকেন যে সবাইকে ডিস্টাব দিয়ে হঠাৎ বেজে ওঠা, ছবি তোলা, ছবি দেখা, ও অধিকাংশের হাতে নাযায়িজ কাজে ব্যবহার হওয়ার যন্ত্র ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল পকেটে রেখে নামায পড়লে নামায হবে না, অর্থাৎ নামায পূর্ণ হবে না, মাকরুহ হবে, তাহলে আমরা তাঁর এই ইজতিহাদকে ছোট করে দেখতে পারি না।

তাছাড়া বহুত ফকিহ নিজের কাছে যা জাহির হয়েছেন তারা দলিলভিত্তিক একক সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন যা আমরা ওনাদের تفردات (ব্যক্তিগত একক রায়) হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকি। সুতরাং এই বিষয়টিকে আমরা মুহতারাম মাওলানার تفردات (ব্যক্তিগত একক রায়) এর অন্তর্ভুক্তও করতে পারি। ওনার ব্যক্তিগত রায়, আমাদের সামনে বলেছেন, আমল করলে আমরা তাকওয়াপূর্ণ আমলে আগাবো। আমাদের কাছে দলিলভিত্তিক মনে না হলে আমরা এর উপর আমল করবো না। এটি নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কিছু নেই।

তাছাড়া আমাদের কাছে এই কাগজ পৌছেছে যে, মুহতারাম মাওলানা এই মাসআলা থেকে রুজু করেছেন, তাহলে তো আর কিছু বলার থাকে না।

তৃতীয়ত, উলামায়ে ছু প্রসঙ্গ। যারা হারামকে হালাল বলে, মোবাইল-টিভি, ঘরের টিভি, নাটক-মুভি দেখাকে যায়েজ বলে, ছবি তোলা, ভিডিও করা ইত্যাদিকে গুনাহই মনে করে না, ইলম দ্বারা দুনিয়া তলব করে, বেপদায় নারীদের সাথে অহরহ ওঠাবসা করে, দাড়ি ছোট রাখে, কবিরাজি, নাযায়েজ তাবিজ-কবজ সব বৈধ মনে করে, সারাক্ষণ দুনিয়ার ধাক্কায় পড়ে থাকে, রাতে ঘুমাতে গেলেও দুনিয়ার ধাক্কায় চিন্তা করে ঘুমায়, মাদ্রাসা-মসজিদের সাথে যাদের শুধু আর্থিক ও পদ-পদবি ও লেনাদেনার সম্পর্ক থাকে, বিদআতকে যারা ইবাদতে আন্মায় পরিণত করছে, কুরআন জানাটা ব্যবসায়ী বিদ্যা মনে করে টিওশনি, কুলখানিতে কুরআন খতম ইত্যাদি করে টাকা ইনকাম করছে, তাদেরকে মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক সাহেবের কাছে জানতে চাই, আপনি কি বলবেন? ইমাম গাযালি রহ. ‘এহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন’ কিতাবে উলামায়ে ছু আর উলামায়ে আখিরাতের যে পরিচয় দিয়েছেন এবং যে শক্ত কথা বলেছেন, সেই হিসাবে তো মুহতারাম মাওলানা সা’আদ সাহেব উলামায়ে ছু ও ত্রিপল গাধা বলে কোনো ভুল করেননি। যারা উলামায়ে ছু তাদেরকে উলামায়ে ছু বলেছেন, আর কী।

তাছাড়া বিশেষ মজলিসে, বিশেষ পরিবেশে, বিশেষ শ্রোতাদের, বিশেষ হালতে অনেক সময় অনেক কথাই অনেকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে যে কথাগুলো সেই মজলিসের সেই সাথীদের খুবই উপকার হয়ে থাকে এবং মজলিসের সবারই অনেক ইসলাহ হয়। কিন্তু যদি সেই কথাগুলো আমভাবে আম মানুষের সামনে রঙিয়ে

পেশ করা হয় তাহলে আমাদের মনে হয় এই ধরনের চক্রান্তকারীদের থেকে কোনো বয়ানকারী বাঁচতে পারবে না।

তারপরও লিখিত আকারে মুহতারাম মাওলানার যে বক্তব্য আমরা পেয়েছি, যেমন তিনি লিখেছেন,

“আমাদের যামানায় মোবাইলে এরকম খেলাফে শরা’-শরিয়ত বিরোধী কথাবার্তা বরং নগ্নতা ও অশ্লিলতায় ব্যবহার হচ্ছে। এই জন্যে বান্দার রায় হলো এতে কুরআন শরিফ ঢুকিয়ে তিলাওয়াত করা কুরআন কারিমের সাথে বিআদবি হয়। এটা আমার ও অনেক উলামায়ে কেরামেরও রায়। অন্যান্য আহলে ইলম এই মতের সাথে ইখতিলাফ করতে পারে। কিন্তু বান্দা এটাকে বয়ান করতে গিয়ে একটা স্থলন তো হলো যে, ইজতিহাদপূর্ণ মাসআলায় ভিন্ন মত অবলম্বনকারীকে বাতিল বলা, যায়েজের প্রবক্তাদেরকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা এবং এদেরকে উলামায়ে ছু’ বলে দেওয়া সীমিতরিক্ত হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষদেরকে এর থেকে বেঁচে থাকার বয়ান করতে গিয়ে হয়েছে।”

মুহতারাম মাওলানার স্বীকৃত এই বক্তব্য আসার পরও কি আমরা এই নিয়ে বলাবলি করতে পারি। যদি করি আমাদের উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

চার মাসহাবের কোনো কিতাবে এই ফতোয়া পাওয়া যায়নি। কোটি কোটি মুসলমানদের ঐসব নামায যা মোবাইল পকেটে নিয়ে পড়েছে, তা কী হবে? সা’দ সাহেবের ভক্তরা কি সেসব নামায কাজা করেছেন?

মন্তব্যের জবাব :

আমাদের আহলে ফাতোয়া প্রায় সকল আকাবিরদের ফাতোয়া থেকে ক্যামেরাওয়ালা মোবাইলের মাসআলাটি উদঘাটন করা যায়। তাফসিলে সামান্য কিছু উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। দ্বিতীয়ত নামায পূর্ণ না হলে অর্থাৎ মাকরুহের সাথে নামায আদায় করা হলে নামায দোহরানোর তো কোনো আবশ্যিকতা নেই। আর মুহতারাম মাওলানার নজরেও যে নামায না হওয়ার বিষয়টি নামায পূর্ণ না হওয়ার অর্থেই ছিল তা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই জন্যেই তিনি নামায দোহরানোর কথা বলেননি।

তাছাড়া এটা ওনার ইজতিহাদ ও تفردات এর অন্তর্ভুক্ত হলে আমাদের জন্য তো এই হুকুম আসবে না। দ্বিতীয়ত, ওনি এই মাসআলা থেকে রুজু করেছেন বলে আমাদের কাছে কাগজ পৌছেছে তাহলে তো এরকম মন্তব্য করে ফ্যাসাদ তৈরি করা সঠিক বলে মনে হয় না। আর যদি রুজু নাও করে থাকেন তাতেও কি অসুবিধা? এটা রুজু হওয়ার মত কিছুই নয়।

৪. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা’আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

মোবাইলে কুরআন শরিফ পড়া এবং শুনা প্রশ্নাবের পাত্র থেকে দুধ পান করার মত।

তাফসিল :

এখানে মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেব সুন্দর একটা উদাহরণ দিয়েছেন। আমাদের আকবিরদের অনেক ফতোয়াতে এজাতীয় উদাহরণের ভিত্তি পাওয়া যায়।

(মালফুজাত (উর্দূ): মাওলানা ইরিয়্যাস রহ. মালফুজ নং ৫৬)

হাকিমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলি খানভি রহ. লিখেছেন,

তিনি আরও লিখেছেন.

তাছাড়া তিনি আরও লিখেছেন,

‘আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল’ কিতাবে আছে,

এবার মুহতারাম মাওলানার উদাহরণটির প্রতি লক্ষ করুন। তিনি কুরআন শরিফের পড়া ও শুনাকে দুধের সাথে তুলনা করেছেন। অপাত্র থেকে দুধ পান করা যেমন সুস্থ রুচি বিরুদ্ধ কাজ। অনুরূপ অপাত্র থেকে কুরআন শরিফ পড়া ও শুনাও তাকওয়াপূর্ণ মেযাজ বিরুদ্ধ কাজ।

বৃদ্ধ দাদার প্রসাবের জন্য নির্ধারিত ও ব্যবহৃত পাত্র থেকে কিংবা কুকুর-বিড়ালকে খাবার দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ও ব্যবহৃত পাত্র থেকে দুধ পান করা যেমন সভ্য রুচি সম্পন্ন মানুষের কাছে নিন্দনীয়। অনুরূপ খেল-তামাশা-বিনোদন, নাচ-গান, নাটক-সিনেমা, অশ্লিলতা ও বেহায়াপনার কাজের জন্য নির্ধারিত ও ব্যবহৃত যন্ত্র থেকে কুরআন শরিফ পড়া ও শুনা তাকওয়াপূর্ণ মেযাজ ও কুরআনের আজমতপূর্ণ অন্তর বিশিষ্ট মানুষের কাছে খুবই নিন্দনীয় এবং কুরআন শরিফের আজমত ও মর্যাদার খেলাফ। তেমনিভাবে ক্যামেরাওয়ালা এন্ড্রয়েট মোবাইলগুলোর মাধ্যমে অধিকাংশ ব্যবহারকারীর হাতে সেই যন্ত্রের কাজই হচ্ছে। হরদম নাচ-গান ও খেল-তামাশায় ব্যবহার করা এই মোবাইলগুলোতে কুরআন শরিফ পড়াও কুরআন শরিফের আদবের খেলাফ। অযু করে আদবের সাথে বসে অজমতের সাথে একখানা কুরআন শরিফ হাতে নিয়ে খুব ধ্যান ও বিনয়ের সাথে প্রত্যেক কুরআন পাঠকারীকে খুলে বুঝানোর প্রয়োজন নেই যে, মোবাইলে শুয়ে শুয়ে কিংবা হেঁটে হেঁটে বৃদ্ধাঙ্গুলের ঘর্ষণে কুরআন শরিফ পড়ার মধ্যে কি পরিমাণ বে-হুন্নমতি রয়েছে। মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেবের এই উদাহরণ থেকে তা'জিমে কুরআনের ক্ষেত্রে ওনার পবিত্র মেযাজকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি এবং এটাও উপলব্ধি করতে পারছি যে, মাওলানা আমাদের আকাবিরদের তাকওয়াপূর্ণ মেযাজকে উন্মত্তের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মাওলানার উদাহরণের মধ্যে আমাদের আকাবিরদের উচ্চ তাকওয়ার ঘ্রান পাই।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

তাহলে যে কাপড় পরে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়, যে মাইক গান-বাজনায় ব্যবহার হয় ও যে ডেকোরেটরের জিনিসপত্র দিয়ে নাচ-গানের আয়োজন করা হয়, এই কাপড় পরে নামায পড়া, এই মাইক ও ওয়াজ-নসিহতে ব্যবহার করা এবং ডেকোরেটরের এই সামান দিয়ে কোনো তাবলিগী ইজতেমার আয়োজন করা কী জায়েজ নয়?

মন্তব্যের জবাব :

অভিযোগকারীর কিয়াস ও যুক্তিগুলো সঠিক হয়নি বলে মনে হয় এবং মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেব (দাঃবাঃ) ও মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধইয়ানভি শহিদ রহ. প্রমুখ আকাবিরের কথাগুলোর সাথে খাপ খায়নি। ওনার উদাহরণ দেওয়ার দরকার ছিল এরকম, যে কাপড়ের টুকরা মেয়েদের 'কুরসুফ' হিসাবে নির্ধারিত ও ব্যবহৃত সে কাপড়টি পরিস্কার করে তার দ্বারা কুরআন শরিফের গিলাফ বানানো কুরআনের আজমতপূর্ণ অন্তর বিশিষ্ট কোনো মানুষ সঠিক মনে করবে না। বিনোদনের জন্য নির্মিত ও মুভি প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত সিনেমাহলে কোনো মুমিন মুত্তাকি মাদ্রাসার হলের সাথে কিয়াস করে কুরআন শরিফ পড়া সমোচীন মনে করবে না। বরং এর দ্বারা কুরআন শরিফের অবমাননা হয়।

৫. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

কুরআন শরিফ শিখিয়ে যারা বেতন গ্রহণ করেন তাদের বেতন বেশ্যার উপার্জনের চেয়েও খারাপ। যে ইমাম এবং শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন বেশ্যারা তাদের আগে জান্নাতে যাবে।

তাকসিল :

যারা ইলম ও কুরআনকে কেবল দুনিয়া হাসিলের মাধ্যম বানাবে তাদের আগে বেশ্যারা জান্নাতে যাওয়ার বয়ান মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেব নিজে থেকে করেননি। বরং তাঁর আগে অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসগণ করে গেছেন। তিনি শুধু নকল করেছেন মাত্র। ইলম ও আমলের মাকসাদ সহিহ করার উদ্দেশ্যে এ জাতীয় 'অয়ীদ' সংক্রান্ত রেওয়ায়াত উল্লেখ করে বয়ান করা নতুন নয়।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিস, আল্লামা আহমদ বিন আলি খতিবে বাগদাদি রহ (মৃত-৪৬৩ হি.) এর রচিত الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع নামক কিতাবে হাদিসের (বর্ণনা ও শিক্ষা) উপর প্রতিদান গ্রহণ করা থেকে মুহাদ্দিস নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত হাদিসটি উল্লেখ করেন,

أنا أبو الحسن علي بن إبراهيم البصري ، نا أبو بكر يزيد بن إسماعيل بن عمر الخلال ، نا العباس بن عبد الله بن أبي عيسى الترقفي نا جبارة بن المغلس نا المعلى بن هلال الأحمر عن ليث ، عن مجاهد ، قال : قال عمر بن الخطاب يا أهل العلم والقرآن لا تأخذوا للعلم والقرآن ثمنا ، فيسبقكم ال دناة (أو الزناة) إلى الجنة

অর্থঃ খতিবে বাগদাদি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছে আবুল হাসান আলি বিন ইব্রাহিম আল বাসারি। তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবু বকর ইয়াযিদ বিন ইসমাইল বিন উমর আল খাল্লাল। তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আব্বাস বিন আব্দুল্লাহ বিন আবু ইসা তারকুফি। তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন জুবারা বিন মুগাল্লিস। তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুয়াল্লা বিন হেলাল আহমার। তিনি বর্ণনা করেছেন লাইস থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন মুজাহিদ থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন উমর রাদি. থেকে।

উমর বিন খাত্তাব রাদি. বলেন,

“হে ইলম ও কুরআন ওয়ালাগণ, তোমরা ইলম ও কুরআনের মূল্য গ্রহণ করো না। নতুবা তোমাদের আগে ইতর লোকগুলো জান্নাতে চলে যাবে।”

বিঃদ্রঃ এই হাদিসটি পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ, কানযুল উম্মালের মুসান্নিফ, ইবনে মাবরিদ রহ. ও হায়াতুস সাহাবার মুসান্নিফ রহ. الذناة (ইতররা) এর পরিবর্তে الزناة (যিনাকাররা) এর সাথে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত খতিবে বাগদাদির কিতাবে الزناة ই হবে, শুধু নুসখার ব্যবধান।

তারপর উমর রাদি. এর বংশধর, হাম্বলি ফকিহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসুফ বিন হাসান ইবনুল মাবরিদ রহ. (মৃত-৯০৯ হি.) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب নামক কিতাবে এ হাদিসটিকে উল্লেখ করেছেন।

তারপর বিখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ঐতিহাসিক আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি রহ. (মৃত-৯১১ হি.) الجامع الكبير নামক কিতাবে উক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেন।

তারপর বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ, আলি আল-মুত্তাকি আল-হিন্দি রহ. (মৃত-৯৭৫ হি.) كنز العمال নামক কিতাবে ১ম খন্ডে, ২২৯ পৃষ্ঠায় এই হাদিসটি উল্লেখ করেন।

তারপর হযরতজি মাওলানা ইউসুফ সাহেব (মৃত-১৯৬৫ ঈসায়ী) এই হাদিসটিকে এক حياة الصحابة বলিয়মে মিশরি ছাপায় ১৩ নং অধ্যায়ে, ১৪৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন।

তারপর মাওলানা জোবায়ের সাহেব কর্তৃক অনূদিত, অক্টোবর-১৯৯৫ ইং, দারুল কিতাব, ৫০ বাংলাবাজার থেকে প্রকাশিত, বাংলা হায়াতুস সাহাবার ৪ খন্ডে, ৬০২ পৃষ্ঠায় তিনি এই হাদিসটির অনুবাদ করেন।

উপরোক্ত হাদিসটির সনদের উপর বিস্তর মুতালাআ' অর্থাৎ অধ্যয়ন করে এবং ইমামগণের বিভিন্ন উক্তি দেখে আমরা যা জানতে পারলাম উপরোক্ত হাদিসটি অন্তত পক্ষে 'যায়ীফ' হবে, এবং বড় বড় মুহাদ্দিস যেমন, খতিবে বাগদাদি রহ. ইবনে মাবরিদ রহ. জালালুদ্দিন সুয়ূতি রহ. কানযুল উম্মালের মুসান্নিফ রহ. আরব-আজম সারা বিশ্বে সামাদৃত হায়াতুস সাহাবার লেখক দ্বিতীয় হযরতজি মাওলানা ইউসুফ রহ. উনারা উনাদের কিতাবে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

আর আমরা সবাই জানি, 'তারগিবী' (উৎসাহ প্রদান মূলক) ও 'তারহিবী' (ভীতি প্রদর্শন মূলক) বয়ানে 'যায়ীফ' হাদিস বর্ণনা করা দোষনীয় নয়। আমলি ও ইসলাহি তারাক্কির জন্য এসব হাদিস সকলই বর্ণনা করে থাকেন। আমাদের আকাবির হযরতগণ তাদের লিখিত কিতাবসমূহে মাঝেমাঝে এর চাইতেও দুর্বল, আরও নিম্ন পর্যায়ের 'যায়ীফ' হাদিস বর্ণনা করেছেন। সত্যও বলা যায় না, মিথ্যাও বলা যায় না, এমন ঘটনাও বিভন্ন বয়ানে উল্লেখ করে থাকেন। যার কারণে আরব বিশ্বের অনেক আলেম উনাদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন। তাই বলে কি আকাবিরদের থেকে আমাদের সামান্যতম শ্রদ্ধা কমে গেছে? অবশ্যই নয়। তাহলে কেন মুহতারাম মাওলানার 'তারহিবী' বয়ানে হায়াতুস সাহাবার একটি হাদিস নকল করার কারণে বই ছাপিয়ে সহজ সরল মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে? এবং মুহতারাম মাওলানার বয়ান বিকৃত করা হচ্ছে! কেন?

শাইখুল হাদিস যাকারিয়া রহ. ফাযায়েলে কুরআনে তারহিবী বয়ান হিসাবে উল্লেখ করেন, হযরত উবায় ইবনে কা'আব রাদি. এর বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শরিফের একটা সূরা পড়িয়েছিলাম। সে হাদিয়া হিসাবে আমাকে একটি ধনুক দিলো। আমি ছুর সা. এর নিকট তার আলোচনা করলে তিন ইরশাদ করলেন, তুমি জাহান্নামের একটা ধনুক নিয়েছো। হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাদি.ও ওনার নিজের সম্পর্কে অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করলে ছুর সা. বললেন, তুমি জাহান্নামের একটা স্কুলিঙ্গ আপন কাধে মাঝখানে লটকিয়ে দিয়েছো। অন্য রেওয়াজাতে আছে, তুমি যদি জাহান্নামের একটা বেড়ি গলায় পরতে চাও তবে তা কবুল করো।

এখানে পৌছিয়ে আমি ওই সকল হাফেজদের খেদমতে অত্যন্ত আদবের সহিত আরজ করতে চাই যারা পয়সা কামানো উদ্দেশ্যেই মকতবে কুরআন শরিফ শিক্ষা দিয়ে থাকেন, আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের পদমর্যদা ও যিম্মাদারির প্রতি একটু লক্ষ্য করুন, যারা আপনাদের বদ নিয়তের কারণে কালামে মজিদ পড়ানো বা হিফজ করানো বন্ধ করে দেয় তার আযাবে শুধু তারাই থেফতার হবে না। বরং আপনাদেরও তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এবং আপনারাও কুরআন পাক পড়া বন্ধ করণেওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আপনারা মনে করেন যে, আমরা কুরআন প্রচার করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরাই তা প্রচারের পথে প্রতিবন্ধক। আমাদের বদ স্বভাব ও বদ নিয়তই দুনিয়াকে কুরআন পাক ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছে। ওলামায়ে কেরাম তালিমের বিনিময়ে বেতন

নেওয়াকে এই জন্যে যায়েজ বলেন নাই যে, আমরা তাকে উদ্দেশ্য বানিয়ে নিবো। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকদের আসল উদ্দেশ্য তালিম এবং কুরআনি ইলমের প্রচার-প্রসার। বেতন তার বদলা নয়। বরং জরুরত মিটানোর একটি উপায় মাত্র, যা একান্ত বাধ্য হয়ে এবং অপরাগতার কারণেই এখতিয়ার করা হয়েছে।

(ফাযায়েলে কুরআন, অনুবাদঃ মুফতি মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ, নজরে সানিঃ মাওলানা যুবায়ের ও মাওলানা রবিউল সাহেব, পৃষ্ঠা-২৮১-২৮২)

শাইখুল হাদিস ফাযায়েলে সাদাকাতে ওলামায়ে আখিরাতের পরিচয়ের যে বারোটি নিদর্শণ উল্লেখ করেছেন তার প্রথমটিই হচ্ছে নিজ ইলম দ্বারা দুনিয়া কামাই করেন না।

(ফাযায়েলে সাদাকাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৫)

শাইখুল হাদিস সাহেবের এই তারহিবি তালিম থেকে যুগ যুগ ধরে ইসলাহ ও তরবিয়তের খোরাক নেওয়া হচ্ছে, কেউ তো এর থেকে বিভ্রান্তি ছড়ানোর নুকতা বের করার পিছনে পড়ছে না। তাহলে কেন মুহতারাম মাওলানার ব্যাপারে আমরা ব্যতিক্রম করছি।

বরং মুহতারাম মাওলানার মূল কথা যা আমরা সরাসরি শুনেছি তার সারসংক্ষেপ হলো, “বেতন ইত্যাদি তা’লিমের বদলা ও উজরত নয়, বরং সেটা সময়ের জন্য বন্দি হয়ে যাওয়া, ইত্যাদির বদলা”। কত সুন্দর কথা, আর এটাকে বিকৃত করে মাওলানার ‘ভুল’ কিভাবে সাজানো হয়েছে। অনেক মানুষ এই যবানের কারণেই জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

এসম্পর্কীয় মুহতারাম মাওলানার মূল বয়ানটি বই আকারে আমাদের কাছে আছে, সেখান থেকে সে অংশটুকু এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

পাকিস্তানে মাদ্রাসার তুলাবাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বয়ানের কিছু অংশ-

“মেরে মুহতারাম দোস্ত ও বুয়ুর্গ, আমাদের এই ইলমের উপর মেহনতের এক রোখ (টাগেটি) এটাও হয়েছে যে, মেহনত করে এই জন্যে যোগ্যতা বানাচ্ছি যেন আমি অন্য জায়গায় পড়ানে-ওয়ালা হয়ে যাই। আমার পড়াশুনা হোক। আমি আমাকে বলি, নিজের যোগ্যতা বানিয়ে নাও। তা না হলে ফারেগ হওয়ার পর পেরেশান হবো। কারণ, আমি তো নিজের যোগ্যতা বানাই নাই। আজ আমার ইলম কামাইয়ের উপযুক্ত কিভাবে হয়। না, এই ইলম কামাইয়ের জন্য নয়। এই ইলম তো মাকতুব, মাকসুব নয়। ইলম কামাইয়ের মাধ্যম নয়। অতএব যদি ইলম ইতায়াতের উদ্দেশ্যে না হয় তাহলে এই ইলম তিজারাত হয়ে যাবে, মুলাযামাত হয়ে যাবে। কি হয়ে যাবে? ব্যবসা অথবা চাকুরি যে, পড়ার পরে চাকুরীর তালাশ করা হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন সাহাবি সকলকে মুআল্লিম বানিয়েছিলেন। আমরা সর্বপ্রথম এই ইলম শেখার মধ্যে আপন নিয়ত ও গরজ ঠিক করি। ইলমের গরজ আল্লাহ পাকের ইতায়াত। আর ইলম উম্মত পর্যন্ত পৌছানো উম্মতের আমানত। আর আমানত পৌছানোর দ্বারা কোনো বদলা হয় না। তো ইলমকে কামাইয়ের মাধ্যম বানাবো না। হযরত উমর রাদি। বলতেন, যে কিনা কুরআন শিখানোকে, দ্বীন শিখানোকে কামাইয়ের মাধ্যম বানিয়েছে, যে, এর মাধ্যমে পয়সা কামাবো, তাহলে এক রেওয়ায়াতে পাওয়া যায় دناة (ইতররা), অন্য রেওয়াতে কেউ কেউ বলেন دناة (যিনাকাররা)। এরকম ইতর লোক ওই আলিমের আগে জান্নাতে চলে যাবে, যে আলিম দ্বীন শেখানোকে কামাইয়ের মাধ্যম বুঝেছে। অথবা زاني লোক এই আলিমের আগে জান্নাতে চলে যাবে যে আলিম কুরআন শিখানো অথবা দ্বীন শেখানোর জন্য পয়সা নিবে। অতএব যে কুরআন শিখানো তথা দ্বীন শেখানোর জন্য পয়সা নিবে সে دناة অথবা دناة অর্থাৎ এই নীচু নীচু নিকৃষ্ট লোককেও তার আগে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. হায়াতুস

সাহাবাতে লিখেছেন, ইলম শিখানোর উপর, ইলম পৌছানোর উপর উম্মতের কাছ থেকে বদলা নিও না। তানাহলে বদকার লোক, কমিনা লোক তোমাদের আগে জান্নাতে প্রবেশ করে ফেলবে।

এই জন্য শিখবো তো নিজের ভিতর ইতায়াত ও মান্যতা পয়দা করার জন্য। নিজেকে নিজে ইতায়াতের উপর আনার জন্য। আমার রব আমার কাছে কি চাচ্ছেন। সুতরাং এই ব্যক্তিই আলেম। বাকি কুরআন ও হাদিসের ইবারতকে হল করা ও বুঝার জন্য যত উলূম আছে, যত ব্যাকরণ আছে সেগুলো হলো মাধ্যম। মাধ্যম কখনো উদ্দেশ্য হয় না। যেমন কেউ নাহুর মধ্যে পাকা হয়ে গেলো, সরফের মধ্যে পাকা হয়ে গেলো, আর সে মনে করলো আমার ইলম হাসিল হয়ে গেছে। আসলে তার তো ইবারত সমাধান করার মাধ্যম হাসিল হয়েছে মাত্র। ইবারত সমাধান করে বুঝবো যে, আমার রব আমার কাছে কি চাচ্ছেন। এই ইলম তাকওয়া পয়দা করলে পরে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত ওই ইলম দান করবেন যা তার কাছে নাই। আর যে ইলম তার কাছে আছে উহার উপর তাকে আমলের তাওফিক দিবেন। হযুর সা. ওই সাহাবিকে বলেছিলেন যিনি বলেছিলেন, আমি চাই যে, আমি সবচে বড় আলেম বনে যায়। তখন তিনি বললেন,

اتق الله تكن أعلم الناس

অর্থঃ তুমি আল্লাহর জন্য তাকওয়া অবলম্বন করো তাহলে তুমি সবচে বড় আলেম হয়ে যাবে। যাকিছু ইলম এসেছে এর উপর আমলের তাওফিক, যা আসে নাই আল্লাহ পাক তোমাকে ওই ইলম শিখিয়ে দিবেন, যা তোমার কাছে নাই। অতএব ইলম উনিই দান করবেন। এই জন্যে এটা আসল নয় যে, আমি এই জন্যে শিখছি যে, আমি অপরকে শিখাবো। হযরত মূসা আ. যখন হযরত খিযির আ. থেকে পৃথক হচ্ছেন তো আখিরি কথা পেশ করলেন যে, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তখন হযরত খিযির আ. বললেন, ইলম এই জন্যে কখনো অর্জন করো না যে, অপরকে শিখাবো। বরং ইলম এই জন্যে অর্জন করো যে, ইলম মোতাবিক চলবো। তিনি মূসা আ. কে বললেন, ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্য মানা। না অন্যদের শিখানো, না অন্যদের বলা যে, আমি তা জানি যা তোমরা জানো না। এটাতো মানুষের মধ্যে ইলমের অহংকার সৃষ্টি করবে। আর ইলমের অহংকার তো অজ্ঞতার অহংকার থেকেও মারাত্মক।”

আসলে মুহতারাম মাওলানা সা’আদ সাহেব যে চিন্তা থেকে কথাগুলো বলেন আমরা যদি সে চিন্তাটুকু ধরতে পারতাম তাহলে আমাদের আর কোনো এশকাল থাকতো না। তারপরও মুহতারাম মাওলানা বিশৃংখলা বন্ধে লিখিত আকারে উম্মতের কাছে সুন্দর কথা প্রকাশ করেছেন।

মুহতারাম মাওলানা লিখেছেন,

“মূলত বান্দা এটা জানে যে, হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাযহাবে নেক কাজের উপর উজরত অর্থাৎ বিনিময় নেওয়া যায়েজ নেই। কিন্তু পরবর্তী উলামাগণ যায়েজ হওয়ার যে অনুমতি দিয়েছেন সেটা হলো সময়ের বন্দির বদলা এই হিসাবে। সুতরাং এটাকে আমরা তা’লিমের উজরত-বিনিময় বলতে পারি না। কিন্তু বান্দা এই মাফহুম (বক্তব্য) আদায় করতে গিয়ে ত্রুটি হয়ে গেছে এবং কথা এমন আন্দায়ে বলে দিয়েছি যে, যার কারণে ইলমে দ্বীনের শিক্ষকদের ব্যাপারে তাদের উজরত-বেতন নেওয়া না যায়েজ হওয়ার উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে গেছে। কথার এই প্রভাব থেকে বান্দা স্পষ্ট বাক্যে রুজু করলাম।”

(সূত্র : সংশ্লিষ্ট রুজুনামা)

এই বক্তব্য আসার পর এই নিয়ে কথা বলা আমাদের মনে হয় ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নই।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

তাহলে হেদায়া, বাহরুর রায়েক, শামী ও আলমগিরী সহ ফতোয়ার কিতাবাদি ছেড়ে দিয়ে মুফতি সাঁদের ফতোয়ার উপর উম্মত চলবে? বেশ্যা মহিলারা এসব আলেমদের আগে বেহেশতে যাবে, তা কোন আয়াত বা হাদিসে বর্ণিত আছে? বললে উপকৃত হবো! যদি কোনো দলিল না থাকে তবে কোন যন্ত্রনায় পড়ে তিনি এ মন্তব্য করলেন।

মন্তব্যের জবাব :

ইসলাহ ও তরবিয়তের জন্য ‘তারগিবী ও ‘তারহিবী’ বয়ানে বর্ণিত সব রেওয়াযাতকে ফতোয়ার রেওয়াযাত মনে করাটা অভিযোগকারীর ভুল। যে কথার দলিল মাওলানা চেয়েছেন সে দলিল ও রেওয়াযাত প্রিয় পাঠক, আপনাদের খেদমতে পেশ করেছি। অভিযোগকারী যদি জানতো মুহতারাম মাওলানা সাঁআদ (দাঃবাঃ) এর কী যন্ত্রনা ও মর্মজ্বালা তাহলে তিনি সারা জীবন মুহতারাম মাওলানা উলামাদের জন্য যে তারতিব বাতলিয়ে যাচ্ছেন সে তারতিব মেনে চলতেন।

৬.অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সাঁআদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

মাদরাসাগুলোতে যাকাত না দেওয়া হোক। মাদরাসায় যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না।

তাফসিল :

যাকাত কাদের দিতে হবে আল্লাহ তাঁআলা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে উল্লেখ করে দিয়েছেন।

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة - 60)

অর্থঃ নিশ্চয় সদকাসমূহ (যাকাত) (১) ফকিরদের জন্য, (২) মিসকিনদের জন্য, (৩) যাকাত উসুলকারীদের জন্য, (৪) (ইসলামের দিকে ধাবিত করার লক্ষ্যে) কাফিরদের অন্তর জয় করার উদ্দেশ্যে সেই কাফিরদের জন্য, (৫) চুক্তিবদ্ধ গোলামদের জন্য, (৬) ঋণ আদায়ে অক্ষম ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্য, (৭) আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ ও গায়ীদের জন্য, (৮) মুসাফিরদের জন্য, (এসব) আল্লাহ তাঁআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ তিনি মহা জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

(সূরাহ তাওবা, আয়াত-৬০)

সাহাবাদের ইজমা দ্বারা ৪ নং প্রকার বাদ যাবে। তাদেরকে দেওয়া যাবে না। কারণ, ইসলামের সূচনা লগ্নে যখন কাফিরদের আধিক্যতা ছিল তখন তাদের মনজয় ও ইসলামের দিকে ধাবিত করার জন্য এবং তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদেরকে দেওয়া হতো। পরবর্তীতে এ পরিস্থিতি না থাকায় তারা বাদ পড়ে

যায়। ৩ নম্বরে যে উসুলকারীর কথা বলা হয়েছে সে হলো মুসলমানদের আমিরের পক্ষ থেকে যাকাত উসুল ও বন্টনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি। ৬ ও ৭ নম্বরের ঋণগ্রস্থ ও গাযীদের বেলায় দরিদ্রতা শর্ত। দরিদ্রতার কারণে ঋণ আদায় করতে পারছে না এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারছে না।

তারপর কথা হলো, যে মাযহাবের অনুসরণ আমরা করে থাকি, হানাফি ফকিহগণের মতে যাকাত আদায়ের শর্ত হচ্ছে যাকাত পাওয়ার হকদার ফকির ও মিসকিন ইত্যাদিকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে। যে যাবৎ তাদের হাতে যাকাতের মাল না পৌছবে ততক্ষণ পর্যন্ত যাকাত আদায় হবে না। একথার কিছু দলিল নিম্নে পেশ করছি।

في التبیین
تَمْلِكُ الْمَالِ مِنْ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ (238\3) كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ

অর্থঃ হাশেমি ও হাশেমি গোলাম ব্যতিত মুসলিম ফকিরকে মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া (যাকাত আদায়ের শর্ত)।

(তাবয়ীনুল হাকায়েক, ৩/২৩৮।)

অনুরূপ ফতোয়ায়ে আলমগিরির মধ্যেও আছে।

وفي رد المحتار
تمليك المال من فقير مسلم (378\2)

অর্থঃ মুসলিম ফকিরকে (যাকাতের) মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া (যাকাত আদায়ের শর্ত)।

(ফতোয়ায়ে শামি-২/৩৭৮)

وفي الفتاوى الهندية

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ بِالزَّكَاةِ الْمَسْجِدَ ، وَكَذَا الْقَنَاطِرُ وَالسَّقَايَاتُ ، وَإِصْلَاحُ الطَّرِيقَاتِ ، وَكَرِّي الْأَنْهَارِ
وَالْحُجَّ وَالْجِهَادُ وَكُلُّ مَا لَا تَمْلِكُ فِيهِ (134\5)

অর্থঃ যাকাতের মাল দিয়ে মসজিদ নির্মান করা, অনুরূপ ব্রিজ ও পানির নালা নির্মান করা যায়েজ নেই।

(ফাতোয়ায়ে আলমগিরি-৫/১৩৪)

وفي الفتاوى الهندية

إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى الْفَقِيرِ لَا يَتِمُّ الدَّفْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْهَا أَوْ يُقْبَضْهَا لِلْفَقِيرِ مَنْ لَهُ وَلَايَةٌ عَلَيْهِ نَحْوَ الْأَبِ
وَالْوَصِيِّ يُقْبَضَانِ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ (148\5)

অর্থঃ যাকাতের মাল যখন ফকিরের কাছে সোপর্দ (আদায়) করে দেয় সে সোপর্দ বা আদায় পূর্ণ হবে না যে যাবৎ ফকির সে মালকে কবজা অর্থাৎ নিজের হস্তগত না করবে। কিংবা ফকিরের জন্য ফকিরের অভিভাবক কবজা না করবে, যেমন বাবা ও অসি, তারা কবজা করবে বালকের জন্য এবং পাগলের জন্য।

(ফাতোয়ায়ে আলমগিরি-৫/১৪৮)

অনুরূপ খুলাসা নামক ফাতোয়ার কিতাবে মধ্যেও আছে।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যদি মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেব উক্ত কথা বলেও থাকেন, সত্য বলেছেন। যাকাতের মাল মাদ্রাসায় দেওয়া হয় যদি মাদ্রাসার ভূমি ক্রয় করার জন্য, কিংবা মাদ্রাসা-ভবন নির্মানের জন্য, কিংবা শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য তাহলে এই উদ্দেশ্যে মাদ্রাসায় যাকাত দেওয়া যায়েজ নেই এবং যাকাত আদায়কারীর যাকাত আদায় হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাতের মাল দেওয়া হয়নি। বরং মাদ্রাসার উন্নতির জন্য দেওয়া হয়েছে। যদি মাদ্রাসার গরিব ও যাকাতের মাল নেওয়ার যোগ্য ছাত্রদের যাকাত দেওয়া হয় তাহলে ছাত্রদের হাতে না পৌছা পর্যন্ত যাকাত আদায় হবে না। যখন এই মালের মালিক ছাত্রদেরকে বানিয়ে দেওয়া হবে তখনই যাকাত আদায় হবে। আল-হামদুলিল্লাহ, আমাদের জানা মতে আমাদের কওমি মাদ্রাসাগুলোতে সুষ্ঠুভাবে সঠিক পদ্ধতিতেই যাকাতের মাল আদায় করে দেওয়া হয়।

হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলতেন,

যার সারাংশ হলো,

“যাকাত দেওয়ার জন্য যাকাতের হকদার তালাশ করা এত জরুরী, যেমন একজন পাক্ষা নামাযির নামাযের জন্য অযূর পানি তালাশ করা জরুরী। হকদার পর্যন্ত যাকাতের মাল যদি তোমরা পৌছাতে পারো তাহলে এর বরকত এত হবে যে, তোমরা সহ্য করতে পারবে না।”

বিধ্বঃ আহলে ফতোয়া আকাবিরদের কিতাবে আছে, মাদ্রাসার গরিব তালিবুল ইলম, যারা টাকার অভাবে কুরআন-হাদিস পড়তে পারছে না, তাদেরকে যাকাতের মাল দেওয়া অন্য সাধারণ গরিবকে দেওয়ার চাইতে উত্তম। কারণ, এই গরিবদেরকে দিলে যাকাতও আদায় হয়, আবার দ্বীনের খেদমতও হয়।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

ফতোয়াটি কোন কিতাবের ? গরীব ছাত্ররা মাদ্রাসায় পড়ার কারণে কী তাদের জন্য যাকাত হারাম হয়ে গেল? মাদ্রাসার সাথে কেন এত শত্রুতা! আল্লাহ পাক তাকে সহিহ বুঝ দান করুক। আমীন।

মন্তব্যের জবাব :

আসল কথা হলো, যাকাতের হকদারকে যাকাত দিতে হবে। গরীবরাও যাকাতের বড় হকদার। সাধারণ মানুষ হোক কিংবা মাদ্রাসার ছাত্র হোক গরীব হলে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে। অভিযোগকারী যে কথাগুলো মুহতারাম মাওলানার কথা বলে উল্লেখ করলেন তাতে তো গরীবদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না এ কথা নেই। যা বলেছেন তাতো সঠিকই বলেছেন। মাদ্রাসার উন্নতি ও নির্মাণ এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ইত্যাদির জন্য যাকাত দেওয়ার বিধান শরিয়তে নেই। এর কিছু প্রমাণ তো ‘তাহসিলে’ উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ওনি তো মাদ্রাসাগুলোকে দ্বীনের ‘কিলআ’ অর্থাৎ দুর্গ বলে থাকেন। ওনি নিজেও এক মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস। ওনি মাদ্রাসার সাথে শত্রুতা করবেন কেন। ওনি মাদ্রাসাকে অত্যাধিক ভালোবাসেন, এইজন্যই বুঝি এই অপবাদ।

আসল ঘটনা হলো, ওনি মাদ্রাসাকে বেশি ভালোবেসে বেশি ভালো একটি কথা এক বয়ানে বলেছিলেন। আর সেই বয়ানটি বই আকারে আমাদের কাছে পৌছেছে।

বয়ানের সে অংশটুকু আগে পড়ুন।

১৬ শাওয়াল, ১৪২৪ হিজরি, মাদ্রাসায় আরাবিয়া, রাইবেন্ড, পাকিস্তানে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেবের এক বয়ান, যা পরবর্তীতে العلم علما (ইলম দুই প্রকার) নামে প্রকাশিত হয়। ওই বয়ানে ওনি একটি ঘটনা শুনান। যার সারাংশ হলো-

একবার এক ছাত্র ওনার কাছে এসে বলে, আমার মাদ্রাসায় চার বছর কেটে গেলো। অথচ আমার ইলমের তারাক্বি হচ্ছে না। ছাত্রটির বাবা চামড়ার বড় ব্যবসায়ী ছিল। তখন ওনি তাকে বললেন, তুমি কিতাব কোথা থেকে নাও? সে বললো, মাদ্রাসা থেকে। খানা? সে বললো, মাদ্রাসা থেকে খাই। থাকা? বিদ্যুত? পানি? তখন সে বললো, মাদ্রাসার। আমি মনে করতাম, আমার বাবা মাদ্রাসায় যাকাত দেয়। তাই মাদ্রাসার মধ্যে আমার বড় হক আছে। তখন মুহতারাম মাওলানা বললেন, তোমার ইলম কোথা থেকে আসবে। তুমি তো যাকাতের মালের হকদার না। সে বললো, তাহলে আমি কি করবো। তখন ওনি বললেন, তুমি মাদ্রাসার কোনো জিনিস ব্যবহার করো না। কিতাবও না, খানাও খাবে না। থাকার বদলায় মাদ্রাসায় কিছু টাকা দিয়ে দাও। এক মাস পর সে এসে বললো, আলহামদুলিল্লাহ, আমার ইলমের তারাক্বি হচ্ছে। এখন সে মাওলানাও হয়েছে। প্রতি বছর চিল্লা দেওয়ার ব্যাপারেও মজবুত। এই ঘটনা শুনিye মাওলানা ছাত্রদের খেতাব করে বললেন, বাবা মাদ্রাসায় যাকাতের টাকা দেয় আর ছেলে মাদ্রাসা থেকে ফ্রি খায়। কিভাবে ইলমে তারাক্বি হবে। যাকাত তো মালের ময়লা। তার ঘরের মালের ময়লা তাকে ইলম থেকে বঞ্চিত করেছে।

“আমি আমাদের ওখানে সাথীদেরকে বলি, ভাই, আপনারা মাদ্রাসায় যাকাতের মাল কেন দেন। যে মাল আপন খাহেশাত ও চাহিদার জন্য খরচ করছেন, সেখান থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে মাদ্রাসায় খরচ করেন। তারপর যেটা যাকাতের পরিমাণ বের হবে সেটা হকদারদের উপর খরচ করেন। কেন, এই জন্যে যে, মালের ময়লা দিয়ে ইলমের নূর হাসিল করা যাবে না। যেহেতু যাকাত হলো মালের ময়লা। তা নাহলে মাদ্রাসায় অনেক ক্ষেত্রে নিজে সাহেবে নেসাব (নেসাবের মালিক) হয়েও যাকাতের মালের মধ্যে হকদার হয়ে যাবে। তারপর আমাদের কিছু সাথী বলেছে, আমরা নিজেদের সখের খরচ থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ইলমের মেহনতে লাগাবো আর যাকাতের জন্য হকদার তালাশ করবো।”

প্রিয় পাঠক, মুহতারাম মাওলানা অত্যন্ত দামি একটা কথা বললেন। লাখে যাকাত আসে মাত্র আড়াই হাজার টাকা। তাও এক বছর পর। হাদিসে আবার এটাকে বলা হয়েছে মালের ময়লা, নফসের ময়লা। আর ওদিকে খাহেশাতের পিছনে, আরাম-আয়েশ ও সখ-আহলাদে হাজার হাজার টাকা, লাখ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে। মুহতারাম মাওলানা বলতে চাচ্ছেন, ইলমের খেদমতে, দীন হেফাজতের দূর্গ মাদ্রাসায় হালাল কামাইয়ের মধ্য থেকে হাদিয়ার সূরতে প্রতিনয়িত দিতে হবে। এক বছর অপেক্ষা করে মাত্র আড়াই হাজার টাকা, এই মালের ময়লা ও নফসের ময়লার জন্য মাদ্রাসাকে বাছাই কেন করবে। গরিব ছাত্রদের তালাশ করে তাদেরকে গোপনে যাকাতের মাল পৌছে দিবে।

৭. অভিযোগকারীর ভাষায় মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কেবল তিনজন লোকের ‘বাইয়াত’ পূর্ণতা পেয়েছে। আর বাকি সবার বাইয়াত অপূর্ণ। সেই তিনজন হলেন, শাহ ইসমাইল শহিদ, মাওলা ইলিয়াস এবং মাওলা মুহাম্মাদ ইউছুফ।

তাকসিল :

মুহতারাম মাওলানা যদি এ কথাগুলো বলে থাকেন তাহলে বুঝাই যাচ্ছে তিনি হিন্দুস্তানের প্রতি নজর দিয়েছেন। হিন্দুস্তানের মধ্যে যারা উম্মতের হিদায়াত নিয়ে মেহনত ও ফিকির করেছেন তাদের কতক হযরতগণ কোনো হযরতের কাছে অন্যতম হতেই পারেন। হযরতের কাছাকাছি সময়ে যে সকল মাশায়েখগন মেহনত করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখিত তিন হযরতের আলাদা বৈশিষ্ট্যের কথা অনেকেই জানেন। তাদের মধ্যে শুধু নির্দিষ্ট কিছু অজিফার বাইয়াত ছিল না। الفرون الثلاثة তথা খেলাফতে রাশেদার যুগের আদর্শ মোতাবিক পূর্ণ বাইয়াত তাদের মধ্যে ছিল। সাহাবাদের মধ্যে-

البیعة على الإسلام ইসলামের উপর বাইয়াত হওয়া।

البیعة على الجهاد জিহাদের উপর বাইয়াত হওয়া।

البیعة على السمع والطاعة আমীরের কথা শুনা ও আমীরের আনুগত্য করার উপর বাইয়াত হওয়া।

البیعة على اعمال الاسلام ইসলামের আমলসমূহের উপর বাইয়াত হওয়া।

ইত্যাদি বাইয়াতগুলো পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কেবল মাত্র নির্দিষ্ট কিছু অজিফার বাইয়াত ছিল না। হ্যাঁ, আ'মালের উপর বাইয়াতের পাশাপাশি জিহাদ ও ইতায়াত ইত্যাদির বাইয়াতও ছিল এবং একজনই বাইয়াত নিতেন। যিনি আমীর হতেন তিনিই বাইয়াত নিতেন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুস্তানের হযরতগণের অনেকের বাইয়াত অনেকের চাইতে অন্যতম ও পুরিপূর্ণ হতে পারে।

হযরত ইলিয়াস রহ. বলতেন,

“ফকিহুল নাফস হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গান্ধুহি রহ. ছিলেন যামানার মুজাদ্দিদ, আমার এই তাজদিদি কাজ (অর্থাৎ মুসলমানদের এক জামাত, এক আমীর ও পূর্ণ এক বাইয়াত এবং ওই জামাত ও আমীরের বর্তমান যামানায় প্রধান দায়িত্ব বা কাজ দীর্ঘ একটা সময় দাওয়াত ও তাবলিগের লাইনে উম্মতের উপর আমভাবে দাওয়াতি জামাত পাঠিয়ে পূর্ণ রূপে সাহাবা-ওয়ালা আদর্শ এবং খেলাফতের আদর্শ যিন্দা করার পরিবেশ তৈরি করা। সাহাবাদের মত জিহাদের ময়দানে জান দেওয়ার পাগল তৈরি করা ইত্যাদি) উনারই তাজদিদ (সংস্কার)। আর তাজদিদের সমস্ত কাজ সরাসরি মুজাদ্দিদ থেকে প্রকাশ হওয়া জরুরী নয়। উনার কোনো লোকের দ্বারা প্রকাশ পেলেও সেটা উক্ত মুজাদ্দিদেরই তাজদিদের অন্তর্ভুক্ত।”

সুতরাং সেই হিসাবে যদি মুহতারাম মাওলানা হিন্দুস্তানের অন্যতম কিছু বাইয়াত, বাইয়াত গ্রহণকারী ও প্রদানকারীর কয়েকটি নাম উল্লেখ করেন, তাতে কোনো দোষ হতে পারে না। কারো কাছে কেউ অন্যতম হতে পারে, এটা এক সাধারণ নিয়ম। এখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ অবৈধ হস্তক্ষেপ বলেই মনে হয়।

এখান থেকে মুহতারাম মাওলানা ও এই সিলসিলার পূর্ব আমীরগণের মন-মেয়াজ কতটুকু সিরত-মনা তা আমরা বুঝতে পারি। দাওয়াতের লাইনে যেভাবে রুসুম-রেওয়াজ থেকে উঠে সাহাবা-ওয়ালা দাওয়াত ও মেহনত যিন্দা করা হচ্ছে এবং ফলপ্রসূও হচ্ছে। ঠিক তেমনি ভাবে বর্তমানের অজিফা ভিত্তিক শতধা বিভক্ত প্রচলিত বাইয়াতের পরিবর্তে সাহাবা-ওয়ালা বাইয়াত নেওয়া হচ্ছে, যা হক তালাশকারী আহলে ইলম সকলের কাছেই স্পষ্ট। মুসলমানদের জামাত একটাই হবে। আমীর একজনই থাকবে। বাইয়াত একটাই হবে। এখন আমরা মাওলানা ইসমাইল শহিদ সাহেব, মাওলানা ইলিয়াস রহ. ও মাওলানা ইউসুফ রহ. এই সিলসিলার আমিরগণের বাইয়াতের কী বৈশিষ্ট্য তা উল্লেখ করবো।

মাওলানা ইসমাইল শহিদ রহ. তিনি সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. এর হাতে পূর্ণ বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। উনারা মুসলিম জামাতের একজন আমীর নির্ধারন করেছিলেন। উম্মতের ইসলাহ ও তরবিরের পাশাপাশি তাদেরকে নিয়ে হিজরত মেহনত ও জিহাদ করে গেছেন। কাফিরগোষ্ঠি এবং তাদের পদলেহী ও স্বার্থান্বেষী মুসলিম মুনাফিকদের বিরুদ্ধে উম্মতকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। তখনকার আলেম ওলামা অন্য দ্বীনি গু'বায় মশগুল থাকলেও অনেক আলেম ও ফকিহ ওনাদের মেহনতের ময়দানে যোগ দিয়েছিলেন। রাতে লম্বা লম্বা নামায, কান্নাকাটি, দিনে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, শহিদ হওয়া, রক্তে মাখামাখি, ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্তলাল হওয়া এবং যুদ্ধবিহীন দিনে তালিম, তরবির ইত্যাদি সেই মুসলিম জামাতের দৃশ্য আমাদেরকে সাহাবা-ওয়ালা সুনালি যুগকে মনে করিয়ে দেয়। এভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যান। যুদ্ধ করতে করতে পাকিস্তানের বালাকোটের ময়দানে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. , মাওলানা ইসমাইল শহিদ রহ. সহ প্রায় ৩০০ এর মত মুসলিম মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন।

মুহতারাম মাওলানার মত আমাদের আকাবির হযরতগণও উনাদের নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করে থাকেন।

হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস রহ. সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. কে বলতেন,

“আপনার ‘সীরতে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.’ গ্রন্থে আমার জানার বাইরে নতুন কোনো তথ্য যোগ করতে পারেননি। কারণ, আমাদের পরিবারে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. ও শাহ ইসমাইল শহিদ রহ. এর ঘটনাবলী এত বেশি আলোচনা হতো যে, আমাদের মনে হতো এগুলো সে দিনকার ঘটনা এবং খান্দানের ছোট ছোট বাচ্চারাও ওনাদের মেয়াজ তরিকা ও জিহাদি প্রেরণা ধারণ করে চলতো।”

তারপর দাওয়াত ও তাবলিগের প্রথম হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস রহ. প্রচলিত কোনো অজিফা ভিত্তিক বাইয়াত নিতেন না। রুসুম-রেওয়াজের দ্বারেকাছেও যাইতেন না। তিনি বর্তমান গোটা উম্মতের আমূল পরিবর্তন চাইতেন। উম্মতের সকল শ্রেণীভেদের আপোষের দূরত্ব খতম করে বিক্ষিপ্ত মুসলমানদেরকে এই এক মেহনতে জামাতবদ্ধ করণের কাজ শুরু করেছিলেন। নবী-সাহাবাদের শ্রেষ্ঠ যুগে মুসলমানদের এক জামাত কায়ম করার পিছনে যে দাওয়াত ছিল মূল হাতিয়ার সে হাতিয়ার আবার হাতে হাতে তুলে দেওয়ার ফিকির করে গেছেন। ওনি চাইতেন, দাওয়াত-জিহাদ, ঈমান, আমাল, ইলম, যিকির, মুআমালাত, মুআশারাত, জামাত, ইমারাত, ইত্যাত, হিজরত, নুসরত তথা পুরা দ্বীন পুরা আলমে যিন্দা হয়ে যাক, মুসলিম ইসলাম উচু হয়ে যাক, কাফের কুফুর নীচু হয়ে যাক, দ্বীনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় জান দেওয়াটা সহজ হয়ে যাক, দ্বীন বড় হয়ে যাক। সাহাবা-ওয়ালা সেই পুরানো মেহনত, দাওয়াত, জিহাদ, বাইয়াত, ঈমান, আমাল, ইলম, যিকির এবং এসব হাসিলের সাহাবা-ওয়ালা তরিকা সামগ্রিকভাবে সব মুসলমানের মধ্যে পুনরায় যিন্দা হওয়ার মেহনত হলো দাওয়াত ও তাবলিগ। আর এই মেহনতের উপরই তিনি বাইয়াত নিতেন।

মাওলানা মান্জুর নোমানি রহ. ‘দ্বীনি দাওয়াত’ এর ভূমিকায় লিখেছেন,

“যদি বলা হয় চৌদ্দ শতকের মাওলানা মরহুম নিজেও ছিলেন قرن اول অর্থাৎ প্রথম কল্যান-যুগের অতুজ্জ্বল এক হিরকখন্ড, তাহলে আমি কোনো অতিশয়োক্তি মনে করবো না। কিতাবের পাতায় পড়া বিগত যুগের বহু ঘটনা আমাদের বস্তু প্রভাবিত মন বিশ্বাস করতে চাইতো না কিন্তু নিজের চোখে হযরত মাওলানা রহ. এর মাঝে সেগুলোর নমুনা দেখে আলহামদুলিল্লাহ মন এখন এমন আশ্বস্ত যে, হাজার যুক্তি প্রয়োগেও বুঝি তা সম্ভব হতো না।”

(দ্বীনি দাওয়াত, পৃষ্ঠা-৩৫)

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি খানভি রহ. মাওলানা ইলিয়াস রহ. কে বলেছেন,

‘আপনি তো মা-শা-আল্লাহ, হতাশার মধ্যে আশার সঞ্চারণ করেছেন।’

(দ্বীনি দাওয়াত, পৃষ্ঠা- ১১৬)

সাইয়েদ আলি মিয়া নদভি রহ. লিখেছেন,

তাবলিগী জলসা ও ইজতিমা সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মুফতি কেফায়াতুল্লাহ সাহেব বলেছেন,

“পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমি সব রকম ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সভায় অংশগ্রহণ করছি কিন্তু এমন প্রকৃতির এবং এমন বরকতের ইজতেমা আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি।

বস্তুতঃ এই মানব সমাবেশ সাধারণ কোন জলসা ছিলো না। ছিলো এক জীবন্ত ‘খানকা’। দিনের সংসারি এখানে হয়ে যেতেন রাতের সংসারত্যাগী। আবার রাতের ইবাদতগুয়ার দিনের আলোতে হয়ে যেতেন খেদমতগুয়ার। মানুষের কর্মজীবনে এ বিপরীত দুটি গুণের একত্র সমাবেশ ঘটানোই ছিলো হযরত মাওলানার মেহনতের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(দ্বীনি দাওয়াত, পৃষ্ঠা-১৩১)

মাওলানা নদভি রহ. লিখেছেন,

মাওলানা হুসাইন আহদম মদনী রহ. কে লেখা এক পত্রে মাওলানা তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এভাবে তুলে ধরেনে,

“নামায, রোযা, কোরআন, ধর্মপালন, সুন্নতের পাবন্দী ইত্যাদির নাম মুখে উচ্চারণ করলে মুসলিম জাহানে অবজ্ঞা ও উপহাসের চূড়ান্ত করে ছাড়া হয়। এ সকল বিষয়ের মর্যদা ও মহিমা পুনঃ প্রতিষ্ঠার দাওয়াতই হলো এই তাবলিগী মেহনতের মূল লক্ষ্য। ইসলামী জাহানের পরিবেশকে অবজ্ঞা ও অমর্যদা থেকে মর্যদা ও শ্রদ্ধার স্তরে উত্তরণের প্রচেষ্টাই হলো এ কাজের বুন্যাদ।

(দ্বীনি দাওয়াত (বাংলা), পৃষ্ঠা-২৪৫)

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলি মিয়া নদভি রহ. লিখেছেন,

এক দ্বীনী মাদ্রাসার যিম্মাদারকে মাওলানা ইলিয়াস রহ. লিখেছেন,

“কোন শক্তিবলে আমি আপনাদের বুঝাবো? এবং কোন ভাষায় আমি কথা বলবো? কিংবা কোন মন্ত্রবলে আমি আমার মনমস্তিস্কে অন্য কিছু বদ্ধমূল করবো কিংবা নিশ্চিত ও স্বতঃসিদ্ধকে অনিশ্চিত

এবং অনিশ্চিতকে নিশ্চিত ও স্বতঃসিদ্ধ কিভাবে বানাবো? এ সকল ফেৎনায় সর্বপ্লাবী ঢল রোধ করার জন্য কোনো সেকেন্দরীবাধ যদি থেকে থাকে তবে তা হলো আমার এই দাওয়াতি আন্দোলন। আমি পরিস্কার ভাষায় বলতে চাই যে, আমার এ আন্দোলনে পূর্ণ উদ্যম ও কর্মশক্তি, পূর্ণ আবেগ ও প্রাণ চাঞ্চল্য এবং পূর্ণ হিম্মত ও মনেবলের সাথে, অত্যন্ত জোরদারভাবে আত্মনিয়োগ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। গায়বি ইশারায় এ দাওয়াতি আন্দোলনের পথ ও পছা উদ্ভাসিত হয়ে যাওয়াই হলো বর্তমান ব্যাধির অব্যর্থ চিকিৎসা। কুদরতের চিরন্তন নিয়ম এই যে, ব্যাধির উপযোগী চিকিৎসা পদ্ধতি মানুষের হাতে তিনি তুলে দিয়ে থাকেন। তবে আল্লাহর দেয়া চিকিৎসা ও নিয়ামতকে কদর ও সমাদরের সাথে গ্রহণ না করার ফল তেমন ভালো হয়ে থাকে না।”

(আবু তাহের মেছবাহ অনূদিত ‘দ্বীনী দাওয়াত’ মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. পৃষ্ঠা-১১৭)

প্রিয় পাঠক, গোটা উম্মত ও উম্মতের যাবতীয় কাজকর্ম, রাজনীতি, বিচার-আচার, সবকিছুকে নবী ও সাহবা-ওয়ালা আদর্শে আদর্শবান করাই ছিল মাওলানার মূল লক্ষ্য। আর তিনি এই লক্ষ্যের উপরই মুসলমানদের বাইয়াত নিতেন। এভাবে তাঁর পরবর্তী এই সিলসিলার আমীরগণ, হযরতজি মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. একই লক্ষ্যে পূর্ণ দ্বীন ও দ্বীনের মেহনতের উপর বাইয়াত নিতেন। সেই ধারাবাহিকতায় মুহতারাম মাওলানা সা’আদ (দাঃবাঃ)ও গোটা জীবন ও খান্দান ওয়াকফ করে কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন এবং বাইয়াত নিচ্ছেন।

اللهم بارك في حياته. وأيده بتأييدك. ووفقه لتطبيق أحكامك في أرضك. وألهمه السداد. وزده الرشاد. وانصره على أعدائك وأعداء الإسلام والمسلمين. آمين

(হে আল্লাহ, আপনি ওনার হায়াতে বরকত দিন, আপনার শক্তি দ্বারা ওনাকে শক্তিশালি করুন, আপনার যমিনে আপনার আহকামসমূহ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ওনাকে তাওফিক দিন, ওনাকে সঠিক সিদ্ধান্তের ইলহাম করুন, হিদায়াতের উপর ওনার মজবুতিকে বাড়িয়ে দিন এবং ওনাকে আপনার শত্রু, ইসলামের শত্রু ও মুসলমানদের শত্রুদের উপর সাহায্য করুন। আমিন।)

মন্তব্যকারীর মন্তব্য :

শাহ ইসমাইল শহিদের শায়েখ সৈয়দ আহমদ শহীদ, মাও. ইলিয়াস র. এর শায়েখ মাও. খলিল আহমদ সাহারানপুরী, মাও. ইউছুফ রহ. এর শায়েখ শাইখুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ. এর বাইয়াত পূর্ণতা লাভ করতে পারলো না। আবার তাদের মুরিদদের বাইয়াত পূর্ণতা লাভ করলো কীভাবে? তাছাড়া হাসান বসরি,খাজা আব্দুল ওয়াহিদ,ফুয়াইল বিন ইয়ায, ইবরাহিম বিন আদহাম, হুয়াইফা মার’আসী, মুঈনুদ্দিন চিশতী, কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী, ফরীদুদ্দিন শাকরগনঞ্জী, শাকীক বলখী জুনাইদ বাগদাদি, নেযামুদ্দিন আওলিয়া, আলাউদ্দিন ছাবের কালয়ারি, মুজাদ্দিদে আলফে সানি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিদে দেহলভি, হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি, নানুতবি, গাঙ্গুহি, থানবি ও হুসাইন আহমদ মাদানি সহ লক্ষ লক্ষ আওলিয়ায়ে কেরামের বাইয়াত নাকিস ও অসম্পূর্ণ থাকলো। শুধু ইসমাইল শহিদ, ইলিয়াস রহ. ও ইউছুফ রহ. এর বাইয়াত পূর্ণতা লাভ করলো, সা’দ সাহেব তা বুঝলেন কীভাবে?

মন্তব্যের জবাব :

সারা বিশ্ব থেকে খুঁজে খুঁজে অভিযোগকারী যাদের নাম উল্লেখ করলেন তাদের কারোর বাইয়াতকে তো মুহতারাম মাওলানা অস্বিকার করেননি। কারো নাম উল্লেখ না করা তাকে অস্বিকার করা বুঝায় না। অভিযোগকারীও তো খুলাফায়ে রাশিদীনের নাম উল্লেখ করেননি। তাই বলে কি আমরা এ কথা বলবো যে, তিনি হয়তো খুলাফায়ে রাশিদীনের বাইয়াতকে অপূর্ণ মনে করেন। নতুবা তিনি আরব হযরতদের নাম যেহেতু উল্লেখ করেছেন আরব খুলাফায়ে রাশিদীনের কথাও উল্লেখ করতেন! আমরা এরকম আহম্মকি মন্তব্য করবো না।

৮. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

মাওলানা সা'আদ সাহেব আযমগড়ের ইজতেমায় এবং অন্যান্য ইজতেমায় একাধিকবার সুন্নাতকে তিন প্রকার বলে বর্ণনা করেছেন, (১) ইবাদতের সুন্নাত (২) দাওয়াতের সুন্নাত এবং (৩) আচার অভ্যাসের সুন্নাত।

তালফিল :

উম্মতের ফুকাহায়ে কেরাম সুন্নাতকে দুভাগে ভাগ করেছেন,

(১) السنة المؤكدة (তাকিদযুক্ত সুন্নাত) (২) سنن الزوائد (অতিরিক্ত সুন্নতসমূহ)

سنن الهدى (ইবাদতবিশিষ্ট সুন্নাত)ও বলা হয়। سنن العباد (তাকিদযুক্ত সুন্নাত)কে (হিদায়াবিশিষ্ট সুন্নাত)ও বলা হয়। سنن الدين (দ্বীনবিশিষ্ট সুন্নাত)ও বলা হয়। سنة غير المؤكدة (অভ্যাসগত সুন্নাত)ও বলা হয়। سنن الزوائد (অতিরিক্ত সুন্নাত)কে (তাকিদযুক্ত সুন্নাত)ও বলা হয়। তাদের এই প্রকারগুলো করাতে উম্মতের আমল করা অনেক সহজ হয়েছে, নতুবা আমল করা বহুত কঠিন ছিল। আল্লাহ ওনাদের উত্তম বদলা দান করুন।

سنن الهدى (হিদায়াবিশিষ্ট সুন্নাত) বা سنن العباد (ইবাদতবিশিষ্ট সুন্নাত) এর ভিতর দাওয়াতের সুন্নাতও আছে।

যে দাওয়াতের দ্বারা ঈমান থেকে গুরু করে সকল আমল জন্ম লাভ করে, যে দাওয়াতের দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের জামাত তৈরি হয়েছে, যে দাওয়াতের মধ্যে রয়েছে উম্মতের উন্নতি, এত সব গুরুত্বের বিবেচনায় মুহতারাম মাওলানা যদি দাওয়াতের সুন্নাতকে আলাদা করে আমাদের সামনে পেশ করেন তাহলে তিনি ভালোই কাজ করলেন। আমাদের জন্য আরও সহজ করে দিলেন। উম্মত দাওয়াত ও দাওয়াতের সুন্নাতকে আরও গভীরভাবে লক্ষ করবে। দাওয়াতের উপর উম্মত উঠতে সহজ হবে। এরকম সহজ করে যারা আমাদের কাছে নবীর সুন্নাত ও সীরত পেশ করেন, আল্লাহ ওনাদের উত্তম বদলা দান করুন। দাওয়াতি সুন্নাতকে আলাদা করে পেশ করা মুহতারাম মাওলানার যায়েজ কর্ম। এরকম যায়েজ কর্ম, না যায়েজ হয়ে গেলে, একটু ভেবে দেখুন, উম্মতের অতীত উলামায়ে কেরামের হাজার হাজার যায়েজ কর্মকে না যায়েজ বলে বেড়ায়। উলামাদের যায়েজ কর্মকে আমরা যায়েজই বলি, বরং প্রশংসা করি এবং ওনাদের জন্য দুআ করি, ওনারা আমাদের জন্য দ্বীনকে সহজ করে দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা ওনাদেরকে উত্তম বদলা দান করুন।

মনে রাখবেন, তিনি দাওয়াতের সুন্নাহ আলাদা করে এই সুন্নাহের গুরুত্ব দিলেন। কেননা, উম্মতের অধঃপতন এই দাওয়াতকে ত্যাগ করা এবং দাওয়াতের সুন্নাহকে বিকৃত করার কারণেই হয়েছে। আমরা জানি অনেক সময় ‘আম’ (ব্যাপক শব্দ) থেকে ‘আম’ এর ভিতরস্থ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ‘খাছ’ অংশকে বাহির করে উল্লেখ করার নজীর কুরআন হাদিসে ও ফুকাহাদের কিতাবে ভুরি ভুরি রয়েছে। একে আমরা আরবিতে বলি থাকি **ذكر الخاص بعد العام** (‘আম’ এর পরে ‘আম’ এর ভিতরস্থ ‘খাছ’ কে উল্লেখ করা) মুহতারাম মাওলানা তাই করেছেন। ব্যাপকতা থেকে বর্তমান যামানার জরুরী একটা সুন্নাহকে বের করে এর গুরুত্ব প্রদান করলেন। এতে তিনি নিন্দা পাওয়ার কোনো যুক্তিকতা নেই। এরকম কাজ করা মুজতাহিদগণেরই শান।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

দাওয়াতের সুন্নাহ যদি এক ভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে, তবে বিয়ের সুন্নাহ, মুয়ামালাতের সুন্নাহ, মুআশারাতেহ সুন্নাহ, কাফন-দাফনের সুন্নাহ কোথায়? দাওয়াতের সুন্নাহ নামে কোনো পৃথক অধ্যায় ইসলামে নেই।

মন্তব্যের জবাব :

অভিযোগকারী যে সকল সুন্নাহের কথা উল্লেখ করেছেন এসব সহ মানুষের জীবনের সব সুন্নাহ কোনোটা **سنن العبادة** (ইবাদতবিশিষ্ট সুন্নাহ) এর অন্তর্ভুক্ত, আবার কোনোটা **سنن العادة** (অভ্যাসগত সুন্নাহ) এর অন্তর্ভুক্ত। হাদিসের কিতাবে দাওয়াতের অধ্যায় আছে এবং জিহাদের অধ্যায় আছে। এই দুই অধ্যায় সহ কুরআন হাদিসের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাওয়াতের নবী-ওয়ালা সুন্নাহ ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে।

৯. অভিযোগকারীর ভাষায় মাওলানা সা’আদ (দাঃবাঃ) ভুল :

‘দাওয়াতের পথ’ হলো নবীর পথ, ‘তাসাউফের পথ’ নবীর পথ না।

তাহসিল :

প্রিয় পাঠক, এ জাতীয় কথা এই সিলসিলার আমীরগণ, মাওলানা ইলিয়াস রহ. থেকে শুরু করে আকাবির হযরত সকলই বলে গেছেন। দাওয়াতই নবীর পথ। এই এক মেহনতের দ্বারাই উম্মতের গোটা যিন্দগির আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল, ঘটছে, ঘটবে। অন্যন্য পদ্ধতিগুলো যায়েজ এবং নবী ও সাহাবাদের যামানার পরে সময়ের প্রেক্ষিতে তৈরি হয়েছে। মুহতারাম মাওলানা একরম কথা বলে কোনো ভুল করেননি। বরং আকাবির হযরতগণের কথা নকল করেছেন মাত্র।

ফকিহুল উম্মত হযরত মাওলানা মুফতি মাহমুদ হাসান রহ. লিখেছেন,

সব নবীকে, বিশেষ করে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা’আলা শিক্ষক হিসাবে পাঠিয়েছেন। আর দ্বীন শিখা ও শিখানোর দায়িত্ব সবাইকে দেওয়া হয়েছে। শিখা ও শিখানোর তরিকা বিভিন্ন রকমের রয়েছে। প্রথম যামানায় না আজকালের মত মাদ্রাসা ছিল, না খানকা ছিল, না কিতাবাদি রচনার ধারা ছিল, না ওয়াজ নসিহতের মাহফিল ছিল, না বিভিন্ন সংগঠন বানানোর দস্তুর ছিল। সাধারণত মুখে মুখে শিখা-শিখানোর আমল ছিল।... পরবর্তীতে হাদিস জমা করা ও শিখার প্রচলন ঘটেছে এবং এর দ্বারা দ্বীন শিখানো হয়েছে। মাদ্রাসা কায়ম করা হয়েছে এবং এর দ্বারা

দ্বীন শিখানো হয়েছে। এসব তরিকাগুলো যায়েজ ও উপকারীও। প্রথম প্রথম দ্বীন শিখা-শিখানোর যে তরিকা ছিল সেটা কিতাব ছাড়াই ছিল। প্রত্যেক যামানাতেই কিতাব ছাড়া দ্বীন শিখা শিখানোর দস্তুর বাকি ছিল। যদিও হুবহু প্রথম যুগের মত ছিল না, কিন্তু ‘ফন্নান’ (প্রাতিষ্ঠানিক, আনুষ্ঠানিক, বিভাগভিত্তিক ও কিতাবনির্ভর) কখনোই হয়নি। বর্তমানে তাবলিগি জামাতের মুজাহাদায় আল্লাহ তা’আলা আবার সেই তরিকার ব্যাপক প্রচলন ঘটিয়ে দিলেন। সুতরাং এইটা বলা সঠিক যে, দাওয়াত ও তাবলিগ নবীওয়ালা কাজ। মাদ্রাসা ছাড়া, কিতাব ছাড়া দ্বীন শিখা শিখানো চেষ্টা করা, এর জন্য নিজের জীবনকে ওয়াকফ করে দেওয়া সমস্ত নবীদের তরিকা। কিন্তু দ্বীন শিখার অন্যান্য তরিকাকে না যায়েজ বলাও যায়েজ নেই এবং এটা তাবলিগের উসুলের খেলাফ।

(ফাতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪/২০৭)

‘আহাম খত’ গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় হযরতজি মাওলানা ইউসুফ রহ. বলেছেন,

“ভাই, দোস্ত, এই কাজ বড় স্পর্শকাতর। হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটাই মেহনত করেছেন। এই মেহনত দ্বারা সমস্ত মানুষের সমস্ত যিন্দগি কামাই-রোযগার, খাওয়া-দাওয়া, বিয়া-শাদি, মেলা-মেশা, ইবাদাত, মুআমালাত ইত্যাদির পদ্ধতিসমূহের মধ্যে পরিপূর্ণ পরিবর্তন আসে। তাহলে তিনি নিজে এই মেহনতের কতগুলো তরিকা বলবেন? এখনোও আমাদের এই কাজ করার যোগ্যতা আসেনি, আর না হাকিকি কাজ এখনো শুরু হয়েছে! কাজ ওই দিন শুরু হবে যখন ঈমান ও একিন, আল্লাহর মহব্বত, আল্লাহর ধ্যান, আখিরাতের ফিকির, আল্লাহর خوف و خشية (ভয়-ভীতি) যুহুদ, তাকওয়া ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট মানুষ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উচ্চ আখলাকের দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জয়বায় মাতাল হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জান দেওয়ার আগ্রহে আকর্ষিত হয়ে ফিরতে থাকবে।

হযরত উমর রাদি. বলতেন, আল্লাহ তা’আলা খালেদ রাদি. কে রহম করুক, তাঁর দিলের তামান্না শুধু এই ছিল যে, হক ও হক-ওয়ালারা উজ্জল হয়ে যাক। বাতিল ও বাতিল-ওয়ালারা মিটে যাক। আর কোনো তামান্নাই ছিল না। এখন আমাদের নজরে কাজের যে বরকত আসছে সেটা কাজ শুরু হওয়ার পূর্বের বরকত। যেমন হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম থেকেই বরকত জাহির হওয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু আসল কাজ ও আসল বরকত ৪০ বছর পর শুরু হয়েছে। এখন তো এই জন্য মেহনত হচ্ছে যে, কাজ করার লোক তৈয়ার হয়ে যায়। আল্লাহ তা’আলা কাজ তার থেকে নিবেন এবং হেদায়াত প্রচারের মাধ্যম তাকেই বানাবেন যার জীবন নিজের দাওয়াত মোতাবেক পরিবর্তন হবে। যাদের জীবনে পরিবর্তন আসবে না আল্লাহ তা’আলা তাদের থেকে আপন দ্বীনের কাজ নিবেন না। এইটা নবী-ওয়ালা কাজ।”

মাওলানা মানজুর নোমানি রহ. লিখেছেন, মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলতেন,

“তরিকতের (তাসাউফের) খাছ উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা’আলার হুকুম ও আদেশাবলীর প্রতি উৎসুক স্বভাব এবং নিষেধসমূহের প্রতি অপছন্দনীয় স্বভাব হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ এমন অবস্থা হয়ে যাওয়া যে, আল্লাহর হুকুম পালনে স্বাদ ও আনন্দ অর্জিত হয় এবং নিষেধাবলীর কাছে গেলে কষ্ট ও অপছন্দ লাগে। এটা তো তরিকতের উদ্দেশ্য। বাকি যাকিছু অর্থাৎ বিশেষ যিকির ও অজিফা এবং বিশেষ প্রকার রিয়াজত-সাধনা ইত্যাদি ওই উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যম। কিন্তু আজ বহুত লোক এই মাধ্যমগুলোকেই আসল তরিকা বুঝতে শুরু করেছে। অথচ এসব মাধ্যমের মধ্যে কিছু কিছু তো বিদাতও আছে। অতএব এসব জিনিসের অবস্থা যেহেতু মাধ্যম হিসাবে এবং এসব সত্ত্বগতভাবে মাকসূদ (উদ্দেশ্য) নয়, এই জন্য অবস্থা ও চাহিদার ভিন্নতার কারণে এসবের উপর নজরে সানি এবং

অবস্থা ভেদে এসবের পরিবর্তন পরিবর্ধন হওয়া জরুরি। অবশ্য যে সব জিনিস শরিয়তে মানসূস অর্থাৎ কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সেগুলো সর্বযুগে একই রকমভাবে আমল করতে হবে।”

(মালফূজাত : মাওলানা ইলিয়াস রহ. (উর্দু), মালফূজ নং-৩)

প্রিয় পাঠক, তাসাউফের লাইনে মাশায়েখগণের তরিকাগুলো মাধ্যম, মাকসাদ বা উদ্দেশ্য নয়। নবী ও সাহাবাদের যামানার পরে সময়ের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে। আবার সময়ের প্রয়োজনে এই তরিকাগুলোর পরিবর্তন-পরিবর্ধণও হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার হুকুম পূরা করা, গুনাহমুক্ত জীবন-যাপন করা এবং যিন্দগির তরজ-তরিকাকে সাহাবা-ওয়ালা তাক্বওয়াপূর্ণ যিন্দগি বানানোর জন্য দাওয়াতি তরিকাই হলো সাহাবা-ওয়ালা তরিকা। যিন্দগি পরিবর্তনের জন্য নবী এই দাওয়াতের মাধ্যমেই কাজ শুরু করেছেন।

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

অর্থঃ (হে নবী,) আপনি বলুন, এটাই আমার রাস্তা, আমি আল্লাহর দিকে ‘বাসিরাতের’ সাথে (বুঝে-শুনে) দাওয়াত দেই, আমি এবং আমাকে যারা অনুসরণ করে তারাও।

(আয়াত-১০৮, সূরা ইউসুফ)

মাওলানা মন্জুর নোমানি রহ. আরও লিখেন,

হিন্দুস্তানের প্রশিক্ষিত এক রাজনৈতিক আলেম ও ধর্মীয় মাহফিলের বড় পথপ্রদর্শক (যে লোক হিন্দুস্তানের বহুত বড় যাদুময়ী বক্তব্যের বক্তা) (অসুস্থ মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর) ‘ইয়াদত’ ও ‘যিয়ারত’ এর জন্য তাশরিফ আনলেন। দুই দিন পূর্বে হযরতের উপর অত্যন্ত কঠিন একটা সময় এসেছিল যার কারণে তিনি এই পরিমাণ দুর্বল হয়েছিলেন যে, অধিকাংশ সময় ঠোঁটে কান রেখে কথা শুনা হতো। যখন ওই (মাওলানা) সাহেবের আগমনের কথা হযরতকে অবগত করানো হলো তখন তিনি এই নাচিজ (মালফূজাত তারতিবকারী মাওলানা মন্জুর নোমানি) কে তলব করলেন এবং বললেন যে, ওনার সাথে কথা বলার আমার অনেক প্রয়োজন। কিন্তু পদ্ধতিটা এই হবে যে, আপনার কান আমার মুখের কাছে রাখবেন এবং আমি যা কিছু বলবো সেগুলোকে আপনি তার কাছে বলতে যাবেন। অতপর ওই (মাওলানা) সাহেব যখন ভিতরে তাশরিফ আনলেন তখন তো হযরত কথা শুরু আমারই মাধ্যমে করলেন, কিন্তু দুই তিন মিনিটের পরই আল্লাহ তা'আলা হযরতকে এত শক্তি দান করলেন যে, প্রায় আধা ঘন্টা পর্যন্ত ধারাবাহিক তাকরির করতে রইলেন। ওই মজলিসের যে ‘ইরশাদাত’গুলো লেখা হয়েছিল সেগুলো নিচে লেখা হলো।

(হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস রহ.) বললেন,

“মুসলমান মুসলমানের সাথে মিলা, মুলাকাত করা, ব্যাস (এটা) ইসলামের উন্নতির লক্ষ্যই হয়। নতুবা মুসলমানদের মুলাকাতগুলো ও অমুসলমানদের মুলাকাতগুলোর মধ্যে কী পার্থক্য? আপনি এখানে কিছুদিন থেকে আমাদের কাজের ‘মুতালাআ’ (পর্যবেক্ষণ) করেন। এছাড়া আমাদের কথা বুঝতে পারা এবং আমাদের মাকসাদকে পেয়ে যাওয়া মুসকিল। আসল কথা হলো, تَعْلَقَاتُ مُحَمَّدِيَّة (মুহাম্মাদি সম্পর্কগুলো) মুর্দা হয়ে গেছে। সেটাকে যিন্দা করতে হবে এবং ব্যাস এরই চেষ্টায় মরে থাকতে হবে।

আমি প্রথমে মাদ্রাসায় পড়িয়েছি (অর্থাৎ মাদ্রাসার দরস দিয়েছি) তো তুলাবাদের ভিড় লেগে গেল। ভালো ভালো যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্ররা খুব বেশি আসতে লাগলো। আমি ভাবলাম যে, ওদের সাথে

আমার মেহনতের ফলাফল এই ছাড়া আর কি হবে যে, যেলোক আলেম হওয়ার জন্যই মাদ্রাসায় আসবে, আমার কাছ থেকে পড়ার পর তারা আলেম মৌলভি হয়ে যাবে এবং পরে তাদের কর্মব্যস্ততাও ওটাই হবে যেটা আজকাল আমভাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কেউ হেকেমি-বিদ্যা পড়ে চেষ্টার বা ডিসপেনছারী দিবে। কেউ ভার্টিটির পরিক্ষা দিয়ে স্কুল-কলেজে চাকুরি করবে। কেউ মাদ্রাসায় বসে পড়াতে থাকবে। এর চাইতে বেশি আর কিছু হবে না। এই ভেবে মাদ্রাসায় পড়ানো থেকে আমার মন উঠে গেছে।

এরপর একটা সময় আসলো যখন আমার হযরত আমাকে ‘ইজায়ত’ দিয়েছিলেন। তখন আমি ‘তালেবদের’(মুরিদদের) যিকিরের ‘তালকিন’ (সবক) শুরু করি এবং এদিকে আমার توجه (তাওয়াজ্জুহ) বেশি হতে লাগলো। আল্লাহ করেন, আগমনকারীদের উপর এত তাড়াতাড়ি ‘কাইফিয়াত’ এবং ‘আহওয়াল’ এর প্রকাশ শুরু হতে লাগলো এবং এত দ্রুত ‘হালাত’ এর মধ্যে তারাক্বি হচ্ছে যে, স্বয়ং আমি পেরেশান হয়ে গেলাম। আমি ভাবতে লাগলাম যে, এ কী হচ্ছে! এবং এই কাজে লেগে থাকার ফলাফল কী বের হবে? বেশির চেয়ে বেশি এই হবে যে, ‘আহওয়াল’ ওয়ালা এবং ‘যাকের’ শাগেল’ কিছু লোক তৈরি হয়ে যাবে। পরে লোকদের মধ্যে তাদের প্রসিদ্ধি হয়ে যাবে। তখন কেউ মামলায় জিতার দুআর জন্য আসবে। কেউ আওলাদের জন্য তাবিজের দরখাস্ত করবে। কেউ ব্যবসা ও কারবারে উন্নতির দুআ করাবে এবং বেশির চেয়ে বেশি তাদের দ্বারাও কিছু তালেবদের (মুরিদদের) মধ্যে যিকির ও তালকিনের ধারা সামনে চলবে। এই ভেবে এদিক থেকেও আমার توجه (মনোযোগ) সরে গেল এবং আমি এই সিদ্ধান্ত করলাম যে, আল্লাহ তা’আলা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যে শক্তি দান করেছেন তা খরচ করার সহিহ ক্ষেত্র হলো, এগুলোকে ওই কাজে লাগাতে হবে যে কাজে ছ্যুর সা. আপন শক্তিসমূহ খরচ করেছেন। ওই কাজ হলো আল্লাহ তা’আলার বান্দাদেরকে এবং খাছ করে গাফেল ও বেতলব লোকদেরকে আল্লাহ তা’আলার দিকে নিয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ তা’আলার কথাগুলোকে উন্নত করার জন্য জানকে মূল্যহীন করার রেওয়াজ দেওয়া। ব্যস, এটিই আমাদের আন্দোলন এবং এটাই আমরা সবাইকে বলি। এই কাজ যদি হতে থাকে তাহলে এখনকার চাইতে হাজার হাজার গুণ বেশি মাদ্রাসা এবং হাজার হাজার গুণ বেশি খানকা কায়েম হয়ে যাবে। বরং প্রতিটি মুসলমান নিজেই মাদ্রাসা ও খানকা হয়ে যাবে এবং ছ্যুর সা. এর আনীত নিয়ামত ওই ‘উম্মি আন্দায়ে’ বন্টন হতে থাকবে, যেইভাবে বন্টিত হওয়াই ওই নিয়ামতের শান।

হযরত, আল্লাহ তা’আলা আপনাকে একটা শক্তি দিয়েছেন। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য বয়ান ও বক্তব্যের শক্তি নয়। আমার উদ্দেশ্য আপনি একটি জামাতের বড় ও অনুসরণীয় ব্যক্তি। হাজার হাজার মানুষ আপনার কথা মানে। আপনি তাদেরকে বলুন যে, তারা আমাদের সাথীদের সাথে কিছু দিন থেকে তারা আমাদের এ কাজকে বুঝুক, শিখুক এবং পরে নিজেদের হালকায় এ কাজ করুক। এর দ্বারা ইনশা আল্লাহ তারা বহুত কাজের মানুষ হয়ে যাবে।

হযরত, ঈমানের দুটি বাছ। এক, হলো আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমনের প্রতি কঠোরতা। দুই, আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্যকারী ও মুহব্বতকারীদের প্রতি স্নেহ ও মমতা। ঈমানদারদের উন্নতির জন্য এই দুই বাছুর খুবই দরকার। এক বাছুর দ্বারা কোনো জানোয়ারও উড়তে পারে না।”

মাওলানা মনজুর নোমানি রহ. লিখেন,

ওই মাওলানা সাহেব, যিনি হযরতের সাথে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও পূর্ণ আকিদতের সম্পর্ক রাখতেন, তিনি হযরতের ‘ইরশাদাত’ দিকনির্দেশনা মূলক নসিহতগুলো শুনে বললেন, যৌবনকাল ও শক্তির পুরা যামানা তো অন্য কাজে খরচ হয়ে গেছে! সে সময় কোনো বুয়ুর্গ টেনে নেননি। এখন আমি বুড়া হয়ে

গেছি। কোনো নতুন কাজের হিম্মতও নাই, শক্তিও বাকি নাই। এখন আপনি আমার থেকে আপনার কাজ নিতে চাচ্ছেন, এখন আর আমি কোনো কাজের রই নাই।

তখন মাওলানা ইলিয়াস রহ. বললেন,

“যদি বাস্তবে আপনি প্রথমে বুঝে নেন যে, আপনার মধ্যে কিছু শক্তি ও কুওত আছে এবং আপনি কিছু করতে পারবেন তখন ওই সময় আপনি আল্লাহর কাজের উপযুক্ত ছিলেন না। যদি এখন আপনার একিন হয়ে যায় যে, আপনার মধ্যে কোনো শক্তি ও কুওত নেই এবং আপনি কোনো কিছু করতে পারবেন না, তাহলেই এখন আপনি আল্লাহর কাজের উপযুক্ত হয়েছেন। আল্লাহ তা’আলার কাজ করা এবং তার সাহায্যের উপযুক্ত হওয়ার শর্তসমূহের মধ্যে এইটাও একটা শর্ত যে, মানুষ নিজে নিজেকে একেবারে অক্ষম ও দুর্বল মনে করবে এবং আল্লাহ তা’আলাকেই করণেওয়ালা যাত একিন করবে। এ ছাড়া আল্লাহ তা’আলার সাহায্য হবে না। হাদিসে কুদসিতে আছে, আমি ওদের সাথে থাকি যাদের অন্তর ভাঙ্গা থাকে।”

(মালফূজাত : মাওলানা ইলিয়াস রহ.(উর্দু), মালফূজ নং-১৫৯)

মাওলানা আবুল হাসান আলি মিয়া নদভি রহ. ‘দ্বীনী দাওয়াত’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এই হযরত ছিলেন মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ বুখারি রহ.।

প্রিয় পাঠক, একটু ভেবে দেখুন, আমাদের আকাবিরদের বড় এক আলেম শাহ আতাউল্লাহ বুখারি রহ. কে লক্ষ্য করে মাওলানা ইলিয়াস রহ. কত শক্ত কথা বলেছেন, মাদ্রাসায় পড়ানো থেকে আমার মন উঠে গেছে, তাসাউফের লাইন (পীর-মুরিদী) থেকে আমার توحید (মনোযোগ) সরে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজে জীবনের যাবতীয় শক্তি খরচ করেছেন আমি আমার যাবতীয় শক্তি ওই কাজে খরচ করবো। এদিকে শাহ আতাউল্লাহ বুখারি রহ. এর বিনয় দেখুন, মালফূজটি আবার পড়ুন। তিনি কাজের জন্য তৈরি, কিন্তু শেষকালে নিজেকে কাজের অযোগ্য ভাবছেন। জীবন-যৌবন অন্য লাইনে খরচ হওয়ায় আক্ষেপ করছেন।

এরকমই ছিলেন আমাদের আকাবির হযরতগণ। হযরত মাওলানা মুফতি শফি রহ. হযরত আনোয়ার শাহ কাশমীরী রহ. এর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

“একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আপনাদেরকে আমি শুনাচ্ছি। একদিকে এটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদিকে শিক্ষণীয়ও বটে। কাদিয়ান নামক জায়গায় প্রতি বৎসরই জলসা হতো। সায়্যিদী হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ সাহেব রহ.ও সে জলসায় শিরকত করতেন।

এক বৎসরকার ঘটনা : জলসায় শিরকতের জন্য তিনি কাদিয়ান গেলেন। আমিও সাথে ছিলাম। একদিন ফজরের নামাযের কিছু পূর্বে তার কামরায় গেলাম। কামরায় কিছুটা অন্ধকার বিরাজ করছিল। কামরায় ঢুকতেই দেখি, হযরত স্ত্রীয় মাথা ধরে অত্যন্ত বিষন্ন অবস্থায় বসে আছেন। আমি বললাম, হযরত! কি অবস্থা? তবীয়ত ভালো তো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবীয়ত তো ভালো, কিন্তু অবস্থার কথা তুমি কি জিজ্ঞাসা করছ? জীবন তো ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছি। আমি বললাম, হযরত! সারা জীবন ইলমের খিদমতে, দ্বীন প্রচারের কাজে ব্যয় হয়েছে। হাজার হাজার শাগরিদ আপনার রয়েছে, যারা বড় বড় এবং প্রসিদ্ধ আলেম। আপনার জীবন বরবাদ হলে, এমন জীবন কার আছে, যা কাজে

লেগেছে? তিনি বললেন, আমি তোমাকে সত্য বলছি, জীবন বরবাদ করে দিয়েছি। আমি বললাম, হযরত আসল ঘটনা কি? তিনি বললেন, আমাদের জীবন, আমাদের তাকরির (লেকচার) আমাদের তদন্ত-অনুসন্ধান ইত্যাদির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, অন্যান্য মাযহাবের উপর, হানাফী মাযহাবকে প্রাধান্য দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল অনুসন্ধান করতে হবে। এ ছিল আমাদের সব চেষ্টা কোশেঁশ, লেকচার এবং ইলমি জীবনের মেরুদণ্ড। এখন চিন্তা করে দেখি যে, কি কাজে জীবন বরবাদ করলাম? ইমাম আবু হানিফা রহ. কি আমাদের মুখাপেক্ষি ছিলেন যে, আমরা তার মাযহাবকে অন্যান্য মাযহাবের উপর প্রাধান্য দিয়ে তার উপর ইহছান করলাম? আল্লাহ পাক তাকে যে মাকাম (মর্যাদা) দিয়েছেন, এর দ্বারাই তো তিনি অন্যান্যদের থেকে স্বীয় দাবির স্বীকৃতি নিয়েনিবেন। তিনি তো আমাদের মুহতাজ নন।

আর ইমাম শাফি' রহ., ইমাম মালেক রহ., ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. সহ অন্যান্য মাযহাবের ইমাম, যাদের মাযহাবের উপর আমরা হানাফী মাযহাবকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। এর দ্বারা আমাদের কি হাসিল হয়েছে? এর চেয়ে বেশি তো আর কিছুই হাসিল হয়নি যে, আমরা আমাদের মাযহাবকে الصواب المحتمل (সঠিক কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে) প্রমাণ করতে পেরেছি। আর অন্যান্য মাযহাবকে الخطاء المحتمل للصواب (ভুল কিন্তু সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।) প্রমাণ করেছি। এ চেয়ে তো আর বেশি কিছু করতে পারিনি? আমাদের আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক সন্ধান অনুসন্ধান সূক্ষ চিন্তা, সূক্ষ দর্শিতা, এসব কিছুর যোগফল শুধু মাত্র এতটুকুই! অতপর বললেন, আরে মিয়া! কোন মাযহাব ঠিক ছিল, আর কোন মাযহাব বেঠিক ছিল এই রহস্য তো হাশরের ময়দানেও উন্মোচিত হবে না। আর দুনিয়ায় তো উন্মোচনের প্রশ্নই উঠে না। দুনিয়াতে এতো সব সন্ধান ও অনুসন্ধানের পর আমরা শুধু এতটুকুই বলতে পেরেছি যে, এটা সঠিক কিংবা ওটা সঠিক, কিন্তু তার পাশাপাশি এ সম্ভাবনাও বিদ্যমান ছিল যে, এটা ভুল এবং ওটাও ভুল। এই ভুলের সম্ভাবনার সাথেই আমরা সঠিক হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছি। এ হল দুনিয়ার অবস্থা। কবরেও মুনকার নাকির একথা জিজ্ঞাসা করবে না যে, রফয়ে ইয়াদাইন করা হক ছিল? নাকি না করা হক ছিল। আমীন জোরে বলা হক ছিল, না আস্তে বলা হক ছিল। এসব প্রশ্নের উত্তর কবরেও দিতে হবে না। বরযাখেও দিতে হবে না।

আল্লাহ পাক ইমাম আবু হানিফা রহ.কেও অপমান করবেন না এবং শাফি রহ.কেও অপমান করবেন না। তেমনিভাবে ইমাম মালেক রহ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. সহ অন্যান্য কোনো ইমামদেরকেই আল্লাহ পাক অপমান করবেন না। যাদেরকে আল্লাহ পাক দ্বিনি ইলমের পুরস্কার দ্বারা পুরস্কৃত হওয়ার তাওফিক দিয়েছেন, হিদায়াতের নূর যারা চর্চুদিকে ছড়িয়েছেন, সুন্নাহের আলো প্রচারের কাজে যারা সারা জীবন ব্যয় করেছেন তাদেরকে আল্লাহ পাক অপমান করবেন না, অবশ্যই না। তাদের কাউকেই হাশরের ময়দানে দাঁড় করে এ প্রশ্ন করা হবে না যে, আবু হানিফা রহ. ঠিক বলেছেন না শাফি রহ.। তো তার পিছে পড়ে আমরা আমাদের জীবন ও জীবনী শক্তি শেষ করে দিচ্ছি।

আর যেটা ইসলামের আসল 'দাওয়াত' ছিল যার গুরুত্বের ব্যাপারে সমস্ত উম্মত একমত, যে 'দাওয়াত' নিয়ে আশ্বিয়ায়ে কেরাম আগমন করেছিলেন যে, 'দাওয়াত' ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করার নির্দেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এবং ঐ সমস্ত অসৎ কাজ যা মিটানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা আমাদের জন্য অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে সে 'দাওয়াত' আজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং এর গুরুত্বও আজ মানুষের নজর থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। সবাই মিলে এই 'দাওয়াতি চেহারা' এর বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে। যে সমস্ত অসৎকাজের গতিরোধ করা দরকার ছিল, তা আজ দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। মানুষের মধ্যে গুমরাহি ধেয়ে আসছে। ধর্মাস্তরের ঘটনা ঘটেই চলেছে। শিরক এবং মূর্তি পূজার প্রবণতা বেড়েই চলেছে, হালাল হারামের পার্থক্য বিদায় নিচ্ছে। অথচ আমরা বসে আছি ঐ

শাখাগত অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদী নিয়ে । হযরত শাহ সাহেব বলেন, এজন্যই চিন্তিত অবস্থায় বসে আছি । আর ভাবছি জীবন তো বরবাদ করে দিয়েছি ।

(‘হৃদে ইখতিলাফ’, মূল : ফকিহুল উম্মত মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি রহ., সংকলক, মুফতি মুহাম্মাদ ফারুক মীরাতী, অনুবাদক, মাও. আলমগির হুসাইন, পৃষ্ঠা, ৮৮-৯১)

আমাদের আকাবির হযরতগণ বড় ভলো মানুষ ছিলেন । শাইখুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ., মাওলানা মন্জুর নোমানি রহ., মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলি মিয়া নদভী রহ., মাওলানা মাওলানা জাফর আহমদ উসমানি রহ., মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভি রহ., দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম ক্বারি তৈয়ব সাহেব রহ. , মুফতি মাহমুদ গাঙ্গুহি রহ. মাওলানা মুফতি কিফায়াতুল্লাহ রহ., মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানি রহ., মাওলানা আব্দুল কাদের রাইপুরি রহ., মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ., মাওলানা মুফতি শফি রহ. প্রমুখ আমাদের আকাবির হযরতগণ এই কাজে মাওলানা ইলিয়াস রহ.কে অনেক সহযোগিতা করেছেন । ওনারা মাওলানাকে বুঝার চেষ্টা করতেন ।

মাওলানা আবুল হাসান আলি নদভি রহ. ‘দ্বীনী দাওয়াত’ গ্রন্থে আরও লিখেন,

শেষ দিকে কখনো কখনো মাওলানা ইলিয়াস রহ. হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এর ‘মাকতূবাত’ এ উদ্ধৃত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার রহ. এর এই উক্তিটি নকল করতেন,

(অর্থঃ) আমি যদি পীর মুরিদী গুরু করি তাহলে দুনিয়াতে কোন পীর মুরিদ খুঁজে পাবে না । কিন্তু আমার প্রতি তো অন্য এক কাজের আদেশ হয়েছে । আর তা হলো শরিয়তের প্রচলন ঘটানো এবং দ্বীনকে শক্তি যোগানো ।

(মাওলানা আবু তাহের মেহবাহ অনূদিত ‘দ্বীনে দাওয়াত’ পৃষ্ঠা-২৫৯)

প্রিয় পাঠক, সহিহ আকিদা রাখেন এমন পীরের কাছে ইসলামের জন্য বাইয়াত হওয়ার তরিকাগুলো সময়ের প্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া যায়েজ তরিকা । আর আমলের উপর যে বাইয়াত নেওয়া হয়, আমাদের আকাবির হযরত উলামায়ে কেরাম এই বাইয়াতকে মুস্তাহাব বা সুন্নাত বলে থাকেন । কেননা, অনেক সাহাবাগণ থেকে আল্লাহর নবী আমলের উপর বাইয়াতও নিয়েছেন । কিন্তু বেশকম এখানে এতটুকু যে, নবী ও নবীর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশিদিনের যামানায় বাইয়াত একজনই নিতেন । যিনি আমলে উপর বাইয়াত নিতেন তিনিই জিহাদে উপরও বাইয়াত নিতেন, ইসলামের উপরও বাইয়াত নিতেন, আমীরের কথা শুনা এবং মানার উপরও বাইয়াত নিতেন । বাইয়াত গ্রহণকারী আমীর একজনই থাকতেন । আর সে বাইয়াতের হুকুম ফিকহি পরিভাষায় মুস্তাহাব বা সুন্নাত নয়, বরং ওয়াজিব । আর যারা শরয়ী ওয়র ছাড়াই আমীরের হাতে বাইয়াত হবে না তাদের বলা হয় বাগি । তাবলিগের আমীরগণ সাহাবাওয়ালা সেই বাইয়াত আমভাবে যিন্দা করার ফিকির ও মেহনত করছেন । কেননা, উম্মি ইসলামের জন্য ইনফিরাদি যিন্দেগির আমূল পরিবর্তনের জন্য, বিশ্বময় বিপ্লব ঘটানোর জন্য নবী ও সাহাবা-ওয়ালা যামানার আদর্শ আবার ফিরিয়ে আনার জন্য নবী ও সাহাবা-ওয়ালা তরিকা অর্থাৎ সেই পুরানো দাওয়াতি তরিকা ছাড়া সম্ভব নয় । যে যার মত মেহনত করলে সারা দুনিয়ায় সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে সাহাবা-ওয়ালা তারতিবে দ্বীন যিন্দা হবে না ।

মাওলানা মন্জুর নোমানি রহ. লিখেছেন,

মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলতেন,

“ ভাই, এই সময়ে কুফুর ও ইলহাদ অনেক শক্তিশালি। এই অবস্থায় বিক্ষিপ্ত এবং আলাদা আলাদা ইসলাহি মেহনতসমূহের দ্বারা কোনো কাজ হবে না। এই জন্য পূর্ণ শক্তির সাথে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা-মেহনত করতে হবে। **واعتصموا بحبل الله جميعا** অর্থঃ আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আকড়িয়ে ধরো। ”

(মালফূজাত : মাওলানা ইলিয়াস রহ. (উর্দু) মালফূজ নং-১৮০)

মাওলানা মনজুর নোমনি রহ. ‘দ্বীনি দাওয়াত’ এর ভূমিকায় লিখেছেন,

মাওলানা কখনো কখনো তাঁর দাওয়াত ও আন্দোলন সম্পর্কে বলতেন,

“এ কাজ হলো **قرن أول** অর্থাৎ প্রথম যুগ, নবীর যুগের হীরক খন্ড।”

(মাও. আবু তাহেব মেছবাহ অনূদিত ‘দ্বীনি দাওয়াত’ পৃষ্ঠা- ৩৫)।

মাওলানা নদভি রহ. লিখেছেন,

মাওলানার দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিলো উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের মাঝে পারস্পরিক দূরত্ব ও অপরিচয় এবং ভুল বুঝাবুঝি ও ঘৃণা-ভীতির বিরাজমান পরিবেশ দূর করা এবং একদা উম্মতের সর্বস্তরে প্রীতি ও সম্প্রীতির যে সুন্দর আবহ ছিলো তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

(‘দ্বীনি দাওয়াত’ পৃষ্ঠা- ১৩৯)

মাওলানা নদভি রহ. আরও লিখেছেন,

মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর দরদপূর্ণ চাহিদা ও আসল স্বপ্ন এটাই ছিলো যে, ছাহাবা ওয়ালা জীবন পদ্ধতি এবং ইলম ও যিকির হাছিলের ছাহাবা ওয়ালা তরিকা কিভাবে যিন্দা করা যায়।

(‘দ্বীনি দাওয়াত’ পৃষ্ঠা-২৬৯)

বর্তমানে তাসাউফের প্রচলিত বিভিন্ন তরিকার বিভিন্ন মেহনত, বিভিন্ন অজিফা, খানকা, মাযার ইত্যাদি কোনোটা শিরক, কোনোটা বিদাত, কোনোটা যায়েজ এবং আমলের উপর যে বাইয়াত নেওয়া হয় এ বাইয়াত আমাদের উলামায়ে কেরামের মতে মুস্তাহাব বা সুন্নাত। এই বাইয়াতের ভিত্তি সাহাবাদের যামানায় যদিও ছিল কিন্তু এরকম বিক্ষিপ্তভাবে শত শত বাইয়াত ছিল না এবং বিভিন্ন তরিকার নিজস্ব কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি এগুলোও ছিল না। তবে আমাদের আকাবির হযরতগণ বড় খেদমত করেছেন। তাসাউফের বিভিন্ন তরিকাগুলো কাটছাট করে সুন্নতের আলোকে সাজানোর চেষ্টা করেছেন। উনারা ঘোষণা করেছেন, অলির পরিচয় কারামত নয়, সুন্নত। যার মধ্যে যত সুন্নত ও তাকওয়া বেশি সে তত বড় অলি। তবে একথা চির সত্য উম্মতের কামিয়াবি সাহাবা-ওয়ালা সুন্নতের মধ্যেই। যিকির ও ইসলাহের অনুসরণীয় তরিকা হলো সাহাবা-ওয়ালা তরিকা। এই তরিকায় মেহনত করলেই সমষ্টিগতভাবে উম্মতের ইসলাহ ও উন্নতি সম্ভব। ইসলাহের জন্য মাশায়েখগণ যে সাধনা করেছেন এবং বিভিন্ন তরিকায় মেহনত করে গেছেন এসবকে আমরা ছোট করছি না। বরং সময়ের প্রয়োজনে এই যায়েজ পদ্ধতিগুলোই অত্যন্ত আবশ্যকীয়ও ছিল। আকাবিরগণের তাসাউফ ও সুলূকের লাইনের মেহনতকে আমরা অস্বিকার করছি না এবং না যায়েজও বলছি না। কিন্তু ঈমান ও আমল বানানোর জন্য, ইসলাহের জন্য, ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, আঞ্চলিক জীবনে ও আলমি জীবনে নবী ও খুলাফায়ে রাশিদিনের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য, বিশ্বময় বিপ্লব ঘটানোর জন্য বর্তমানে সাহাবা-ওয়ালা দাওয়াতি মেহনতের কোনো বিকল্প নেই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের দ্বীনি গু’বার মেহনতকে সচল রেখে মুসলমানদের এই

এক জামাতের এক মেহনতের ময়দানে আমির কর্তৃক নির্ধারিত তারতিবের আলোকে শুধু সমর্থন নয়, স্বশরিরে ঝাপিয়ে পড়া সময়ের বড় প্রয়োজন।

প্রিয় পাঠক, মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেব কোনো ভুল কথা বলেননি। এই সিলসিলার পূর্ব আমীরগণের বিভিন্ন কথা নিজস্ব ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন মাত্র। আজকে যত সমস্যা শুধু এই মেহনতকে না বুঝার কারণে এবং একে অনেক ছোট করে দেখার কারণে। প্রচলিত সকল যায়েজ পদ্ধতিগুলোকে আজ আমরা আসল বানিয়ে ফেলেছি। সাহাবা-ওয়ালা তারতিবে মানুষের ইসলাম ও আখলাক গঠনের ব্যাপারে মাওলানা ইলিয়াস রহ. কী বলে গেছেন তা একবারও ভেবে দেখিনি।

মাওলানা মনজুর নোমানি রহ. লিখেছেন,

কোনো কোনো আলেম হযরত ইলিয়াস রহ. এর দাওয়াতি আন্দোলনের উপর আমাদের শাইখ রহ. করেননি বলে প্রশ্ন তুললে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতেন,

“ওই হযরতগণের ধারণা এই যে, এ কর্মপদ্ধতি আমাদের হযরত (নাও-ওয়া-রাহ্লাহ্ মারকাদাহ্) এর তরিকা ও রুটির খেলাফ। কিন্তু আমার কথা হলো, যে জিনিস দুইনের জন্য উপকারী ও অত্যন্ত ফলদায়ক দলিলাদি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা হয়ে গেছে সে জিনিসকে এই জন্য গ্রহণ না করা যে, আমাদের শাইখ এটা করেননি, এটা মস্তবড় ভুল। শাইখ শাইখই তো, আল্লাহ তো নন।”

(মালফূজাত : মাওলানা ইলিয়াস রহ. (উর্দু), মালফূজ নং-১৬১)

প্রিয় পাঠক, বিক্ষিপ্ত কথাগুলোর সারাংশ হলো, তাসাউফের যে উদ্দেশ্য ঈমান আমল ও তাকওয়া-ওয়ালা হওয়া, এইটা দাওয়াত, সুহবত, আপোষে মেলামেশা, মুজাকারা ইত্যাদির মাধ্যমে সুনাতের উপর আমল করে, মুসলিম জামাতের আমীরের হেদায়াত ও তারতিবের ইতায়াতে চলতে চলতে হাসিল করার সার্বজনীন তরিকাই ছিল সাহাবাদের তরিকা। নবী ও সাহাবাদের যমানায় এরকম শত শত পীরের শত শত বাইয়াত ছিল না। সাহাবা পরবর্তী সময়ে ইলম ফিকহ হাদিস ও ইসলাম সব একসাথেই হাসিল হতো। তার পরবর্তী সময়ে আস্তে আস্তে ইসলামে বাতিনের জন্য আলাদা একটা তবকা মশহুর হয়ে যায়। যাদেরকে সুফি বলা হয়। সুফিগণ যে যার মত ইসলামের ফিকির করতে করতে এইভাবে যামানার পর যামানা চলে যায়।

মুহতারাম মাওলানা ও এই সিলসিলার পূর্ব আমীরগণ ইসলাম ও ইলম ও ফিকির হাসিলের জন্য সেই সাহাবাওয়ালা আম রেওয়াজটি যিন্দা করার ফিকির করে যাচ্ছেন। মাওলানা যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন।

আমরা শুধু বলতে চাই, আগে এই দাওয়াত ও তাবলিগকে বুঝুন, ‘মালফূজাত : মাওলানা ইলিয়াস রহ. ও ‘দ্বীনি দাওয়াত’ কিতাব দুটি দু তিন বার গভীরভাবে অধ্যয়ন করুন এবং এই মেহনতের মারকায নিজামুদ্দীনের সুহবত গ্রহণ করুন, আশা করি, আপনাদের শক-সন্দেহ দূর হয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহ।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

নিশ্চয় দাওয়াত নবীর পথ, তবে ১. তেলাওয়াতে কুরআন, ২. তা'লিমে কিতাব ও সুন্নাহ, ৩. এবং তায়কিয়াহও নবীর পথ। কুরআন শরিফে ইরশাদ হচ্ছে,

- (1) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورة البقرة الآية 129)
- (2) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (سورة البقرة الآية 151)
- (3) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (سورة ال عمران الآية 164)
- (4) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (سورة الجمعة الآية 2)

সা'আদ সাহেব নবীওয়ালা এক পথকে স্বীকার করে বাকি তিন পথকে অস্বীকার করে কুরআন মাজিদের উল্লেখিত চারটি আয়াতকে অস্বীকার করলেন।

মন্তব্যের জবাব :

হক তালাশকারী আহলে ইলম পাঠকদের বলছি, কুরআনের এই চারটি আয়াতের তাফসির বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য বিখ্যাত তাফসিরের কিতাব থেকে দেখে নিন। তাফসিরে তুবারি, তাফসিরে বাগাভি, তাফসিরে কুরতুবি, তাফসিরে বাইযাবি, তাফসিরে ফখরুদ্দিন রাযি, তাফসিরে দুররে মানসূর, তাফসিরে ইবনে কাসির, তাফসিরে রুহুল মা'আনি, ফতহুল কাদির, আহকামুল কুরআন ইত্যাদি কিতাবগুলো অধ্যয়ন করে ভেবে দেখুন, কত নিকৃষ্টতম মন্তব্য করলেন অভিযোগকারী। নাকি অযোগ্য ছাত্রদের এক জামাতকে ব্যবহার করেছেন আর নিজের নামে ছাপিয়ে দিয়েছেন!

বিস্তারিত আলোচনার করার সুযোগ নেই। আমরা উল্লেখিত তাফসির কিতাবগুলোর আলোকে চারটি আয়াতের তাফসির এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোটামোটি তিনটি কাজ বা দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ (১)

وَيُزَكِّيهِمْ (২)

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (৩)

প্রথম কাজের তাফসির মুফাসসিরগণের উক্তিতে দুটি মত পাওয়া যায়,

১. তিনি কুরআন শরিফের আয়াত তাদের সামনে তিলাওয়াত করতেন। আয়াতের এই স্বয়ং তিলাওয়াতের দ্বারাই তাদেরকে তাওহিদ ও একত্ববাদ তথা আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেওয়া হয়ে যেতো। যে আয়াত নাযিল হতো সে আয়াত তিলাওয়াত করে আয়াতগুলোকে পৌছে দিতেন। যা নাযিল হতো তা উম্মতের কাছে পৌছে দিতেন।

২. তিনি আল্লাহ তা'আলার 'আয়াত' অর্থাৎ তাওহিদের নিদর্শণাবলি, আল্লাহর কুদরত ও বড়ত্বের কথা তাদের সামনে তুলে ধরতেন।

দ্বিতীয় কাজের তাফসিরে মুফাসসিরগণ যা উল্লেখ করেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে শিরক, মূর্তি পূজা, ইসলাম পূর্ব জাহিলি যুগের বদ রসুম, পাপ-পঙ্কিলতা ও মন্দ স্বভাবগুলো থেকে পূতঃপবিত্র করতেন। তাদের আখলাক সুন্দর করতেন।

তৃতীয় কাজের তাফসিরে যা উল্লেখ করেছেন তার খুলাসা হলো, তিনি তাদেরকে কুরআন শরিফ ও তার হুকুম-আহকাম, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, শরিয়ত, তিলাওয়াত, ফাহমে কুরআন, হেকমত, সুননত ও জীবন যাপনের তরিকা, ফিকহ, ইলম ও আমল ইত্যাদি এসব শিখাতেন।

কুরআন সুনান ও ইতিহাস সাক্ষ্য, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথাযথভাবে এ কাজগুলো আঞ্জাম দিয়েছিলেন এবং দাওয়াত-নসিহত-মুজাকারা ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি সাহাবাদের বিশাল জামাত তৈরি করেছিলেন। সাহাবাগণ নবীর সোহবতে থেকে পুরাপুরিভাবে ঈমান আমাল ও দ্বীনের পূর্ণ বুঝ হাসিল করেছিলেন। এভাবে নবী পরবর্তী খুলাফায়ে রাশিদীন ও সাহাবাগণ নবীর নকশে কদমে চলে একই মেহনত করেছেন। এই হলো আয়াতগুলোর তাফসির। এই আয়াতগুলোর উপর নববী তরিকায় দাওয়াত তা'লিম ও তায়কিয়ার লাইনে উম্মতের মধ্যে সার্বজনীনভাবে যে জামাত মেহনত করছেন, যে জামাত উম্মতের জাহালাত দূর করে নাজাতের ইলম আমভাবে যিন্দা করার মেহনত করছেন, যে জামাত দুনিয়ামুখি উম্মতের রুখকে ইসলাম করে আখিরাতমুখী করছেন সে জামাত হলো দাওয়াত ও তাবলিগ জামাত। যারা এবং যে জামাতের লোকেরা আয়াতগুলোর উপর সাহাবা-ওয়ালা তরিকায় আমভাবে আমল করছেন তারা নাকি এই আয়াতগুলো অস্বিকার করে!! নায়যুবিল্লাহ। অভিযোগকারী যদি সময়ের প্রয়োজনে তৈরি হওয়া দাওয়াত, ইলম ও তায়কিয়ার জন্য প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপকে ধরে নিয়ে এরকম অসীকৃতির অভিযোগ করে থাকেন তাহলে এই অভিযোগ শুধু মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেবের উপরে গিয়েই পড়ছে না, এই সিলসিলার পূর্ব আমীরগণ, অসংখ্য মুফাসসিরিনে কেরাম ও তাবিয়ী, তাবে'-তাবিয়ী ও সাহাবাগণের উপরও গিয়ে পড়ে যাচ্ছে। অভিযোগকারী একটু ভেবে চিন্তে মন্তব্য করলে এত বড় ভয়ানক ভুল হয়তো করতেন না। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা, নিকট অতীতের কতক হযরতগণ তাঁদের কিতাবে সময়ের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা মকতব, মাদ্রাসা ও খানকা ইত্যাদির শিক্ষা-দীক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলোকে উপরোক্ত আয়াতগুলোর তাফসিরের ব্যাপকতায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এটা উনাদের যায়েজ কর্ম ও যায়েজ তাফসির, সময়ের প্রয়োজনে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন আমাদের আকাবির হযরতগণ। কিন্তু আয়াতগুলোর আসল তাফসির এবং নবী ও সাহাবা-ওয়ালা সীরত ও সুননের আলোকে তাফসির তো সেটাই যেটা প্রাচীন তাফসিরের কিতাবাদির মধ্যে রয়েছে। আমরা আপনাদের কাছে সামান্য কিছু উল্লেখ করলাম। বিস্তারিত ওই তাফসিরের কিতাবগুলোর পাতা উঠিয়ে দেখুন।

১০. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

আযান হলো 'তাশকীল' (প্ল্যান-পরিকল্পনা)। নামায হলো 'তারগীব' (পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্বুদ্ধকরণ)। আর নামযের পর আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া হলো 'তারতীব' (পরিকল্পনার মূল বাস্তবায়ন)।

তাফসিল :

হাদিসে আযানকে দাওয়াত বলা হয়েছে। আযান দ্বারা মানুষকে বারবার নামাযের দিকে ডাকা হয়। তাবলিগী পরিবেশে তাশকিলও একটা দাওয়াত। আল্লাহর রাস্তায় সাথীদের বের হওয়ার জন্য বারবার বলতে থাকা। আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য মানুষদের নিয়ত করানো। এভাবে মজমাকে দাওয়াত দেওয়া ও বলতে থাকার নাম তাশকিল। আযানের সাথে তাশকিলের বড় মিল রয়েছে। সেই হিসাবে আযানকে তাশকিল বলাতে কোনো দোষ হতে পারে না। মুহতারাম মাওলানা বলে থাকলে হয়তো সেই হিসাবেই বলেছেন।

ঈমানের পর আল্লাহর বড় হুকুম নামায। ইসলাম ও কুফুরির মাঝে ফরক করে নামায। উম্মতের নামায কায়েম করা এই মেহনতের বড় একটা মাকসূদ। কিন্তু নামায ইবাদতে মাকসূদা হওয়ার সাথে সাথে অন্য সব ইবাদতকে অস্তিত্বে আনার ব্যাপারে তারগীব (উৎসাহ) প্রদান করে। অশ্লীল ও অন্যায-পাপ কাজসমূহ ছাড়তে নামায নিষেধ করে। সৎ ও নেক কাজসমূহ করতে নামায তারগীব (উৎসাহ) প্রদান করে।

পবিত্র কুরআন শরিফে আছে,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থঃ আর তুমি নামায কায়েম করো, নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায কাজসমূহ থেকে নিষেধ করে। (সূরা আনকাবূত, ৪৫ নং আয়াতের কিছু অংশ)

في مسند أحمد قيل: يا رسول الله إن فلانا يصلي بالنهار ويسرق بالليل، فقال: "إن صلاته لتردعه

অর্থঃ মুসনাদে আহমদে আছে, কেউ বললেন, হে আল্লাহ রসূল, অমুক দিনের বেলায় নামায পড়ে, রাতের বেলায় চুরি করে। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় তার নামায তাকে ফিরাবেই।

عن ابن مسعود، قال: من لم تأمره صلاته بالمعروف، وتنهه عن المنكر، لم يزد بها من الله إلا بعدا

অর্থঃ তাফসিরে ত্ববারিতে আছে, ইবনে মাসউদ রাদি। থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যার নামায তাকে সৎ কাজের আদেশ করে না এবং অন্যায কাজ থেকে তাকে বিরত করে না তাহলে সে নামায দ্বারা আল্লাহর থেকে তার দূরত্বই বাড়বে। এরকম রেওয়াআত ইবনে আব্বাস রাদি। থেকেও বর্ণিত আছে।

অভিজ্ঞতার দ্বারাও প্রমানিত যে, খুসু ও খুযু-ওয়ালা নামায নামাযি ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ হতে ও অন্যান্য নেক আমলের প্রতি তারগীব অর্থাৎ উৎসাহ ও উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে নামাযকে ‘তারগীব’ বলাতে কোনো দোষ হতে পারে না।

‘তারতীব’ শব্দটি আরবি। উর্দু ও বাংলা ভাষায়ও শব্দটি ব্যবহার হয়। তাবলিগী পরিবেশে তারতীব শব্দটি নিয়ম ও উসূলের অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়, উলামাদের তারতিব, দাওয়াতের তারতিব, কাজের তারতিব ইত্যাদি। আর নামাযের পর আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া এমন এক তারতিব বা উসূল যে উসূলটি কুরআন শরিফের সূরা জুমার ১০ নং আয়াতের কোনো কোনো তাফসিরে পাওয়া যায়।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

অর্থঃ অতপর যখন নামায আদায় হয়ে যায় তখন তোমরা যমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং তোমরা আল্লাহর ফজল তালাশ করো।

في الطبري عن أنس، قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ قال: " لَيْسَ لِبَطْنِ دُنْيَا، وَلَكِنْ عِيَادَةُ مَرِيضٍ، وَحُضُورُ جَنَازَةٍ، وَزِيَارَةُ أَخٍ فِي اللَّهِ

অর্থঃ ত্ববারিতে আছে, হযরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কথা **فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ** ব্যাখ্যায় বলেন, এটা (যমিনে ছড়িয়ে পড়া আর আল্লাহর ফজল তালাশ করা) দুনিয়া তলবের জন্য নয়, বরং এটা রুগীর সেবা-শুশ্রূষা, জানাযায় উপস্থিতি ও আল্লাহর জন্য এক ভাইয়ের যিয়ারতে যাওয়ার জন্য।

في روح المعاني أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال : لم يؤمروا بشيء من طلب الدنيا إنما هو عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله تعالى ،

অর্থঃ রুহুল মা'আনিতে আছে, ইবনে মারদুইয়াহ উল্লেখ করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাদেরকে দুনিয়া তলবের কোনো কিছুর আদেশ করা হয়নি। নিশ্চয় সেটা রুগীর সেবা-শুশ্রূষা, জানাযায় উপস্থিতি ও আল্লাহর জন্য এক ভাইয়ের যিয়ারতে যাওয়া।

হাসান সাঈদ বিন জুবাইর ও মাকহূল রহ. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর ফজল তালাশে যাওয়ার অর্থ ইলমের তালাশে যাওয়া (তাফসিরে বাগাভি)

সুতরাং নামাযের পর বের হয়ে কোনো ভাইয়ের যিয়ারতে যাওয়া, জানাযায় যাওয়া, রুগীর দেখবালের জন্য যাওয়া ও ইলম তালাশে যাওয়া এসবই আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি ইলম তালাশে বের হলো সে আল্লাহর রাস্তাই আছে।

অতএব নামাযের পর আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার তারতিব অনেক তাফসিরের আলোকে বুঝা যায়, এটা ‘আল্লাহ প্রদত্ত তারতীব’।

সুতরাং মুহতারাম মাওলানা যদি বলে থাকেন, নামাযের পর আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া হলো ‘তারতীব’ তাহলে তিনি তো কোনো ভুল কথা বলেননি।

নামাযের পর আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া ‘তারতীব’ বলাতে কোনো দোষ হতে পারে না।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

নামাযকে তারগীব বলে প্রকারান্তরে সা'আদ সাহেব শতাব্দীক আয়াতকে অস্বিকার করলেন, কারণ নামায হল ইবাদতে মাকছূদা। মওদুদী সাহেব নামাযকে তামরীন বলেছেন, আর সা'আদ সাহেব বলেছে তারগীব। উভয়টাই গুমরাহী।

মন্তব্যের জবাব :

তাকবিল, তারগিব ও তারতিব এই শব্দগুলোর বন্দনীর ভিতর নিজের মত ব্যাখ্যা করে গুমরাহির ফতোয়া দেওয়া ঠিবি হয়েছে কি না বিজ্ঞ পাঠক আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তবে এর দ্বারা কিছু বিভ্রান্তি ছড়াবে, আর কপাল যাদের খারাপ তারা বিভ্রান্তির শিকার হবে। শতাব্দীক আয়াত অস্বিকার করার মিথ্যা দাবি উত্থাপনকারী গোটা দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র মনে হয় অভিযোগকারীকেই পাওয়া যাবে। কার কপালে কী আছে আল্লাহই ভালো জানেন। যে মানুষ কুরআনের প্রতিটি আয়াতের হুকুম বাস্তবায়নের জন্য কী পরিমাণ মেহনত ও ফিকির করছেন সে মানুষ নাকি.....?। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। প্রিয় পাঠক, আশা করি আমাদের এই ছোট্ট আলোচনার দ্বারাই আপনি অনেক কিছু বুঝতে পেরেছেন।

১১. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত ইল্লাহর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইশার নামাযকে পর্যন্ত বিলম্ব করে পড়েছেন। অর্থাৎ - নামাযের চেয়ে দাওয়াতের গুরুত্ব বেশি।

তাকবিল :

মুহতারাম মাওলানা হয়তো দাওয়াতের গুরুত্ব বুঝতে গিয়ে একটা হাদিসের তাওজিহ করেছেন। বুখারি শরিফে আছে,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ

অর্থঃ হযরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নামাযের ইকামত দেওয়া হয়েছে, অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের পার্শ্বে একটা পুরুষের সাথে চুপচাপ কথা বলছেন, তাই তিনি নামাযের জন্য দাড়াইনি, এদিকে কওম অর্থাৎ সব মুসল্লি ঘুমিয়ে গেল। (বুখারি শরিফ)

ফতহুল বারিতে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. উল্লেখ করেন,

وذكر بعض الشراح أنه كان كبيراً في قومه فأراد أن يتألفه على الإسلام ولم أقف على مستند ذلك

অর্থঃ অনেক ব্যাখ্যাদাতা উল্লেখ করেছেন, সে লোকটি নিজ কওমের বড় সম্মানি কোনো ব্যক্তি ছিল। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইসলামের প্রতি দীক্ষিত করার জন্য তার সাথে খাতির জমাতে চেয়েছিলেন। (ইবনে হাজার রহ বলেন) এই ব্যাখ্যার কোনো সনদ আমার জানা নেই।

প্রায় একই কথা 'উমদাতুল কারির' মধ্যেও আছে। তবে বুখারি শরিফের দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজনের সাথে কথা বলে ইশার নামাযকে বিলম্ব করেছেন। সুতরাং মুহতারাম মাওলানা যদি ওই লোকের সাথে নবীর কথাগুলোকে দাওয়াতি কথা ব্যাখ্যা করে দাওয়াতের গুরুত্ব উন্নতের কাছে বুঝিয়ে থাকেন তাহলে তিনি কী ভুল করলেন ? দাওয়াত ভুলা উন্নতকে দাওয়াত বুঝানোর ফিকির করছেন, আর কী। উনার এই ব্যাখ্যা তো অনেক ব্যাখ্যাদাতাগণ করে গেছেন। এরকম

ব্যাখ্যা যদি না-ও থাকে তারপরও এটা তো প্রমাণিত যে, যেকোনো বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে কথা বলেছেন এবং লম্বা কথা বলেছেন, যার কারণে উপস্থিত সব মুসল্লিরা ঘুমিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আমরা যদি বলি, স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় কথার চেয়ে দাওয়াতের প্রয়োজনীয় কথা কি বড় নয়? অবশ্যই বড়। মাওলানার এই কথা থেকে অভিযোগকারী ‘অর্থাৎ’ এর পরে যে অভিযোগ তৈরি করলেন, ‘নামাযের চেয়ে দাওয়াতের গুরুত্ব বেশি’ সঠিক নতিজা তৈরি করতে পারেননি। যদি বলতেন, দাওয়াতের খাতিরে নামাযকে আগপর করা যায়, তাহলে তার কথাটি সঠিক হতো।

মাওলানা মন্জুর নোমানি রহ. লিখেছেন,

মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলতেন, দ্বীনের দাওয়াতের গুরুত্ব আমার নিকট এই সময়ে এত জরুরি যে, যদি কোনো ব্যক্তি নামাযে লিপ্ত থাকে, এমন সময় একজন নতুন মানুষ আসে, তারপর ফিরে চলে যেতে লাগে। পরবর্তীতে সে লোককে পাওয়ার কোনো আশা না থাকে, এমতাবস্থায় আমার মতে নামাযকে মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে তার সাথে দ্বীনী কথা বলা উচিত এবং তার সাথে কথা বলে অথবা তাকে থামিয়ে নিজের নামায পুনরায় পড়ে নেওয়া উচিত।

(মালফূজাত (উর্দূ) : মাওলানা ইলিয়াস রহ, মালফূজ নং-২০৯)

এখন আমরা কি এখানে এই অভিযোগ বের করবো যে, দাওয়াতের জন্য নামায ভাঙ্গার মাসআলাটি ফিকহের কোন কিতাব থেকে বললেন? নাকি বলবো বর্তমান যামানায় দাওয়াতের অনেক গুরুত্ব বুঝাতে চেয়েছেন। বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের সামগ্রিকভাবে কোনো তারতিব না থাকায় বিক্ষিপ্ত মুসলমানগণ বিক্ষিপ্ত নির্যাতনের শিকার। তারা ঈমান ইসলাম সব হারিয়ে জড়বাদি অমানুষদের চিন্তাভাবনা লালন করা শুরু করেছে। মেওয়াতি লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের মত সারা বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্য ভুলে প্রগতিবাদীদের সাথে তাল মিলিয়ে নিছক দুনিয়ার স্বার্থে জীবন যাপন করে যাচ্ছে। এহেন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য একটা আমভাবে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা ছিল সময়ের বড় দাবি। যার থেকে মুসলমানগণ নিজের ঈমান, আমল, ইতিহাস, চিন্তা-ধারা, জীবন-যাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সব ঠিক করে নিবে। সেই প্রয়োজনীয়তা থেকেই ১৯০০ শতাব্দির মুজাদ্দিদ মাওলানা ইলিয়াস রহ. দাওয়াত ও তাবালিগের জন্য কায়ম করলেন মুসলমানদের এক জামাত। সময়ের প্রেক্ষাপটে ওনার এই মালফূজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সমকালীন আমাদের আকাবির হযরতগণ ওনার এই মালফূজের দ্বারা দাওয়াতের গুরুত্ব ছাড়া ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা বের করেননি। সবাই হযরতকে সহযোগিতা করেছেন।

আবু দাউদ শরিফে আছে,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى. قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ

অর্থঃ আবু দারদা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সিয়াম, সালাত ও সদকার চাইতেও উত্তম দরজার আমল সম্পর্কে খবর দিবো? সাহাবাগণ রাদি. বললেন, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, আপোষে ইসলাম করা। আর আপোষে ফাসাদ করা তো ধংশকারী।

(আবু দাউদ শরিফ, হাদিস নং-৪৯২১)

আপোষে ইসলামের দরজা যদি নামায রোজার চাইতেও বেশি হয়ে থাকে তাহলে আপোষের ইসলাম, নামায, রোযা ইত্যাদি সব হুকুমকে যিন্দাকারী ‘দাওয়াত’ এর গুরুত্ব কত বেশি হতে পারে তা অনুমান করাও সম্ভব নয়।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. লিখেছেন,

মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলেছেন, নামাযের মধ্যে ছোট্ট সূরাতুল ফাতেহার যে পরিমাণ সাওয়াব নামাযের বাইরে পুরা কুরআন খতমের সাওয়াবও ততটা নয়। তাহলে যে জামাত নামাযের দাওয়াত দেয় তাদের আজর সাওয়াবের পরিমাণ অনুমান করা কীভাবে সম্ভব! প্রতিটি কাজ স্ব-স্থানে ও স্ব-ক্ষেত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে থাকে।.....

“ইসলাম কি? ইসলাম অর্থ বর্তমানের দাবী ও হুকুম মাথা পেতে নেয়া। শয়তান আমাদেরকে বর্তমানের দাবী ও হুকুম মেনে নেয়া থেকে বিরত রাখে। আমাদের চোখের সামনে সে দু ধরনের পর্দা টেনে দেয়। প্রথমতঃ জুলমত ও অন্ধকারের পর্দা। অর্থাৎ নফসকে মন্দ কাজের স্বাদ লাগিয়ে তাতে মজিয়ে দেয়। দ্বিতীয়তঃ নূরনি পর্দা। অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ থেকে কম গুরুত্বপূর্ণতে সরিয়ে আনে। যেমন ফরযের সময় নফলে ব্যস্ত রাখে। আর নফস মনে করে যে, ভালো কাজেই তো আছি আমি। বর্তমানের সবচে বড় দায়িত্ব হলো দাওয়াত ও তাবলিগ। উত্তম থেকে উত্তম ইবাদতও এখন দাওয়াতে শিথিলতার বিকল্প হতে পারে না।

(দ্বীনি দাওয়াত, পৃষ্ঠা-১৫১-১৫২)

।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

‘নামাজের চেয়ে দাওয়াতের গুরুত্ব বেশি’ দ্বীনি মন্তব্য নয়। কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী মন্তব্য। নামায মূল ইবাদত, অন্য কোনো ইবাদতের উপকরণ নয়।

মন্তব্যের জবাব :

‘নামাযের চেয়ে দাওয়াতের গুরুত্ব বেশি’ কথাটি যদি মুহতারাম মাওলানার সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়, তারপরও তার একটা ব্যাখ্যা রয়েছে। দাওয়াত আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে এক ফরজ হুকুম। দাওয়াতি ফরজ দ্বারা মানুষের জীবনের যাবতীয় ফরজ, তথা ঈমান, ইসলাম, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত সব যিন্দা হয়ে থাকে। এই দাওয়াত দ্বারাই ইসলামের উন্নতি হয়। মুসলমানগন মাথা উচু করে দাঁড়ায়। বিশ্বময় ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মান বাড়ে। এরকম সামগ্রিক চিন্তা করে এক ফরজ নামাযের চাইতে শত ফরজের জন্মদাতা দাওয়াতি কাজের গুরুত্ব অনেক বেশিই হয়ে থাকবে। আর নামায, রোযা, দাওয়াত, তাবলিগ ইত্যাদি একেকটিকে আলাদা করে চিন্তা করলে সবাই জানে ঈমানের পর নামাযের হুকুমই বড় হুকুম। কিন্তু বর্তমান যামানায় দাওয়াতের কী গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা দাওয়াতের ময়দানে না নামলে সহজে বুঝা যাবে না।

দ্বিতীয়ত, নামায মূল ইবাদত এটাকে কেউ অস্বিকার করেনি। নামাযকে কেউ উপকরণ তো বলেনি। অভিযোগকারীর ভাষায় লিখিত মুহতারাম মাওলানার ভুল কথার মধ্যেও তো এসব কথার প্রমাণ নেই। একটা হুকুম আরেক হুকুমের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সময়ের ব্যবধানে কমবেশ হতে পারে। কিন্তু নামায উপকরণ হওয়ার বিষয়টি অভিযোগকারী কীভাবে কোথেকে আবিষ্কার করলেন? তাছাড়া নামায ইবাদতে মাকসূদা হয়েছে যদি অন্য কোনো ইবাদতের উপকরণ হয় তাতে কী সমস্যা? ঈমানের মেহনত করা সাথীদেরকে সহজে বিভ্রান্ত করা যায় না।

১২. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

হযরত ইউসুফ আ. বলে গাইরুল্লাহর দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কারণে অতিরিক্ত সাত বছর জেলখানায় থাকতে হয়েছে।

তাকসিল :

মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেব এখানে নতুন কোনা তাকসির করেননি। বলতে গেলে তিনি বেশির ভাগ মুফাসসিরদের তাকসির নকল করেছেন। বিশ্ব বিখ্যাত বড় বড় তাকসিরকারকদের ইবারত থেকে যে তাকসিরের প্রাধান্য পাওয়া যায় সে তাকসিরই তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অভিযোগকারী বেখেয়ালে নাকি ইচ্ছা করেই মাওলানা সা'আদ সাহেব সহ অধিকাংশ মুফাসসিরদের প্রতি এক ইলযাম (অভিযোগ) চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, যা আহলে ইলম উলামায়ে কেরামের কাছে একদম স্পষ্ট।

নিম্নে মাওলানা সা'আদ সাহেবের তাকসিরের কিছু উৎস আপনাদের কাছে পেশ করছি।

في تفسير ابن جرير الطبري

(1) عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يقل يوسف يعني الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث يعني حيث يبتغي الفرج من عند غير الله. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتب العقوبات والطبراني وابن مردويه

আল্লামা ইবনে জারির তুবারি রহ. তাঁর তাকসিরের কিতাবে কয়েকটি রেওয়াত উল্লেখ করেন,

(১) অর্থঃ ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইউসুফ আ. যদি না বলতো - ওই কথা যে কথা তিনি বলেছিলেন- তাহলে তিনি জেলখানায় অবস্থান করতেন না (অতিরিক্ত) যা তিনি অবস্থান করেছেন। অর্থাৎ তিনি গাইরুল্লাহর কাছ থেকে মুক্তি তলব করেছিলেন। এই রেওয়াতটিকে ইবনে আবিদ দুনিয়া উকুবাত কিতাবে, তুবরানি ও ইবনে মারদুইয়াহ রহ.ও উল্লেখ করেন।

(2) عن الحسن قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله يوسف لولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث يعني قوله: (اذكرني عند ربك)، قال: ثم يبكي الحسن فيقول: نحن إذا نزل بنا أمرٌ فزعنا إلى الناس. وأخرج أحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم

(২) অর্থঃ হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ইউসুফ আ.কে রহম করুক, তার ওই কথাটি যদি না হতো তাহলে তিনি জেলখানায় অবস্থান করতেন না অতিরিক্ত যা তিনি অবস্থান করেছেন, অর্থাৎ তার কথা اذكرني عند ربك অর্থঃ তুমি তোমার মালিকের কাছে আমার কথা স্মরণ করো। রাবি বলেন, তারপর হাসান রহ. কানতে লাগলেন, অতপর বলেছেন, যখন আমাদের উপর কোনো বিষয় এসে পড়ে তখন আমরা মানুষের কাছে ঝাপিয়ে পড়ি। এই রেওয়াতটিকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল যুহদ কিতাবে, ইবনে মুনিফির ও ইবনে হাতিমও উল্লেখ করেন।

(3) عن مجاهد قال: قال له: (اذكرني عند ربك)، قال: فلم يذكره حتى رأى الملك الرؤيا، وذلك أن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه، وأمره بذكر الملك وابتغاء الفرج من عنده، فلبث في السجن بضع

سنين) بقوله:(اذكرني عند ربك).وفي رواية له عقوبة لقوله:(اذكرني عند ربك) وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم

(৩) অর্থঃ মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইউসুফ আ. তাকে অর্থাৎ যার মুক্তির আশা করেছিলেন তাকে বললেন, তুমি তোমার মালিকের কাছে আমার কথা স্মরণ করো। রাবি বলেন, তারপর সে লোক ইউসুফ আ. এর কথা বাদশার কাছে বাদশার স্বপ্নে দেখা পর্যন্ত বলেনি। আর এটা এই কারণে যে, শয়তান ইউসুফ আ. কে রবের স্মরণ করতে ভুলিয়ে দিয়েছে এবং বাদশাকে স্মরণ করতে ও اذكرني عند ربك (অর্থঃ তুমি তোমার মালিকের কাছে আমার কথা স্মরণ করো) বলে বাদশার কাছ থেকে মুক্তি তলব করতে শয়তান তাকে আদেশ করেছে।। যার কারণে তিনি আরও কয়েক বছর জেলখানায় অবস্থান করতে হয়েছে। মুজাহিদ রহ. এর আরেক রেওয়াযাতে আছে,(তাকে আরও কয়েক বছর জেলখানায় থাকতে হয়েছে) اذكرني عند ربك এই কথার শাস্তি স্বরূপ।

(4) عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لولا أن يوسف استشفع على ربه، ما لبث في السجن طول ما لبث ولكن إنما عوقب باستشفاعه على ربه

(৪) অর্থঃ কাতাদাহ বলেন, আমার কাছে পৌছেছে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, ইউসুফ আ. যদি তাঁর রবের পরিবর্তে অন্য কারো কাছে সাহায্য না চাইতো তাহলে তিনি জেলখানায় অবস্থান করতেন না অতিরিক্ত যা তিনি অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে রবের পরিবর্তে অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়ার কারণে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হলো।

(5) عن ابن إسحاق قال: لما خرج يعني الذي ظن أنه ناج منهما رُدَّ على ما كان عليه ، ورضي عنه صاحبه ، فأفساه الشيطان ذكر ذلك للملك الذي أمره يوسف أن يذكره ، فلبث يوسف بعد ذلك في السجن بضع سنين . يقول جل ثناؤه: فلبث يوسف في السجن، لقليله للناجي من صاحبي السجن من القيل:"اذكرني عند سيدك"، بضع سنين ، عقوبة له من الله بذلك

(৫) অর্থঃ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন (তারা দুজনের মধ্যে যাকে তিনি নাজাতপ্রাপ্ত মনে করেছিলেন) সে বের হলো তখন তাকে যেখানে ছিল সেখানে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হলো এবং তার সঙ্গী তার ব্যাপারে রাজি থাকলো। অতপরঃ শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিলো ওই বাদশার কাছে ঐ আলোচনা করতে যে আলোচনা করতে ইউসুফ আ. তাকে আদেশ করেছিল। তাই ইউসুফ আ. এরপরে আরও কয়েক বছর জেলখানায় অবস্থান করলেন। আল্লাহ তা'আলা বলছেন, ইউসুফ আ. জেলখানায় আরও কয়েক বছর অবস্থান করলেন, দুই সঙ্গীর মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত সঙ্গীকে ইউসুফ আ. এর এই কথা (তুমি তোমার মালিকের কাছে আমার কথা আলোচনা করো) বলার কারণে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর শাস্তি স্বরূপ।

(6) عن عكرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنه قال الكلمة التي قال، ما لبث في السجن طول ما لبث وأخرج عبد الرزاق

(৬) অর্থঃ ইকরিমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনি যদি ওই কালিমাটি না বলতেন যা তিনি বলেছেন তাহলে তিনি জেলখানায় অবস্থান করতেন না (অতিরিক্ত) যা যিনি অবস্থান করেছিলেন। ইমাম আব্দুর রাজ্জাকও এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেন।

وفي تفسير البغوي

(7) قال ابن عباس وعليه الأكترون: أنسى الشيطان يوسفَ ذكرَ ربِّه حين ابتغى الفرج، من غيره واستعان بمخلوق، وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان

আল্লাহ মা বাগাভি রহ. তাঁর তাফসিরের কিতাবে কয়েকটি রেওয়াত উল্লেখ করেন,

(৭) অর্থঃ ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন এবং এর উপরই অধিকাংশরা যে, শয়তান ইউসুফ আ. কে ভুলিয়ে দিয়েছে তার রবের যিকির করতে যখন তিনি গাইরুল্লাহর থেকে মুক্তি তলব করলেন এবং একটা মাখলূকের কাছে সাহায্য চাইলেন। আর ওটা একটা গাফলত যা শয়তানের পক্ষ থেকে ইউসুফ আ. এর নিকট পেশ হয়েছিল।

(8) و قال مالك بن دينار: لما قال يوسف للساقى اذكرني عند ربك، قيل له: يا يوسف اتخذت من دوني وكيلا لأطيل حبسك، فبكى يوسف، وقال: يا رب أنسى قلبي كثرة البلوى فقلت كلمة ولن أعود

(৮) অর্থঃ মালিক বিন দিনার বলেন, যখন ইউসুফ আ. সাকিকে বললেন, তুমি তোমার মালিকের কাছে আমার কথা স্মরণ করিও তখন (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাকে বলা হলো, হে ইউসুফ, তুমি আমাকে ছাড়া আরেকজনকে কার্যনির্বাহি হিসাবে গ্রহণ করলে, অবশ্যই আমি তোমার বন্দিদশা লম্বা করে দেবো। অতপর ইউসুফ আ. কাঁদলেন এবং বললেন, হে রব, বিপদের আধিক্যতা আমার অন্তরকে ভুলিয়ে দিয়েছে, যার কারণে আমি একটা কথা বলে ফেলেছি আর আমি কখনো ফিরে এ কথা বলবো না।

(9) وقال الحسن: دخل جبريل على يوسف في السجن، فلما رآه يوسف عرفه فقال له: يا أخا المنذرين مالي أراك بين الخاطئين؟ فقال له جبريل: يا طاهر الطاهرين يقرأ عليك السلام رب العالمين، ويقول لك: أما استحييت مني أن استشفعت بالآدميين، فوعزتي لألبنتك في السجن بضع سنين، قال يوسف: وهو في ذلك عني راض؟ قال: نعم، قال: إذا لا أبالي.

(৯) অর্থঃ হাসান রহ. বলেন, জেলখানায় জিবরীল আ. ইউসুফ আ. এর কাছে প্রবেশ করলেন। অতপর ইউসুফ আ. যখন জিবরীল আ. কে দেখলেন তখন তাকে চিনে ফেললেন, অতপর তিনি জিবরীল আ. কে বললেন, হে ভীতিপ্রদর্শনকারীদের (নবীদের) ভাই, কি হলো, আমি তোমাকে অপরাধীদের মাঝে দেখছি। তখন জিবরীল আ. তাকে বললেন, হে পবিত্রকারীদের মধ্য থেকে একজন পবিত্রকারী, তোমার উপর রাব্বুল আলামিন সালাম এবং তিনি তোমাকে বলছে, আমার ব্যাপারে তুমি কেন লজ্জাবোধ করনি যে, তুমি মানুষদের কাছে সাহায্য চেয়েছো। আমার ইজ্জতের কসম, আরও কয়েক বছর জেলখানায় আমি তোমাকে অবস্থান করাবো। ইউসুফ আ. বললেন, এ ক্ষেত্রে তিনি কি আমার উপর রাজি আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইউসুফ আ. বললেন, তাহলে আমি কোনো পরওয়া করি না।

(10) وقال كعب: قال جبريل ليوسف إن الله تعالى يقول من خلقك؟ قال: الله، قال: فمن حببك إلى أبيك؟ قال: الله، قال: فمن نجاك من كرب البئر؟ قال: الله، قال: فمن علمك تأويل الرؤيا؟ قال: الله، قال: فمن صرف عنك سوء والفحشاء؟ قال: الله، قال: فكيف استشفعت بأدمي مثلك

(১০) অর্থঃ কা'ব বলেন, জিবরীল আ. ইউসুফ আ. কে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বলছেন, কে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন? ইউসুফ আ. বললেন, আল্লাহ। তিনি বললেন, অতপরঃ কে তোমাকে প্রিয় বানিয়ে দিলো তোমার বাবার কাছে? তিনি বললেন, আল্লাহ। তিনি বললেন, অতপরঃ কে তোমাকে কুপের বিপদ থেকে রক্ষা করলো? তিনি বললেন, আল্লাহ। তিনি বললেন, অতপরঃ কে তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছে।

তিনি বললেন, আল্লাহ। তিনি বললেন, অতপরঃ কে তোমার থেকে মন্দ ও অশ্লিলতাকে ফিরিয়ে নিয়েছে? তিনি বললেন, আল্লাহ। তিনি বললেন, অতপর তুমি কিভাবে তোমার মত একটা মানুষের কাছে সাহায্য চাইলে।

আল্লামা বাগাভি আরও বলেন, অতপর তিনি জেলখানায় بَضْعَ سنين কয়েক বছর অবস্থান করলেন। ওলামায়ে কেরামের بَضْع এর অর্থঃ নিয়ে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। মুজাহিদ ও কাতাদাহ রহ. এর মতে بَضْع এর পরিমাণ তিন থেকে নয় পর্যন্ত। ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, দশের নিচে যেকোনো সংখ্যা। তারপর বাগাভি বলেন,

وأكثر المفسرين على أن البضع في هذه الآية سبع سنين، وكان قد لبث قبله خمس سنين فجملته اثنتا عشرة سنة.

অধিকাংশ মুফাসসিরগণ এই মতের উপর যে, এই আয়াতের মধ্যে بَضْعَ سنين মানে সাত বছর। এই সাত বছর আগেও ইউসুফ আ. পাঁচ বছর অবস্থান করেছিলেন। সুতরাং ইউসুফ আ. মোট জেলখানায় অবস্থান করেছেন বারো বছর।

(11) ذكر الرازي

قولان : الأول والمعنى أن الشيطان أنسى يوسف أن يذكر ربه... أن مصلحته كانت في أن لا يرجع في تلك الواقعة إلى أحد من المخلوقين وأن لا يعرض حاجته على أحد سوى الله ، وأن يقتدي بجده إبراهيم عليه السلام ، فإنه حين وضع في المنجنيق ليرمى إلى النار جاءه جبريل عليه السلام وقال : هل من حاجة ، فقال أما إليك فلا ، فلما رجع يوسف إلى المخلوق لا جرم وصف الله ذلك بأن الشيطان أنساه ذلك التفويض ، وذلك التوحيد ، ودعاه إلى عرض الحاجة إلى المخلوقين ، ثم لما وصفه بذلك ذكر أنه بقي لذلك السبب في السجن بضع سنين ، والمعنى أنه لما عدل عن الانقطاع إلى ربه إلى هذا المخلوق عوقب بأن لبث في السجن بضع سنين ، وحاصل الأمر أن رجوع يوسف إلى المخلوق صار سبباً لأمرين : أحدهما : أنه صار سبباً لاستيلاء الشيطان عليه حتى أنساه ذكر ربه ، الثاني : أنه صار سبباً لبقاء المحنة عليه مدة طويلة

আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযি রহ. তার তাফসিরে উল্লেখ করেন,

(১১) অর্থঃ এতে দুটি মত আছে। প্রথম মত হলো, আয়াতের অর্থ শয়তান ইউসুফ আ. কে তাঁর রবের কথা স্মরণ করতে ভুলিয়ে দিয়েছে। ... আর এর লক্ষ্য ছিল ইউসুফ আ. ওই রকম ঘটনায় আর যেন কোনো মাখলুকের কাছে ফিরে না যায়। তিনি যেন উনার হাজতকে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে পেশ না করেন এবং তিনি যেন তার দাদা ইব্রাহিম আ. এর অনুসরণ করেন। কেননা, যখন ইব্রাহিম আ. কে রাখা হলো আগুনে ফেলে দেওয়ার জন্য তখন উনার কাছে জিবরীল আ. এসে বললো, আপনার কোনো প্রয়োজন আছে? তখন ইব্রাহিম আ. বললেন, আপনার কাছে নেই। এদিকে যখন ইউসুফ আ. মাখলুকের দিকে রুজু হইলেন তখন আল্লাহ তাআলা এর বিবরণ দিলেন যে, শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতে এবং ওই তাওহিদকে, এবং শয়তান তাকে দাওয়াত দিলো হাজত মাখলুকের কাছে পেশ করার জন্য। অতপরঃ যখন আল্লাহ তাআলা এর বিবরণ দিলেন তখন উল্লেখ করলেন, এই কারণে তিনি জেলখানায় আরও কয়েক বছর পড়ে রইলেন। অর্থঃ তিনি যখন আল্লাহর দিকে রুজু না হয়ে এই মাখলুকের দিকে ফিরে গেলেন তাকে এইভাবে শাস্তি দেওয়া হলো যে, তিনি আরও কয়েক বছর জেলখানায় থাকবেন। ঘটনার সারাংশ হলো ইউসুফ আ. মাখলুকের দিকে রুজু হওয়াতে দুটি বিষয়ে কারণ হলো, এক শয়তান তার উপর আধিপত্য বিস্তারের কারণ হলো, ফলে শয়তান তাকে তার রবের যিকির করতে ভুলিয়ে দিলো। দুই, লম্বা সময় তার উপর জেলের কষ্ট বাকি থাকবার কারণ হলো।

(12) وقال القرطبي في تفسيره

قوله تعالى: (فأنساه الشيطان ذكر ربه) الضمير في "فأنساه" فيه قولان: أحدهما - أنه عائد إلى يوسف عليه السلام، أي أنساه الشيطان ذكر الله عز وجل، وذلك أنه لما قال يوسف لساقى الملك - حين علم أنه سينجو ويعود إلى حالته الأولى مع الملك - "اذكرني عند ربك" نسي في ذلك الوقت أن يشكو إلى الله ويستغيث به، وجنح إلى الاعتصام بمخلوق، فعقب باللبث.... ثم ذكر في ذلك روايات ... وقيل: إن الهاء تعود على الناجي، فهو الناسي، أي أنسى الشيطان الساقى أن يذكر يوسف لربه، أي لسيده

(১২) আল্লামা কুরতুবি তার তাফসিরে বলেন, আল্লাহ তা'আলার আয়াত, অর্থ শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিলো রবের যিকির করতে। এর মধ্যে সর্বনামটি প্রত্যাবর্তন নিয়ে দুটি উক্তি। এক. এটি ইউসুফ আ. এর দিকে ফিরবে। অর্থাৎ শয়তান ইউসুফ আ. কে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর যিকির করতে। আর সেটা তখন যখন ইউসুফ আ. বাদশার সাকিকে বললো - যখন জানতে পারলো যে, সে নাজাত পেয়ে যাবে এবং সে প্রথম হলতে বাদশার কাছে ফিরে যাবে।- (ইউসুফ আ. বললেন, হে সাকি) তুমি তোমার মালিকের কাছে আমার কথা আলোচনা করো। তিনি ওই সময় আল্লাহর কাছে শিকায়ত করতে ভুলে গেলেন এবং তার কাছে সাহায্য চাইতে ভুলে গেলেন এবং একটা মাখলুককে ধরতে বুক পড়লেন। তারপর তার অতিরিক্ত অবস্থানের কথা বললেন। তার পর আল্লামা কুরতুবি এব্যাপারে অনেক রেওয়াত উল্লেখ করেন। তারপর বলেন, কেউ কেউ বলেন, হ্যাঁ সর্বনামটি নাজাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির দিকে ফিরবে। সেই ভুলে যায়। অর্থাৎ শয়তান তাকে ভুলিয়ে দেয় ইউসুফ আ. কথা তার মালিকের কাছে আলোচনা করতে।

وقال القرطبي في تفسيره أيضا

وفي المدة التي لبث فيها يوسف مسجوناً ثلاثة أقاويل:

أحدها - سبع سنين، قاله ابن جريج وقتادة ووهب بن منه، قال وهب: أقام أيوب في البلاء سبع سنين، وأقام يوسف في السجن سبع سنين.
الثاني - اثنتا عشرة سنة، قال ابن عباس.
الثالث - أربع عشرة سنة، قاله الضحاك.

অর্থঃ ইমাম কুরতুবি রহ. তার তাফসিরে বলেন, ইউসুফ আ. এর বন্দিদশা অবস্থানের সময়ের পরিমাণ নিয়ে তিনটি উক্তি আছে। এক. সাত বছর। ইবনে জুরাইজ রহ., কাতাদাহ রহ., ওয়াহাব রহ. বলেছেন। ওয়াহাব রহ. বলেন, আইয়ুব আ. বিপদে সাত বছর কাটিয়েছেন এবং ইউসুফ আ. জেলে সাত বছর কাটিয়েছেন।

দুই. বারো বছর। এটা বলেছেন ইবনে আব্বাস রাদি.

তিন. চৌদ্দ বছর। এটা বলেছেন দাহ্‌হাক রহ.।

বিস্তারিত আলোচনা উক্ত তাফসিরে রয়েছে, যার বেশি জানবার ইচ্ছা সেখান থেকে অধ্যয়ন করে নিলে হবে।

(13) وقال ابن كثير في تفسيره

لما ظن يوسف، عليه السلام، نجاة أحدهما وهو الساقى - قال له يوسف خفية عن الآخر والله أعلم، لئلا يشعره أنه المصلوب قال له: اذكرني عند ربك يقول: اذكر قصتي عند ربك وهو الملك فنسى ذلك الموصى أن يذكر مولاه بذلك، وكان من جملة مكاييد الشيطان، لئلا يطلع نبي الله من السجن هذا هو الصواب أن الضمير في قوله: فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عائد على الناجي، كما قال مجاهد، ومحمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال: إن الضمير عائد على يوسف، عليه السلام، رواه ابن جرير، عن ابن عباس، ومجاهد أيضاً، وعكرمة، وغيرهم.

(১৩) আল্লামা ইবনে কাসির তাঁর তাফসিরে উল্লেখ করেন, যখন ইউসুফ আ. তারা (বন্দিদের) দুজনের একজনের নাজাত পাওয়ার ব্যাপারে ধারণা করলেন, আর সে ছিল সাকি, তখন ইউসুফ আ. তাকে আরেকজন থেকে লুকিয়ে বললেন, যাতে সে টের না পেয়ে যায় যে সে সূলিতে চড়বে, আল্লাহ ভালো জানেন। ইউসুফ আ. তাকে বললেন, তুমি তোমার মালিকের কাছে আমার ঘটনা আলোচনা করিও। কিন্তু যাকে ইউসুফ আ. ওসিয়ত করেছিলেন সে ভুলে গেল তার মালিকের কাছে আলোচনা করতে। আর এসব হয়েছে শয়তানের চক্রান্তে, যাতে আল্লাহর নবী জেল থেকে বের না হয়। এটাই সঠিক যে, এর সর্বনামটি ওই মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তণ করবে। যেমনটা বলেছেন মুজাহিদ রহ. ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রহ. ইত্যাদি। এবং এও বলা হয় যে, সর্বনামটি ইউসুফ আ. এর দিকে প্রত্যাবর্তণ করবে। ইবনে জারির আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. মুজাহিদ ও ইকরিমা প্রমুখদের থেকে বর্ণনা করেন।

(14) قال محمود الألوسي في روح المعاني

روي عن أنس قال : « أوحى الله تعالى إلى يوسف عليه السلام من استنقذك من القتل حين هم إخوتك أن يقتلوك ، قال : أنت يا رب ، قال : فمن استنقذك من الجب إذ ألقيك فيه ، قال : أنت يا رب ، قال : فمن استنقذك من المرأة إذ همت بك ، قال : أنت يا رب ، قال : فما بالك نسيتني وذكرت آدمياً ، قال : يا رب كلمة تكلم بها لساني ، قال : وعزتي لأدخلنك في السجن بضع سنين » وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم وغير ذلك من الأخبار ...
ثم بعد قليل قال ولا يشكل على هذا أن الاستعانة بالعباد في كشف الشدائد مما لا بأس به ، فكيف عوتب عليه السلام في ذلك لأن ذلك مما يختلف باختلاف الأشخاص ، واللائق بمناصب الأنبياء عليهم السلام ترك ذلك والأخذ بالعزائم

(১৪) আল্লামা মাহমুদ আলুসি রহ. এর তাফসির, রুহুল মা'আনিতে বলেন, হযরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ আ. এর কাছে অহি পাঠালেন যে, যখন তোমার ভাইয়েরা তোমাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল তখন তোমাকে কে হত্যা থেকে রক্ষা করেছিল? ইউসুফ আ. বললেন, তুমি হে রব। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমার কি অবস্থা, তুমি আমাকে ভুলে গেলে এবং একটা মানুষ স্মরণ করলে। ইউসুফ আ. বললেন, হে রব, একটা বাক্য আমার যবান দ্বারা বের হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার ইজ্জতের কসম তোমাকে অবশ্যই আরও কয়েক বছর জেলখানায় প্রবেশ করাবো।

এটি বর্ণনা করেছেন, ইবনে আবি শাইবা, ইবনে আহমদ, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবি হাতিম রহ প্রমুখ। একটু পরে গিয়ে আল্লামা মাহমুদ আলুসি রহ. বলেন, এর উপর প্রশ্ন করা যাবে না যে, বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য মানুষের কাছে এরকম সাহায্য চাওয়া তো দোষনীয় নয়। তাহলে কিভাবে এক্ষেত্রে ইউসুফ আ. কে ভরসানা করা হলো? কেননা, ব্যক্তির ভিন্নতার দরুন ব্যবহারের ভিন্নতা আসে। নবীর পদমর্যদা দাবি হলো এসব বিষয় বর্জন করা। আজিমত ও প্রত্যয়কে গ্রহণ করাই বেশি উপযুক্ত।

(15) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : عثر يوسف ثلاث عثرات حين هم بها فسجن و قوله للرجل : اذكرني عند ربك فلبث في السجن بضع سنين فأنساه الشيطان ذكر ربه و قوله لهم { إنكم لسارقون } المستدرك للحاكم 189\3 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه

(১৫) ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইউসুফ আ.৩ টি হোঁচট খেলেন। (১) যখন তিনি তার (যুলায়খার) ইচ্ছা করলেন তখন তাকে জেলে ঢুকানো হয়। (২) (নাজাতপ্রাপ্ত) লোকটিকে তাঁর একথা বলা যে, اذكرنى عند ربك অর্থঃ তুমি তোমার মালিকের কাছে আমার কথা আলোচনা করিও। সে কারণে তিনি জেলখানায় আরও কয়েক বছর অবস্থান করেন। শয়তান তাকে রবের কথা স্বরন করতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। (৩) এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে তাঁর এই কথা যে, তোমরা চোর। (মুস্তাদরাক লিল হাকিম-৩/১৮৯) আল্লামা হাকিম রহ. এই হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন, এটি ইমাম বুখারি ও মুসলিম রহ. এর শর্ত অনুযায়ী সহিহ হাদিস এবং তারা দুজন তাদের কিতাবে এই হাদিসটিকে উল্লেখ করেননি।

(16) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قالها : اذكرنى عند ربك ما لبث في السجن ما لبث ورحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد إذ قال لقومه : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال : فما بعث الله نبيا بعده إلا في ثروة من قومه) صحيح ابن حبان 86\14

(১৬) হযরত আবু হুরাইরা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ আ. কে রহম করুক, সেই কালিমাটি যদি না হতো যে কালিমাটি তিনি বলেছিলেন অর্থাৎ তুমি তোমার মালিকের কাছে আমার কথা আলোচনা করো। তাহলে তিনি জেলখানায় অতিরিক্ত যা থেকেছেন তা থাকতে হতো না। আল্লাহ তা'আলা লুত আ. কে রহম করুক। তিনি শক্ত রুকুনের আশ্রয় নিলেন যখন তিনি তার কওমকে বললেন, তোমাদের ব্যাপারে যদি আমার শক্তি থাকতো! বরং আমি আশ্রয় চাইবো শক্ত রুকুনের কাছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারপর আল্লাহ যখনই নবী প্রেরণ করেছেন, লুত আ. এর কওমের বংশধরের মধ্যেই প্রেরণ করেছেন।

(সাহিহ ইবনে হিব্বান, ১৪/৮৬)

(17) ولو لا الكلمة لما لبث في السجن حيث يبتغي الفرج من عند غير الله قوله : (اذكرنى عند ربك) كنز العمال 338\10

(১৭) অর্থঃ ওই কালিমাটা যদি না বলতো তাহলে তিনি অতিরিক্ত জেলখানায় অবস্থান করতেনা না। কিন্তু তিনি মুক্তি চাইলেন গাইরুল্লাহর কাছ থেকে। তার কালিমাটি হলো অর্থঃ তুমি তোমার মালিকের কাছে আমার কথা স্বরণ করিও। (কনযুল উম্মাল, ১০/৩৩৮)

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

আর সা'আদ সাহেব গাইরুল্লাহর দিকে দৃষ্টি না দেওয়ার কারণে এক দিনও জেলে যেতে হয়নি। তাই কি?

মন্তব্যের জবাব :

অভিযোগকারী এখানে একটা ঠিক মন্তব্য করেছেন। আমাদের চেয়ে উনি গাইরুল্লাহর দিকে একটু কমই দৃষ্টি দিয়েই থাকেন। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে এত মাকবুলিয়াত দান করলেন যে, আরব-আজম সবাই উনাকে মহব্বত করছেন এবং উনার হেদায়াত-পথনির্দেশনা মেনে চলছেন। আর আল্লাহ তা'আলা উনি ও উনার পূর্বপুরুষের মত মহান ব্যক্তিদের মাধ্যমে শতধা বিভক্ত পুরো উম্মতকে এক করা ও ঈমান-আমলে নেক করার মেহনতকে যিন্দা করছেন। সারা দুনিয়া নিযামুদ্দিন মারকায ও মারকাযের আমিরকে মেনে চলছে। যে দেশে কিছু মুসলিম আছে, কিন্তু মুসলিমদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য মসজিদ মাদ্রাসা ও দ্বীনী অন্য কোনো মেহনত

নেই সেখানেও তাবলিগের মেহনত আছে। তাবলিগের মেহনত চলছে। জেলখানায় যাওয়া আয়েব নয়, বরং ইবরত, তায়কিয়া, ইস্তেকামাতের নমুনা কয়েমের মাধ্যম হিসাবে আসলাফদের জীবন থেকে আমরা পেয়ে আসছি।

বিদ্রঃ ইউসুফ আ. এই ঘটনা তাফসির আলোকে বয়ান করা ইসমতে আশ্বিয়ার খেলাফ নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মনে করেন, নবীদের থেকে উত্তমের খেলাফ ভুল সংঘটিত হতে পারে। এটা ইসমতে আশ্বিয়ার খেলাফ নয়। আমাদের জীবনে প্রতিনিয়ত কত কাজকর্মে কত মানুষের সাহায্য চেয়ে থাকি। কিন্তু তিনি নবী হওয়ার কারণে সামান্য পদস্থলনের হুশিয়ারিও আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে গেছে।

১৩. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

হযরত মূসা আ. দাওয়াত ছেড়ে দিয়ে কিতাব আনতে চলে গেছেন। দাওয়াত ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে ৫ লাখ ৮৮ হাজার লোক মুরতাদ হয়ে গেল।

তাফসিল :

এখানে মাওলানা সা'আদ সাহেব ইজতিহাদ করে নতুন কোনো তাফসির করেননি। বরং তিনি এক জামাত আহলে হক ও আহলে তাফসির উলামায়ে কেরামের তাফসির নকল করেছেন মাত্র। মূসা আ. কওমকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে ৫ লাখ ৮৮ হাজার লোক মুরতাদ ও গুমরাহ হয়ে যাওয়ার কথা বহুত তাফসিরকারক উল্লেখ করেছেন।

নিম্নে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হলো :

(1) في مفاتيح الغيب للعلامة فخر الدين الرازي.....

عرفه الله تعالى ما حدث من القوم بعد أن فارقه مما كان يبعد أن يحدث لو كان معهم فقال : { فَأَبَا قَدْ
فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ المراد بالقوم ههنا هم الذين خلفهم مع هارون عليه السلام على ساحل
البحر وكانوا ستمائة ألف افتتنوا بالعجل غير أنني عشر ألفاً

(১) আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযি রহ. তার বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

মূসা আ. তিনি তাঁর কওমকে পৃথক রেখে চলে আসার পর তাঁর কওমের মধ্যে যা ঘটে গেল তা আল্লাহ তা'আলা মূসা আ.কে জানিয়ে দিলেন। যদি তিনি তাদের সাথে থাকতেন তাহলে তাদের মধ্যে এরকম ঘটনা ঘটে যাওয়াটা খুবই দূরবর্তী ছিল। আল্লাহ তা'আলা (মূসা আ. কে) বললেন, নিশ্চয় আমরা (আমি) তোমার কওমকে তোমার আসার পরে পরীক্ষায় ফেলেছি এবং তাদেরকে সামেরি গুমরাহ করে দিয়েছে। এখানে কওম দ্বারা উদ্দেশ্য তারা যারা হারুন আ. সাথে সমুদ্রের তীরে ছিল। তারা ৬ লক্ষ ছিল। বাছুর পূজার ফেৎনায় ১২ হাজার ছাড়া সবাই ফেৎনায় পড়ে গেছে। অর্থাৎ ৫ লাখ ৮৮ হাজার।

(2) في التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور...

وكان ذلك سبب افتتان قومه بصنع صنم يعبدونه وأن سبب ذلك استبطاؤهم رجوع موسى (قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى) (طه : 91)وقوله هنا (هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَثَرِي) يدل على أنهم كانوا سائرین خلفه وأنه سبقهم إلى المناجاة واعتذر عن تعجله بأنه عجل إلى استجابة أمر الله مبالغة في إرضائه ، فقوله تعالى : (فَأَنَا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ) فيه ضرب من الملام على التعجل بأنه تسبب عليه حدوث فتنة في قومه ليعلمه أن لا يتجاوز ما وُقت له ولو كان لرغبة في ازدياد من الخير

(২) আল্লামা ইবনে আশুর রহ. তাফসিরে তাহরির ও তানবীরে উল্লেখ করেন,

আর ওটা (কওমকে ছেড়ে মূসা আ. এর দ্রুত চলে আসাটা) কারণ হলো তাঁর কওম পূজা করার জন্য মূর্তি (বাছুর) বানানোর ফেৎনায় পড়ার। আর ওটার (বাছুর পূজার আধিক্যতার) কারণ হলো মূসা আ. এর ফিরে আসাটিকে তাদের বিলম্বিত মনে করা। তারা বললো, আমরা তার (বাছুর পূজার) উপর অটল থাকবো যেযাবৎ মূসা আ. আমাদের কাছে ফিরে না আসে। মূসা আ. এর উক্তি তারা তো আমার পশ্চাতে রয়েছে। এটি প্রমান করে, তারা মূসা আ. এর পিছনে সফর করে আসছে। আর মূসা আ. তাদের আগে মুনাজাতের জন্য চলে এসেছেন। তাঁর এই ত্বরা করার ওয়র পেশ করলেন যে, অতিরিক্ত সম্ভষ্টির আশায় তিনি আল্লাহর আদেশে সাড়া দিতে ত্বরা করলেন। আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি (فَأَنَا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ) এতে ত্বরা করার উপর এক প্রকার ভর্ৎসনা রয়েছে যে, তাঁর ত্বরাটা কারণ হলো, কওমের মধ্যে ফিৎনা সংঘটিত হওয়ার। যাতে তাকে জানিয়ে দেওয়া যায়, তিনি যেন যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তা অতিক্রম না করে, যদিও অতিরিক্ত খাইর বা কল্যানের প্রতি উৎসাহের কারনে হয়।

(3) وفي تفسير السراج المنير لشمس الدين الشربيني فقيه الشافعي

قال تعالى : فَأَنَا أَي : تسبب عن عجلتك عنهم أنا قد فتنا أي : ابتلينا قومك من بعدك أي : بعد فراقك لهم بعبادة العجل ، وهم الذين خلفهم مع هارون ، وكانوا ستمائة ألف وما نجا من عبادة العجل منهم إلا اثنا عشر ألفاً

(৩) তাফসিরে সিরাজুল মুনিরে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, অবশ্যই আমরা, অর্থাৎ তাদের থেকে তাঁর (মূসা আ. এর) ত্বরা করাটা কারণ হলো এ বিষয়ের যে, আমরা আপনার কওমকে আপনার চলে আসার পর, অর্থাৎ তাদের থেকে আপনার পৃথক হওয়ার পরে,(আমি) তাদেরকে ফেৎনায় ফেলে দিয়েছি বাছুর পূজার মাধ্যমে। আর তারা হলো, যাদেরকে তিনি হারুন আ. এর সাথে পিছনে রেখে এসেছিল। আর তাদের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ। বাছুর পূজা থেকে তাদের ১২ হাজার ছাড়া কেউ রক্ষা পায়নি। (অর্থাৎ ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার লোক গুমরাহ হয়ে গেল)

(4) في تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي

قال الرب سبحانه : فَأَنَا أَي قد تسبب عن عجلتك عنهم أنا قد فتنا أي خالطنا بعظمتنا مخالطة مميلة محيلة قومك بتعجلك . ولما كانت الفتنة لم تستغرق جميع الزمن الذي كان بعده ، وإنما كانت في بعضه أدخل الجار فقال : من بعدك أي خالطتهم بأمر من أمرنا مخالطة أحالتهم عما عهدتهم عليه ، وكان

ذلك بعد تمام المدة التي ضربتها لهم ، ... فلما تأخر رجوعك إليهم حصل لهم الفتون بالفعل ، فظنوا
مرجمات الظنون ولما عمتهم الفتنة إلا اثني عشر ألفاً من أكثر من ستمائة ألف
(৪) আল্লামা বুরহানুদ্দিন রহ. তাফসিরে নজমুদ দুরারে উল্লেখ করেন,

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, অবশ্যই আমরা, অর্থাৎ তাদের থেকে তাঁর তাড়াছড়া করায় কারণ হলো যে, অবশ্যই
আমরা ফেৎনায় ফেলেছি, অর্থাৎ আমি আমার পক্ষ থেকে একটি বড় বিষয়ে তাদেরকে মিশিয়ে দিলাম এমন
মিশা, যে মিশা ধাবিত করে দিলো, পাল্টিয়ে দিলো তোমার কণ্ঠকে তোমার ত্বরা করার কারণে। মূসা আ.
চলে যাওয়ার পর পুরো সময়টা ফেৎনায় বিষ্টিত যখন ছিল না এবং কিছু সময়ের মধ্যে যখন ছিল তখন এই
জন্যেই ‘হরফুল জার’ প্রবেশ করালেন। তাই বললেন, من بعدك । অর্থাৎ আমার হুকুম থেকে আমার কোনো
একটি হুকুমের সাথে তাদেরকে আমি মিশিয়ে দিলাম এমনভাবে যে, যার উপর থাকার ওয়াদা আপনি
তাদেরকে করিয়েছিলেন তার থেকে তাদেরকে সরিয়ে দিলো। আর এটা হয়েছে আপনি তাদের কাছে যে
সময় বর্ণনা করেছিলেন সে সময় পূর্ণ হওয়ার পর। ... অতপর যখন তাদের কাছে আপনার ফিরে যাওয়াটা
বিলম্বিত হলো তখনই তাদের কার্যত ফেৎনাসমূহ হাসিল হয়ে গেল। তাই তারা আন্দায়ে বহুত ধারণা করলো।
ফিৎনা তাদের সকলকে বেষ্টিত করে নিলো ৬ লক্ষের মধ্যে ১২ হাজার বাদে। অর্থাৎ ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার।
(5) وفي زهرة التفاسير لأبي زهرة

والفاء للسببية ، أى بسبب غيبتك وعدم قيامك بحق الرقابة النفسية عليهم التى مكناك منها قد فتنا قومك
من بعدك أى اختبرناهم
(৫) যাহরাতুত তাফাসিরে আছে,

এখানে ‘ফা’ হরফটি কারণ দর্শানোর জন্য। অর্থাৎ আপনার অনুপস্থিত থাকার কারণে এবং তাদের উপর যে
সত্তাগত পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা আমি আপনাকে দিয়েছি তা বাস্তবায়ন না করার কারণে আমি আপনার কণ্ঠকে
আপনার চলে আসার পরে ফেৎনায় ফেলেছি অর্থাৎ পরীক্ষা করেছি।

(6) وفي أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري
من هداية الآيات ذم العجلة وبيان آثارها الضارة فاستعجال موسى الموعد وتركه قومه وراءه كان سبباً
في أمر عظيم وهو عبادة العجل

(৬) আইসারুত তাফাসিরে আছে,
আয়াতের হিদায়াতে রয়েছে তাড়াছড়া করা নিন্দনীয় এবং তাড়াছড়া করার ক্ষতিকর পরিণামের বর্ণনা।
সুতরাং ওয়াদার নির্ধারিত সময়ের ক্ষেত্রে হযরত মূসা আ. এর তাড়াছড়া করাটা এবং কণ্ঠকে তাঁর ছেড়ে
আসাটা বড় একটা বিষয়ের কারণ হয়ে গেল। আর সে বড় বিষয়টি হলো তাদের বাছুর পূজা করা।

(7) وفي تفسير المظهرى لثناء الله بانيفوتى
فإن قيل فأنا قد فتنا مرتب على قوله عجلت إليك والتقدير إذا عجلت إلى فأنا قد فتنا قومك وهذا الكلام
يقتضى كون العجلة سبباً للفتنة إذا الفاء للسببية...ولما كان عجلة موسى عليه السلام إلى الله تعالى مبنياً
على غلبة المحبة والشوق وشكر ذلك انقطع عند ذلك توجه باطيه عن الأمة فحينئذ وقع أمة في الفتنة
والضلال

(৭) আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথি রহ. তাফসিরে মাজহারিতে উল্লেখ করেন,

যদি বলা হয়, فَأَنَا قَدْ فَتَّنَا (অর্থঃ অবশ্যই আমি পরীক্ষায় ফেলেছি) বাক্যটি إِلَيْكَ (অর্থঃ আমি আপনার কাছে তাড়াহুড়া করে এসেছি) এই বাক্যটির প্রেক্ষিতে বলা, তাহলে উহ্য সহ পূর্ণ বাক্য এমন হবে যে, “যখন আপনি আমার কাছে তাড়াহুড়া করে আসলেন তখনই আমি আপনার কওমকে পরীক্ষায় ফেলেছি।” আর এই বাক্যটি দাবি করে যে, তাড়াহুড়া করাটা ফেৎনায় পড়ার কারণ হলো। কেননা, (فَأَنَا قَدْ فَتَّنَا) এর ‘ফা’ হরফটি কারণ দর্শানোর জন্য। ... অধিক মহব্বত ও আগ্রহ এবং শুকরিয়ার আদায় করার উপর ভিত্তি করে যখন আল্লাহর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে মূসা আ. এর তাড়াহুড়া হলো তখন ওই সময় উম্মতের উপর তাঁর গভীর বাতিনি তাওয়াজ্জুহটি বন্ধ হয়ে গেল। তখনই উম্মত ফিৎনা ও গুমরাহির মধ্যে পতিত হয়ে গেল।

(8) فِي رُوحِ الْمَعَانِي لِمَحْمُودِ الْأُلُوسِي

والفاء لتعليل ما يفهمه الكلام السابق كأنه قيل : لا ينبغي عجلتك عن قومك وتقدمك عليهم وإهمال أمرهم لوجه من الوجوه فإنهم لحدثاء عهدهم باتباعك ومزيد بلاهتهم وحماعتهم بمكان يحق فيه مكر الشيطان ويتمكن من إضلالهم فإن القوم الذين خلفتهم مع أخيك قد فتتوا وأضلهم السامري بخروجك من بينهم فكيف تأمن على هؤلاء الذي أغفلتهم وأهملت أمرهم ...

(৮) আল্লামা মাহমুদ আলুসি রহ. রুহুল মা'আনীতে উল্লেখ করেন,

(وما أعجلك عن قومك ...) এই আয়াতে ‘ফা’ হরফটি পূর্ব বাক্য (فَأَنَا قَدْ فَتَّنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ ...) এর মর্মার্থের কারণ বর্ণনা করার জন্য এসেছে। কেমন যেন বলা হলো, যেকোনো কারণে কওমকে ছেড়ে তোমার তাড়াহুড়া করাটা এবং তাদের উপর তোমার অগ্রসর হওয়াটা এবং তাদের ব্যাপারটাকে ফেলে রেখে আসাটা উচিত নয়। কেননা, তোমার আনুগত্যের উপর তাদের ওয়াদা নতুন হওয়ার কারণে এবং তাদের নির্বুদ্ধিতা ও জ্ঞান-স্বল্পতার কারণে তারা এমন এক স্থানে আছে, যেখানে শয়তানের চক্রান্ত বেঁটন করে আছে এবং তাদেরকে গোমরাহ করার সক্ষমতা শয়তান রাখে। কেননা, যে কওমকে তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে পিছনে রেখে এসেছো সে কওম ফেৎনায় পড়েছে এবং তুমি তাদের থেকে বাহির হওয়ার দ্বারা সামেরী তাদেরকে গুমরাহ করে দিয়েছে। তাহলে তুমি ওই সকল লোকের ব্যাপারে কিভাবে নিরাপদ মনে করলে যাদেরকে তুমি অবহেলায় ছেড়ে এসেছো এবং তাদের ব্যাপারটা ফেলে রেখে চলে এসেছো।...

(৯) মুফতি শফি' রহ. মা'রিফুল করআনে লিখেন,

তুরা করা সম্পর্কে মূসা (আঃ) কে প্রশ্ন ও রহস্য :

মূসা (আঃ) তার সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে আশা করেছিলেন যে, তারাও বোধ হয় তুর পর্বতের নিকট পৌছে গেছে। তার এই ভ্রান্তি দূর করা এবং বনী ইসরাইল যে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছে, এই খবর দেয়াই ছিল উপরোক্ত প্রশ্নের বাহ্যতঃ উদ্দেশ্য। (ইবনে-কাসীর)

রুহুল মা'আনীতে কাশশাফের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে : এই প্রশ্নের কারণ ছিল মূসা (আঃ) কে তার সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া এবং এই তুরা করার জন্যে হুশিয়ার করা যে, নবুওয়তের পদের তাগিদ অনুযায়ী কওমের সাথে থাকা, তাদেরকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখা এবং সঙ্গে আনা উচিত ছিল। **তঁর তুরা করার ফলশ্রুতিতে সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।** এতে স্বয়ং তুরা করার কাজেরই নিন্দা করা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণের মধ্যে এই ক্রটি না থাকা বাঞ্ছনীয়। “ইনতিসাফ” গ্রন্থের বরাত দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, এতে মূসা (আঃ) কে কওমের সাথে সফর করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয় যে, যে ব্যক্তি

কওমের নেতা, তার পশ্চাতে থাকা উচিৎ : যেমন লূত (আঃ) এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্দেশ দেন যে, মুমিনদেরকে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে পড় এবং তাদেরকে অগ্নি রেখে তুমি সবার পশ্চাতে থাকো।

(মা'আরিফুল কুরআন, মুফতি শফি রহ. অনুবাদক, মাওলানা মহিউদ্দিন খান - ৬/১৩২, এক বলিয়মে সৌদিআরবের ছাপা- ৮৬১ পৃষ্ঠা)

(১০) জামালাইন শরহ জালালাইনে আছে,

উদ্দেশ্য এই কথার উপর সতর্ক করা যে, আপনার রিসালাতের পদমর্যদার তাকায়া এই ছিল যে, আপনি (মূসা আ.) কওমের সাথে থাকতেন এবং তাদের উপর নজর রাখতেন। আপনার ত্বরা করার ফলাফল এই হলো যে, কওমকে সামেরি গুমরাহ করে দিলো। (৪/২০২)

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

হযরত মূসা আ. নিজে যাননি, তাঁকে আল্লাহ তায়ালা ডেকে নিয়েছেন। ইরশাদে হচ্ছে, *وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ* *ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ قَتْمٍ مِّقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً* - সা'আদ সাহেব বলেন, আল্লাহ তায়ালা ডেকে মূছা আ. এর কওম ছেড়ে যাওয়া উচিৎ হয়নি। তাহলে কী আল্লাহ তায়ালা থেকে সা'আদ সাহেবের জ্ঞান বেশি হয়ে গেল?

মন্তব্যের জবাব :

অভিযোগকারী শুধু *وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ* আয়াতটির প্রতি নজর দিয়েছেন। তিনি যদি *وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ* এই আয়াতটির প্রতিও নজর দিতেন তাহলে এরকম ভুল মন্তব্য করতেন না। কুরআন শরিফের আয়াত ও অসংখ্য তাফসির লিখকদের ইবারাত থেকে প্রমানিত যে, মূসা আ. কে আল্লাহর কাছে একা আসতে বলা হয়নি। বরং বনি ইসরাইলের সকলকে, মুফাসসিরদের আরেক উক্তি মোতাবেক বনি ইসরাইলের নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল। কিন্তু কওমকে ছেড়ে একাকি আল্লাহর কাছে হাজির হওয়াটা আল্লাহর কাছে পছন্দ হয়নি বলে আমরা আয়াতের ইশারাতে এবং বহু তাফসির লেখকদের কিতাবাদিতে পাই। আর সেই তাফসিরই মাওলানা সা'আদ সাহেব নকল করেছেন। আর নবীদের থেকে এরকম সুক্ষ ভুল হয়ে যাওয়াটা 'ইসমতে আশ্বিয়ার' খেলাফ নয়। নবীদের থেকে কোনো প্রকার ভুল হবে না, কবিরার, সগিরার, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় কোনো ভুলই না হওয়া আহলে সুন্নাত ও ওয়াল জামাতের আকিদা নয়। এরকম আকিদা শিয়া ও মু'তাযিলারা লালন করে। ইনশা আল্লাহ 'ইসমতে আশ্বিয়ার' উপর সামনে সংক্ষিপ্তভাবে আহলে হক ওলামায়ে কেরামের বিশ্লেষণ উল্লেখ করবো।

নিম্নে কওমকে সাথে নেওয়ার ব্যাপারে মূসা আ. যে আদিষ্ট ছিল তার দু একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি। এখানে তাফসিরের কিতাবের সব উদ্ধৃতি বিস্তারিত উল্লেখ করার সুযোগ নেই।

(1) في تفسير الطبري

(عَنْ قَوْمِكَ يَامُوسَى) فتقدمتهم وخلفتهم ورائك، ولم تكن معهم (قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَثَرِي) يقول: قومي على أثري يلحقون بي (وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى) يقول وعجلت أنا فسبقتهم رب كيما ترضى عني. وإنما قال الله تعالى ذكره لموسى: ما أعجلك عن قومك، لأنه جل ثناؤه، فيما بلغنا، حين نجاه وبني إسرائيل من فرعون وقومه، وقطع بهم البحر، وهداهم جانب الطور الأيمن، فتعجل موسى إلى ربه، وأقام هارون في بني إسرائيل يسير بهم على أثر موسى

(১) বিখ্যাত তাফসিরের কিতাব তুরারিতে আছে,

আপনি তাদের আগে চলে এসেছেন এবং তাদেরকে আপনার পিছনে রেখে এসেছেন। তাদের সাথে আপনি থাকেননি। তখন মূসা আ. বললেন, আমার কওম আমার পশ্চাতে আসছে, তারা এসে আমার সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। আর আমি হে রব, তাদের আগে চলে এসেছি যাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহ তা'আলা মূসা আ. কে বললেন, কিসে তোমাকে তুরা করালো তোমার কওম থেকে? (আল্লাহ তা'আলা বলেন) কেননা, আমাদের কাছে পৌছেছে যে, আল্লাহ তা'আলা মূসা আ. ও তাঁর কওমকে ফেরাইন ও তার বাহিনী থেকে যখন মুক্তি দিলেন এবং মূসা আ. তার কওমকে নিয়ে সদুদ্দ ক্রস করে চলে আসলেন তখন তাদেরকে (মূসা আ. ও তাঁর কওমকে) তুর পর্বতের ডান পার্শে যাওয়ার ওয়াদা নিলেন। কিন্তু মূসা আ. তার রবের কাছে দ্রুত চলে গেলেন এবং হারুন আ. কে বনি ইসরাইলের মধ্যে রেখে গেলেন যাতে তিনি তাদেরকে নিয়ে মূসা আ.এর পশ্চাতে ভ্রমণ করেন।

(2) وفي تفسير فخر الدين

{ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَامُوسَى } دلالة على أنه تعالى أمره بحضور الميقات مع قوم مخصوصين ، واختلفوا في المراد بالقوم فقال بعضهم : هم النقباء السبعون الذين قد اختارهم الله تعالى ليخرجوا معه إلى الطور فتقدمهم موسى عليه السلام شوقاً إلى ربه . وقال آخرون : القوم جملة بني إسرائيل وهم الذين خلفهم موسى مع هارون وأمره أن يقيم فيهم خليفة له إلى أن يرجع هو مع السبعين

(২) তাফসিরে রাযির মধ্যে আছে,

এই আয়াতে এই কথার প্রমাণ আছে যে, আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত সময়ে মূসা আ. কে বিশেষ কওমের সাথে হাজির হওয়ার আদেশ করেছেন। এখানে কওম দ্বারা উদ্দেশ্য কারা? এ ব্যাপারে উলামায়ে কেলাম ইখতিলাফ করেছেন। কতক ওলামা বলেছেন, তারা হলেন ৭০ জন নাকিব যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মূসা আ. এর সাথে বাহির হয়ে তুর পাহাড়ে আসার জন্য নির্বাচন করেছেন। কিন্তু মূসা আ. আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত শওক ও আগ্রহের কারণে তাদের থেকে আগে বেড়ে গেলেন। ওলামাদের আরেক জামাত বলেন, এখানে কওম দ্বারা উদ্দেশ্য বনি ইসরাইলের সবাই। যাদেরকে হারুন আ. এর সাথে মূসা আ. পশ্চাতে রেখে এসেছেন। আর হারুন আ. কে আদেশ করেছিলেন যে, তিনি তাদের মধ্যে তাঁর খলিফা হিসাবে অবস্থান করবেন তিনি (মূসা আ.) ৭০ জনের সাথে ফিরা পর্যন্ত।

(3) في أيسر التفاسير لأبي بكر الجازائري

أخبرهم موسى أن ربه تعالى قد أمره أن يأتيه ببني إسرائيل وهم في طريقهم إلى أرض المعاد إلى جبل الطور ليؤتيهم التوراة فيها شريعتهم ونظام حياتهم دنيا ودينا وأنه واعدهم جانب الطور الأيمن ، واستعجل موسى في المسير إلى الموعد فاستخلف أخاه هارون على بني إسرائيل ليسير بهم وراء موسى ببطء حتى يلحقوا به عند جبل الطور ، وحدث أن بني إسرائيل فتنهم السامري بضع العجل ودعوتهم إلى عبادته وترك المسير وراء موسى عليه السلام

(৩) আল্লামা আবু বকর জাযায়েরি আইসারুত তাফাসিরে উল্লেখ করেন,

মূসা আ. তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ আ'আলা তাঁকে আদেশ করেছেন বনি ইসরাইলকে নিয়ে আসতে। তখন তারা রাস্তায়, তুর পর্বতের প্রতিশ্রুত ভূ-খন্ডের দিকে। কারণ, আল্লাহ তাদেরকে তাওরাত দিবেন, যে তাওরাতে শরিয়ত, দ্বীনী ও দুনিয়াবি যিন্দগির নিয়ম-কানুন রয়েছে। তিনি তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তুর পর্বতের ডান পার্শ্বের। আর মূসা আ. প্রতিশ্রুতি স্থানে দিকে ভ্রমনে তাড়া করলেন। তাঁর ভাই হারুন আ. কে বনি ইসরাইলের মধ্যে রাখলেন যেন সে তাদেরকে নিয়ে মূসা আ. এর পিছনে ধীরে ধীরে ভ্রমণ করে এসে তুর পর্বতের নিকট মূসা আ. এর সাথে যুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই ঘটে গেল যে, বনি ইসরাইলকে সামেরি ফেৎনায় ফেললো বাছুর বানিয়ে এবং বাছুর পূজার দিকে তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে এবং মূসা আ. এর পিছনে সফর বর্জন করার মাধ্যমে।

১৪. অভিযোগকারী ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

হযরত যাকারিয়া আ. আল্লাহকে ছেড়ে গাছের কাছে আশ্রয় চাইলেন। ফলে শাস্তি ভোগ করতে হলো।

তাহসিল :

মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেবের হাজার হাজার বয়ান আছে। সারা আলমের উম্মতে মুসলিমাকে এক ফিকিরে ওঠানোর জন্য বিশ্বব্যাপী সফর করছেন ও বয়ান করছেন। আমাদেরও মাওলানার শত শত বয়ান সরাসরি ও রেকর্ডে শুনার ভাগ্য হয়েছে। কিন্তু আমাদের শূনা কোনো বয়ানে হযরত যাকারিয়া আ. এর এই ঘটনাটি শুনিনি। মুহতারাম মাওলানা যদি কোনো বয়ানে উপরোক্ত ঘটনা বলেও থাকেন তারপরও এরকমভাবে রঙিয়ে বলেননি এবং ভিত্তিহীন কোনো ঘটনা বলেননি। উপরোক্ত ঘটনাটি একাধিক তাফসিরের কিতাবে উল্লেখ আছে। নিচে কয়েকটি কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করছি।

(1) في تفسير القرطبي

قال بن جدهان : فحدثت بهذا الحديث بن المسيب فقال أفما أخبرك كيف كان قتل زكريا قلت لا قال : إن زكريا حيث قتل ابنه انطلق هاربا منهم واتبعوه حتى أتى على شجرة ذات ساق فدعته إليها فانطوت عليه وبقيت من ثوبه هدبة تكفئها الرياح فانطلقوا إلى الشجرة فلم يجدوا أثره بعدها ونظروا بتلك الهدبة فدعوا بالمنشار فقطعوا الشجرة فقطعوه معها

(১) তাফসিরে কুরতুবির মধ্যে আছে,

ইবনে জাদআন বলেন, আমি (ইয়াহইয়া আ. এর হত্যা সম্বলিত) এই হাদিস সাঈদ বিন মুসাইয়িব রহ. এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি জানো যাকারিয়া আ. এর হত্যা কিভাবে হয়েছিল? আমি

বললাম, না। তিনি বললেন, যখন যাকারিয়া আ. এর ছেলেকে হত্যা করা হলো তখন তিনি তাদের থেকে পালিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তারাও তাঁর পিছনে চলতে লাগলেন। এক পর্যায়ে যাকারিয়া আ. কাণ্ডবিশিষ্ট একটি গাছের কাছে আসলেন। গাছটি তাঁকে তার ভিতরে যাওয়ার জন্য আহ্বান করলো। (যাকারিয়া আ. গাছটির ভিতরে প্রবেশ করার পর) গাছটি যাকারিয়া আ. কে ভিতরে নিয়ে ফাকা বন্ধ করে মিলে গেল, কিন্তু যাকারিয়া আ. এর কাপড়ের এক আঁচল বাইরে অবশিষ্ট রয়ে গেল। বাতাসে সে আঁচলটি নড়তে ছিল। এদিকে তারা গাছটির কাছ পর্যন্ত চলে আসলো। কিন্তু তারা এই গাছটির পর থেকে যাকারিয়া আ. এর পদচিহ্ন পায়নি। তারা ওই আঁচলটির দিকে নজর দিলো। করাত আনতে বললো, অতপরঃ তারা গাছটিকে কেটে ফেললো এবং গাছটির সাথে যাকারিয়া আ.কেও কেটে ফেললো।

(2) في الدر المنثور للسوطي

عن ابن المسيب قال إن زكريا حيث قتل ابنه انطلق هارباً منهم واتبعوه حتى أتى على شجرة ذات ساق فدعته إليها فانطوت عليه وبقيت من ثوبه هدبة تلعبها الريح فانطلقوا إلى الشجرة فلم يجدوا أثره عندها فنظروا تلك الهدبة فدعوا المنشار فقطعوا الشجرة فقطعوه فيها

(২) আল্লামা সুয়ূতি রহ. এর কিতাব, দূররে মানসূরের মধ্যে আছে, সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন যাকারিয়া আ. এর ছেলেকে হত্যা করা হলো তখন তিনি তাদের থেকে পলায়ন করে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তারাও তাঁর পিছনে অনুসরণ করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে যাকারিয়া আ. কাণ্ডবিশিষ্ট একটি গাছের কাছে আসলেন। গাছটিও তাঁকে তার ভিতরে যাওয়ার জন্য আহ্বান করলো। গাছটি যাকারিয়া আ. কে ভিতরে ঢুকিয়ে ফাকা বন্ধ করে মিলে গেল, কিন্তু যাকারিয়া আ. এর কাপড়ের এক আঁচল বাইরে অবশিষ্ট রয়ে গেল। বাতাসে সে আঁচলটি নড়তে ছিল। এদিকে তারা গাছটির কাছ পর্যন্ত চলে আসলো। কিন্তু তারা এই গাছটির পর থেকে যাকারিয়া আ. এর পদচিহ্ন পায়নি। অতপর তারা ওই আঁচলটির দিকে নজর দিলো। করাত আনতে বললো, অতপরঃ তারা গাছটিকে কেটে ফেললো এবং গাছটির সাথে যাকারিয়া আ.কেও কেটে ফেললো।

(3) في روح المعاني لمحمود الالوسي

ما نقل السدي عن أشياخه قتل زكريا عليه السلام وروي ذلك عن ابن عباس . وابن مسعود وذلك أنه لما مات صديقة ملكهم تنافسوا على الملك وقتل بعضهم بعضاً ولم يسمعوا من زكريا فقال الله تعالى له : قم في قومك أوح على لسانك فلما فرغ مما أوحى عليه عدواً عليه ليقتلوه فهرب فانفلقت له شجرة فدخل فيها وأدركه الشيطان فأخذ هدبة من ثوبه فأراهم إياها فوضعوا المنشار في وسط الشجرة حتى قطعوه في وسطها

(৩) আল্লামা মাহমূদ আলুসি রহ. এর কিতাব, তাফসিরে রুহুল মা'আনির মধ্যে আছে, আল্লামা সুদ্দি রহ. যাকারিয়া আ. এর হত্যার ঘটনাটি তাঁর উস্তাদবর্গ থেকে নকল করেন এবং ইহা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. থেকেও বর্ণিত আছে। ঘটনাটি হলো, যখন তাদের রাজত্বের সাদিকা মারা গেল তখন তারা রাজত্বের ব্যাপারে খুব বাড়াবাড়ি করলো। তাদের কতক কতককে হত্যা করলো। তারা যাকারিয়া আ. থেকে কিছু শুনে। তখন আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়া আ. কে বললেন, তুমি তোমার কওমের মধ্যে দাঁড়াও, আমি তোমার যবানের উপর অহি নাযিল করবো। আল্লাহ তা'আলা উনার উপর যে অহি নাযিল করলেন তার থেকে তিনি যখন ফারেগ হলেন তখন তারা উনাকে হত্যা করার জন্য উনার উপর ঝাপিয়ে পড়লো। কিন্তু তিনি পলায়ন করলেন। উনার জন্য একটি গাছ ফুটা হয়ে গেল। তিনি সে ফুটায় প্রবেশ করলেন। কিন্তু শয়তান তাঁকে পেয়ে বসলো, তাই তাঁর কাপড়ের আঁচল বাইরে ধরে রাখলো। তারপর শয়তান তাদেরকে সে আঁচল দেখিয়ে দিলো। অতপর তারা গাছের মধ্যে করাত রেখে গাছের মধ্যেই যাকারিয়া আ. কে কেটে ফেললো।

(4) وفي تفسير البحر المحيط للعلامة ابي حيان الأندلسي
 قتل زكرياء عليه السلام قاله السدي عن أشياخه ، وقاله ابن مسعود وابن عباس ، وذلك أنه لما مات
 صديقة ملكهم تنافسوا على الملك وقتل بعضهم بعضاً ولا يسمعون من زكريا . فقال الله له : قم في قومك
 أوح على لسانك ، فلما فرغ مما أوحى الله إليه عدواً عليه ليقتلوه فهرب فانفلقت له شجرة فدخل فيها ،
 وأدركه الشيطان فأخذ هدبة من ثوبه فأراهم إياها فوضعوا المنشار في وسطها حتى قطعوه في وسطها .

(৪) আল্লামা আবু হাইয়ান উন্দুলুসি রহ. এর কিতাব, তাফসিরে বাহরে মুহিতে আছে,
 আল্লামা সুদ্দি রহ. যাকারিয়া আ. এর হত্যার ঘটনাটি তাঁর উস্তাদবর্গ থেকে নকল করেন। এবং ইহা আব্দুল্লাহ
 ইবনে আব্বাস রাদি. ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. থেকেও বর্ণিত আছে। ঘটনাটি হলো, যখন তাদের
 রাজত্বের বান্ধবি মারা গেল তখন তারা রাজত্বের ব্যাপারে খুব বাড়াবাড়ি করলো। তাদের কতক কতককে হত্যা
 করলো। তারা যাকারিয়া আ. থেকে কিছু শুনে। তখন আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়া আ. কে বললেন, তুমি
 তোমার কওমের মধ্যে দাঁড়াও, আমি তোমার যবানের উপর অহি নাযিল করবো। আল্লাহ তা'আল উনার
 উপর যে অহি নাযিল করলেন তার থেকে তিনি যখন ফারোগ হলেন তখন তারা উনাকে হত্যা করার জন্য
 উনার উপর ঝাপিয়ে পড়লো। কিন্তু তিনি পলায়ন করলেন। তার জন্য একটি গাছ ফুটা হয়ে গেল। তিনি সে
 ফুটায় প্রবেশ করলেন। কিন্তু শয়তান তাঁকে পেয়ে বসলো, তাই তাঁর কাপড়ের আঁচল বাইরে ধরে রাখলো।
 তারপর শয়তান তাদেরকে সে আঁচল দেখিয়ে দিলো। অতপর তারা গাছের মধ্যে করাত রেখে গাছের মধ্যেই
 যাকারিয়া আ. কে কেটে ফেললো।

(5) في قصص الانبياء لقطب الدين الراوندي المتوفي في عام 573 عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
 ان زكريا كان خائفاً، فهرب فالتجأ إلى شجره، فانفرجت له وقالت: يا زكريا ادخل في فجاء حتى دخل
 فيها، فطلبوه فلم يجدوه واتاهم ابليس وكان رآه فدلهم عليه فقال لهم: هو في هذه الشجرة فاقطعوها وقد
 كانوا يعبدون تلك الشجرة فقالوا: لا نقطعها، فلم يزل بهم حتى شقوها وشقوا زكريا عليه السلام

(৫) আল্লামা কুতুবুদ্দিন রাওয়ান্দি রহ. এর কিতাব, কেসাসুল আশ্বিয়ার মধ্যে আছে,
 আবু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাকারিয়া আ. ভীত ছিলেন। তিনি পলায়ন করে একটি গাছের
 আশ্রয়ে গেলেন। গাছটি তার জন্য ফুটা হয়ে গেলো এবং বললো, হে যাকারিয়া তুমি ফুটায় প্রবেশ করো।
 ফলে তিনি গাছে প্রবেশ করলেন। এদিকে তারা তাঁকে তালাশ করলো। কিন্তু তারা তাঁকে পায়নি। আর
 ইবলিস যাকারিয়া আ. কে দেখেছিল। সে তাদের কাছে আসলো এবং তাঁকে পাওয়ার রাস্তা তাদেরকে দেখিয়ে
 দিয়ে সে তাদের বললো, যাকারিয়া আ. এই গাছের মধ্যে আছে। সুতরাং সে গাছটিকে কেটে ফেলো। আর
 তারা ওই গাছটির পূজা করত, তাই তারা বললো, আমরা একে কর্তন করবো না। তারা সারাক্ষণ এখানেই
 ছিল, অবশেষে তারা গাছটিকে দ্বিখন্ডিত করলো এবং হযরত যাকারিয়া আ. কেও দ্বিখন্ডিত করে ফেললো।

(6) وفي مستدرك سفيانة البحار للعلامة الشيخ على النمازي الشاهرودي قدس سره المتوفى 1405 ،
 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن زكريا كان خائفاً، فهرب فالتجأ إلى شجرة، فانفرجت له وقالت: يا
 زكريا، ادخل في فجاء حتى دخل فيها. فطلبوه فلم يجدوه. فأتاهم إبليس وكان رآه. فدلهم عليه، فقال لهم:
 هو في هذه الشجرة فاقطعوها. وقد كانوا يعبدون تلك الشجرة، فقالوا: لا نقطعها. فلم يزل بهم حتى
 شقوها وشقوا زكريا

(৬) আল্লামা শাহরুদ্দি রহ. এর কিতাব, মুস্তাদরাকে সাফিনাতিল বিহারে আছে,
 আবু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাকারিয়া আ. ভীত ছিলেন। তিনি পলায়ন করে একটি গাছের
 আশ্রয়ে গেলেন। গাছটি তার জন্য ফুটা হয়ে গেলো এবং বললো, হে যাকারিয়া তুমি ফুটায় প্রবেশ করো।

ফলে তিনি গাছে প্রবেশ করলেন। এদিকে তারা তাঁকে তালাশ করলো। কিন্তু তারা তাঁকে পায়নি। আর ইবলিস যাকারিয়া আ. কে দেখেছিল। সে তাদের কাছে আসলো এবং তাঁকে পাওয়ার রাস্তা তাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে সে তাদের বললো, যাকারিয়া আ. এই গাছের মধ্যে আছে। সুতরাং সে গাছটিকে কেটে ফেলো। আর তারা ওই গাছটির পূজা করত, তাই তারা বললো, আমরা একে কর্তন করবো না। তারা সারাক্ষণ এখানেই ছিল, অবশেষে তারা গাছটিকে দ্বিখন্ডিত করলো এবং হযরত যাকারিয়া আ. কেও দ্বিখন্ডিত করে ফেললো।

(7) روى صاحب الكامل: أن يحيى لما قتل وسمع أبوه بقتله، فر هاربا فدخل بستانا عند بيت المقدس فيه أشجار. فأرسل الملك في طلبه. فدخل في باطن شجرة، وقطعوا الشجرة وشقوها بالمنشار، فمات زكريا فيها

(৭) সাহিবে কামিল বর্ণনা করেন, যখন ইয়াহইয়া আ. কে কতল করা হলো এবং তাঁর বাবা যাকারিয়া আ. তাঁর কতলের কথা শুনলো তখন তিনি ভয়ে পলায়ন করলেন। অতপর বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটের একটি বাগানে প্রবেশ করলেন যে বাগানে প্রচুর গাছ ছিল। এদিকে বাদশা যাকারিয়া আ. কে তলব করার জন্য লোক পাঠালো। যাকারিয়া আ. গাছের ভিতরে প্রবেশ করলেন। আর তারা গাছটিকে কেটে ফেললো এবং করাত দ্বারা তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেললো। তাই যাকারিয়া আ. সেখানেই মারা গেলেন।

(b) وفي تفسير الميزان للسيد الطباطبائي
ولم يذكر في القرآن مآل أمره (عليه السلام) وكيفية ارتحاله، لكن وردت أخبار متكاثرة من طرق العامة والخاصة أن قومه قتلوه، وذلك أن أعداءه قصدوه بالقتل فهرب منهم والتجأ إلى شجرة، فانفجرت له فدخل جوفها ثم التأمت، فدلهم الشيطان عليه وأمرهم أن ينشروا الشجرة بالمنشار، ففعلوا وقطعوه نصفين فقتل (عليه السلام) عند ذلك

(৮) আল্লামা সাইয়েদ ত্ববাত্ববায়ি রহ. এর কিতাব, তাফসিরুল মিয়ানে আছে,
হযরত যাকারিয়া আ. এর শেষ গম্ভ্য ও ভ্রমনের অবস্থা কুরআন শরিফে উল্লেখ নেই। কিন্তু আম ও খাছ বহু সনদে অনেক রেওয়াত রয়েছে যে, তাঁর কওম তাঁকে হত্যা করেছে। আর এই ঘটনাটি হলো এরকম যে, হযরত যাকারিয়া আ. এর শত্রুরা তাঁকে হত্যা করার ইরাদা করলো। তখন তিনি তাদের থেকে পলায়ন করে একটি গাছের আশ্রয়ে গেলেন। তখন গাছটি তাঁর জন্য ফুটা হয়ে গেল। তখন তিনি গাছের পেটের ভিতরে প্রবেশ করলেন। অতপর গাছটি জোড়া লেগে গেল। কিন্তু শয়তান তাদেরকে তাঁর অবস্থান দেখিয়ে দিলো এবং করাত দিয়ে গাছটিকে চিড়ে ফেলার জন্য সে তাদেরকে আদেশ করলো। অতপর তারা তাই করলো। হযরত যাকারিয়া আ. কে দুভাগে কেটে ফেললো। তখন হযরত যাকারিয়া আ. কতল হয়ে গেলেন।

বিঃদ্রঃ (১)

‘প্রচলিত ভুলের সংকলন’ নামক গ্রন্থে যাকারিয়া আ. এর উপরোক্ত ঘটনাটিকে বিশ্বাস করা না যায়েজ বলে আখ্যায়িত করেছেন অর্থাৎ এটা বানায়েট ও জাল ঘটনা। রেফারেন্স হিসাবে মাসিক আল কাওসার ও তাফসিরে ইবনে কাসিরের নাম উল্লেখ করেছেন।

প্রিয় পাঠক, আল্লামা ইবনে কাসির রহ. জন্ম-৭০০ হি. মৃত-৭৭৪, তিনি যদি তার তাফসিরে ঘটনাটিকে জাল বলে থাকেন কিন্তু তাঁরও আগের মুফাসসির আল্লামা কুরতুবি রহ. জন্ম-৬০০ হি. মৃত-৬৭১, তিনি তার তাফসিরে ঘটনাটিকে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি রহ. জন্ম-৮৪৯ হি. মৃত-৯১১ হি. তিনিও তার তাফসির দূররে মানসূর কিতাবে ঘটনাটিকে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও আরও অনেক মুফাসসির হযরতগণ উক্ত ঘটনাটিকে তাদের তাফসিরের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এক মুফাসসির ইবনে কাসির রহ. উক্ত ঘটনাটিকে মিথ্যা বললেও অন্যান্য মুফাসসিরদের কিতাবসমূহে উক্ত ঘটনাটি থাকার কারণে মুহতারাম

মাওলানা ভিত্তিহীন কোনো কথা বলেছেন এরকম মন্তব্য আমরা করতে পারি না। বরং তিনি তাফসিরকারকদের তাফসির নকল করেছেন মাত্র। একজনের তাহকিকে মিথ্যা হলে আরেক জনের তাহকিকে সত্যও হতে পারে। দ্বিতীয়ত তাফসিরে ইবনে কাসিরে উপরোক্ত ঘটনাটিকে জাল বলেছেন তাও আমরা পাইনি। আল্লামা ইবেন কাসির রহ. হুয়াইফা রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতটিকে জাল ও মাওযু বলেছেন। আর এই লম্বা রেওয়ায়াতটির মধ্যে ছোট্ট একটি বাক্য এরকম যে-“ যাকারিয়া আ. এর রক্তের সাথে আরও সত্তর হাজার মানুষকে কতল করে”। অতএব এই রেওয়ায়াতটি জাল হলেও অন্যান্য রেওয়ায়াতে বনি ইসরাইলের হাজার হাজার পয়গম্বরকে যে হত্যা করা হয়েছিল তা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত।

ইয়াহইয়া আ. কেও হত্যা করা হয়। ওনার পিতা যাকারিয়া আ. কেও অনেকের মতে হত্যা করা হয় এবং অনেকে গাছের সাথে করাত দিয়ে যাকারিয়া আ. কে হত্যা করার উপরোক্ত ঘটনাটিও উল্লেখ করে থাকেন। হুয়াইফা রাদি. এই রেওয়ায়াতে যাকারিয়া আ. হত্যার এই ঘটনাটি উল্লেখ নেই। সুতরাং ইবনে কাসির রহ.ও উক্ত ঘটনাটিকে জাল বলেননি। তিনি উল্লেখ করেছেন, এই আয়াতগুলোর তাফসিরে অনেকগুলি ইসরাইলি রেওয়ায়াত রয়েছে। যেগুলোর কোনো কোনো বর্ণনা মাওযু ও জাল এবং কোনো কোনো বর্ণনা সহিহ। সুতরাং এর থেকে যাকারিয়া আ. এর উপরোক্ত ঘটনাটিকে সুনির্দিষ্টভাবে জাল বলা যায় না।

বিঃদ্রঃ (২)

একজন নবীর মুযিজা হিসাবে গাছের কাছে সাহায্য চাওয়া বা গাছ তার আশ্রয়ে নবীকে নিয়ে নেওয়া এই মর্মের ঘটনা বলার দ্বারা ইসমতে আশ্বিয়ার খেলাফ কিছু হয় না। গাছের দ্বারস্থ হওয়া আমাদের কাছে দোষনীয় না হলেও একজন নবীর পক্ষে আল্লাহর কাছে প্রশংসনীয় নাও হতে পারে।

حسنات الأبرار سيئات المقربين

(অর্থঃ সাধারণ নেককারদের অনেক নেক কাজই নৈকট্যপ্রাপ্তদের বেলায় মন্দ কাজ।)

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

কিন্তু সা’আদ সাহেব কোনো গাছের কাছে আশ্রয় না নিয়ে যমুনা পাড়ের মাস্তানদের আশ্রয় নেওয়ায় সব পুরানা বুয়ুর্গদেরকে নেযামুদ্দিন থেকে বের করতে সক্ষম হয়েছে।

মন্তব্যের জবাব :

এখানে অভিযোগকারী ভুল করে চরম কয়েকটা ভুল মন্তব্য করলেন। এক নম্বর, গভীর ফাহাম ও বুঝের সাথে চলা তাবলিগী সাথী ভাইদেরকে মাস্তান বললেন। দুই নম্বর, ইন্ডিয়া বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের অধিকাংশ তাবলিগী সাথী ও সাল লাগানো বহুত আলেম-ওলামা, যারা তাবলিগ করাকে যিন্দগির মাকসাদ বানিয়ে মেহনত করছেন, ওনারা শুধু যমুনার পাড়ে নয়, বরং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। তিন নম্বর, মুহতারাম মাওলানা সা’আদ সাহেব সাথীদের কাছে আশ্রয় চাননি বরং সাথীরা ও দাওয়াতের কাজ নিয়ে চলা বিশ্বের মুসলমানরা একজন যোগ্য আমির পেয়েছেন। যে আমির পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে চারও মাযহাবের অনুসারী সহ গোটা উম্মতে মুসলিমাকে নিয়ে দাওয়াতের ময়দানে মেহনত ও ফিকির করে যাচ্ছেন, যে ফিকিরের সূচনা হযরতজি মাওলান ইলিয়াস সাহেব রহ. করেছিলেন।

হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলতেন,

‘আমি চাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর উম্মত যে ছাতার উপর ছিল, দ্বিতীয় বার মেহনত করে উম্মতকে সেই ছাতায় নিয়ে যাওয়া।’

পাঁচ নম্বর, পুরানা বুযুর্গদেরকে নেযামুদ্দিন থেকে কেউ বের করে দেয়নি। বরং বুযুর্গরা নিজেরাই বিশ্রাম নিচ্ছেন, ওনাদের থেকে না হওয়ার একিন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এটাই আল্লাহর নিয়াম।

১৫. অভিযোগকারী ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা’আ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

আমাদের কাজের সাথে লেগে থাকা সাথীরা কেবল মাওলানা ইলিয়াস এবং মাওলানা ইউসুফ সাহেবের মালফুজাতই পড়বে। এগুলো ছাড়া অন্য কিতাবাদি পড়বে না।

তাকসিল :

ব্যক্তিগত অধ্যয়নের জন্য এবং এই কাজের হাকিকত নিজের কাছে আরও স্পষ্ট হওয়ার জন্য মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর মালফুজাত, দ্বিনী দাওয়াত ও মাওলানা ইউসুফ রহ. এর ‘বায়ানাৎ’, ‘আহাম খত’ পড়ার জন্য তাবলিগী সাথীদের মুহতারাম মাওলানা বলে থাকতেই পারেন। উনার বলাটা যুক্তি সংগতও। তাছাড়া উনাদের মালফুজাতের কিতাবাদির মধ্যে তো কোনো গুমরাহি নেই, যার কারনে কোনো আপত্তি করা যেতে পারে। সাধারণ মানুষের জেহেন-বিক্ষিপ্ততা থেকে বাঁচানোর জন্য ও হক-না হক ফরক করার গভীর যোগ্যতা না থাকায় তাদেরকে যেকোনো লেখকের যেকোনো বই না পড়ার জন্য বলে থাকতেও পারেন। এতে মাওলানার উপর কোনো ইলযাম আরোপিত হতে পারে না। বরং এতে মুহতারাম মাওলানার দূরদর্শিতা এবং তাবলিগী সাথীদের উপযুক্ত তরবিয়তের ব্যাপারে উনার বিচক্ষণতার প্রমাণ মেলে এবং আসলাফদের অনুসরণের প্রমাণও মেলে। অবশ্য তিনি কুরআন তরজমা, বিশেষ করে শাইখুল হিন্দ রহ. এর তরজমা ও তাকসির পড়ার জন্য জোর তাকিদ দিয়ে থাকেন। হায়াতুস সাহাবাহ পড়ে সাহাবিদের যিন্দগিটা আত্মস্থ করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। উলামাদের সোহবতে গিয়ে ইলম শিখতে বলেন। উনাদের মহব্বত ও ইকরাম করতে প্রতিনিয়ত বলে যাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ ও উলামাদের মাঝখানের প্রতিবন্ধতা দূর করার পরামর্শ সাথীদের দিয়ে থাকেন। তিনি সাথীদের থেকে জাহালাতের অন্ধকারকে দূর করে ইলমের নূর আনার জন্য উপকারী সব ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ইসলাহ ও তরবিয়তের জন্য উনি যোগ্য উত্তসুরি। আল্লাহ, মুহতারাম মাওলানার নেক ছায়াকে আমাদের উপর আরও দীর্ঘায়িত করে দিন।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

এভাবে সা’আদ সাহেব অনেক দিন থেকে ফাযায়েলে আমাল ও ফাযায়েলে সাদাকাতকে তাবলিগ থেকে বাদ দেওয়ার অপচেষ্টা করছেন।

মন্তব্যের জবাব :

অভিযোগকারীর কাছে হয়তো ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে বলে তিনি ভুল মন্তব্য করতে পারলেন। নতুবা তাবলিগের কোনো সাথী এ কথা অস্বিকার করতে পারবে না যে, মুহতারাম মাওলানা ফাযায়েলে আমাল, ফাযায়েলে সাদাকাত ও মুত্তাখাব হাদিস নামক কিতাবাদির নিয়মিত তালিমের জন্য কত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আল্লাহর রাস্তায় বের হলে ইজতেমায়ী হালকায় দৈনিক ৪/৫ ঘন্টা এই কিতাবগুলোর তালিম করার জন্য তো অনেক জোর দিয়ে থাকেন। মাকামি মেহনতের সময় প্রতিদিন মসজিদে তালিমের হালকায়, বাসায়,

মাস্তুরাতের সাপ্তাহিক তালিমের হালকায় এ কিতাবগুলোর তালিম করার পিছনে মুহতারাম মাওলানার প্রতিটি হেদায়াতি বয়ানের একটা বিশাল অংশ জুড়ে এই তালিমের কথাই বলে থাকেন। এ মন্তব্য যে একটা ভুল তথ্যের উপর দেওয়া হয়েছে তা সকল তাবলিগী সাথীর কাছে স্পষ্ট। অভিযোগকারী ফাযায়েলে সাদাকাতে দ্বিতীয় খন্ডের ১৩৫, ১৮৩ পৃষ্ঠা, ফাযায়েলে তাবলিগের ৩৮, ৫১ পৃষ্ঠা, ফাযায়েলে কুরআনের ২৮০, ২৮১, ২৮২ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে নিজেই না আবার এসব কিতাব তালিম থেকে উঠিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেন।

অবশ্য এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, এই তাবলিগ ও তাবলিগী কার্যক্রম শুধু ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মানুষের জন্যে তো নয়। শুধু হানাফি মাযহাবের লোকদের জন্যেও নয়। বরং সারা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের জন্য। সুতরাং ভবিষ্যতে যদি এই মুসলমান জামাতের জন্য, জামাতের আমির শুরাদের সাথে পরামর্শ করে বা শরিয়ত মোতাবিক একক সিদ্ধান্তে কুরআন-হাদিসের অন্য কোনো কিতাব সংযোজন করেন কিংবা ফাযায়েলে আমাল ইত্যাদি কোনো কিতাবের বিশ্বের কিছু কিছু মানুষের প্রশ্নবিদ্ধ স্থানগুলো পরামর্শভিত্তিক পরিবর্তন করেন তাহলে তা হবে এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। আমির শুরাদের সাথে পরামর্শ করে বা না করে কুরআন-হাদিস ভিত্তিক যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আমীর এক্ষেত্রে স্বাধীন। মামুরদের কাজ হলো মেনে নেওয়া। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মানার যোগ্যতা দান করুন।

১৬. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

মু'জিয়ার সম্পর্ক কেবল দাওয়াতের সাথে। নবুওয়াতের সাথে এর সম্পর্ক নেই।

তাফসিল :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَغْنَصِرْكُمْ وَيُغْنِبْكُمْ أَفْئِدَةً

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, তেমরা যদি আল্লাহকে (আল্লাহর দীন ও আল্লাহর নবীকে) সাহায্য করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা কে অটল করে দিবেন।

(সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত নং-৭)

وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ

আর অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন যে ব্যক্তি তাঁকে অর্থাৎ তাঁর দীন ও নবীকে সাহায্য করে।

(সূরা হজ্জ, ৪০ নং আয়াতের কিছু অংশ)

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

অবশ্যই আমি সাহায্য করবো আমার রসূলগণকে এবং ঈমানদারগণকে দুনিয়ার জীবনে এবং সেদিনেও যেদিন সাক্ষ্যগণ (ফেরেস্তারা) উপস্থিত হবে।

(সূরা গাফির, আয়াত নং-৫১)

নবীর যামানায় যারা আল্লাহর দীনকে সাহায্য করেছেন, অর্থাৎ দীন যিন্দা হওয়ার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন ও জিহাদ করেছেন, ফিকির ও মেহনত করেছেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 'নুসরত' (সাহায্য) করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা এই 'নুসরত'কে নবীদের সাথে খাছ করেননি। বরং যারাই যে যামানায় আল্লাহর দ্বীনের 'নুসরত' করবেন, দ্বীনের তারাক্কির জন্য দাওয়াত মেহনত ও জিহাদ করবেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেভাবে অতীতে করেছেন সেভাবে বর্তমানেও করবেন, কিয়ামত পর্যন্ত করবেন এবং আখিরাতেও করবেন। এই হলো কুরআন পাকের ঘোষণা। দুনিয়াতে অনেক সময় আসবাবের খেলাফ, অস্বাভাবিক 'নুসরত', অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত অলৌকিক সাহায্য করে থাকেন। এরকম 'নুসরত' নবী, সাহাবা, তাবয়ী, তাব' তাবয়ী ও তাদের পরবর্তী আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দাদের বেলায় করেছেন। সুতরাং কুরআন শরিফের আয়াত, নবীর হাদিস ও সাহাবাদের আছার ও ঘটনার দ্বারা আমরা যদ্বুর বুঝতে পারি যে, আল্লাহ পাকের এই 'নুসরত' নবীর সাথে খাছ নয়, বরং দ্বীনের দাওয়াত মেহনত ও দ্বীনকে উচু করার জন্য ফিকির ও জিহাদ ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত।

সুতরাং মুহতারাম মাওলানা যদি এই স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত অলৌকিক 'নুসরত'কে কোনো বয়ানে 'মু'যিজা' নামে উল্লেখ করে থাকেন তাহলে আমরা বলবো তিনি হয়তো সীরত ও সুন্নতের আলোকে কথা বলেছেন। কেননা, নবী ও সাহাবাদের যামানায়, তাবয়ী ও তাব' তাবয়ীর যামানায় 'নুসরত', 'মু'যিজা' ও 'কারামাত' সবই এক, অর্থাৎ সবগুলোই আল্লাহর গায়েবি মদদ। এই জন্যে মুতাকাদ্দিমীন অর্থাৎ পূর্ববর্তী উলামাগণ এসবের মধ্যে কোনো ফরক করতেন না। أمر خارق للعادة অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত হিসাবে সবই এক এবং সবই আল্লাহর গায়েবি নুসরত। কিন্তু মুতাআখখিরীন অর্থাৎ পরবর্তী উলামাগণ এসবের মধ্যে পার্থক্য করেন। যে গায়েবি মদদ নবীদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল সেটার নাম দিয়েছেন 'মুযিজা'। আর যে গায়েবি মদদ আল্লাহর অলিগণ অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল তার নাম দিয়েছেন 'কারামাত'। কিন্তু এ সবই আল্লাহর পাকের 'নুসরত' (সাহায্য)। তিনি কখনো আসবাব দিয়ে সাহায্য করেন, আবার কখনো আসবাব ছাড়া সাহায্য করেন।

في شرح العقيدة الطحاوية لعبد العزيز الراجحي

والمعجزة والكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين تعم كل خارق للعادة لا فرق بين المعجزة والكرامة عندهم فالإمام أحمد -رحمه الله- وغيره يسمونها الآيات أما المعجزة والكرامة في عرف العلماء المتأخرين فيفرون في اللفظ بينهما فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعها الأمر الخارق فالكرامة عند المتأخرين من العلماء هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوة النبي يظهر على يدي صالح ملتزم بمتابعة النبي. فالمعجزة التي يظهرها الله على يدي مدعي النبوة من خوارق العادات، ومنهم ما يتحدى به أمته كالقرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم

অর্থঃ আল্লামা আব্দুল আযিয রাজিহি রহ শরহে আল-আকিদাতুত ত্বাহবিয়্যাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, মুযিজা ও কারামাত মুতাকাদ্দিমীন আহলে ইলম ইমামগণের মতে স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত সকল ঘটনাকেই শামেল করে থাকে। তাদের নিকট মুযিজা ও কারামাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইমাম আহমদ ইবনে আম্বল রহ. ও অন্যান্য ইমামগণ তারা মুযিজাকে 'আয়াত' (নিদর্শন) নামে আখ্যায়িত করতেন। তবে মুতাআখখিরীন অর্থাৎ পরবর্তী উলামাগণ তাদের পরিভাষায় শব্দগতভাবে মুযিজা ও কারামাত দুটোর মধ্যে পার্থক্য করেন। মুযিজাকে নবীর জন্য এবং কারামাতকে অলির জন্য সাব্যস্ত করেন। আর দুটোই নিয়মের বাইরে অলৌকিক বিষয় হিসাবে এক। সুতরাং পরবর্তী উলামা হযরতগণের মতে কারামাত হলো স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত এমন এক বিষয় যা জাহির হয় নবীর অনুসরণকে আকড়ে ধরা নেককার বান্দার হাতে এবং সে ক্ষেত্রে নবী হওয়ার দাবি সম্পৃক্ত থাকে না। মুযিজা হলো আল্লাহ তা'আলা স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করে যে বিষয় নবুওয়তের দাবিদারের হাতে প্রকাশ করে থাকেন এবং অনেক নবী এর দ্বারা উম্মতের সাথে চলেঞ্চও করেছেন। যেমন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কুরআন।

في تعليق أولياء الرحمن و أولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية

الكرامة مثل ما ذكرت لك ما يُجري الله من خوارق العادات على يدي ولي، أما على يدي نبي الآية والبرهان ما يؤتاه النبي مما يعجز عنه الإنس والجن، فالأشاعة عندهم المعجزة والكرامة متساوية في جنسها وقدرها؛ في الجنس والقدر متساوية؛ النار هي النار المعجزة التي تحصل للنبي - صلى الله عليه وسلم - تحصل للولي بنفسها لكن الفرق بينهما أنها تكون في النبي مقرونة بدعوى النبوة وبالتحدي في بعضها ليس في جميعها، وأما الكرامة فليست مقترنة بذلك

অর্থঃ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. গ্রন্থ ‘আউলিয়ার রাহমান ওয়া আউলিয়াশ শায়তান’ গ্রন্থের তা’লিকে উল্লেখ আছে, কারামাত আমি যা উল্লেখ করেছি তার মত, যা কোনো অলির হাতে আল্লাহ তা’আলা স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করে প্রকাশ করেন। অতপর নবীর হাতে যা প্রকাশ করেন এটা আয়াত ও বুরহান, মানুষ ও জিন অক্ষম করা বিষয়, যা নবীকে দেওয়া হয়।

আশায়িরা উলামাগণের মতে মুযিজা ও কারামাত ‘জিনস’ ও ‘কদর’ অর্থাৎ জাতীগতভাবে এবং মানগতভাবে দুটোই সমান সমান। জাতীগতভাবে ও মানগতভাবে সমান সমান। এই আশুণ তো সেই আশুণই, (অর্থাৎ ইব্রাহিম আ. এর আশুণ)। যে মুযিজা নবীর হাসিল হয় সেটা সত্তাগতভাবে অলিরও হাসিল হয়। কিন্তু দুটোর মধ্যে পার্থক্য এই যে, মুযিজা নবীর মধ্যে হয় নবুওয়তের দাবি সম্পৃক্ত হয়ে এবং কোনো কোনোটার মধ্যে চেলেক্স সহ, সবগুলোর মধ্যে নয়। আর কারামাত ওইগুলোর সাথে সম্পৃক্ত নয়।

في اصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة بقلم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز
الفرق بين المعجزة والكرامة : أن المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة . بخلاف الكرامة فإن صاحبها لا يدعي النبوة وإنما حصلت له الكرامة باتباع النبي والاستقامة على شرعه . فالمعجزة للنبي والكرامة للولي . وجماعهما الأمر الخارق للعادة .
وذهب بعض الأئمة من العلماء : إلى أن كرامات الأولياء في الحقيقة تدخل في معجزات الأنبياء لأن الكرامات إنما حصلت للولي باتباع الرسول ، فكل كرامة لولي هي من معجزات رسوله الذي يعبد الله بشرعه .

ومن هذا يتبين أن إطلاق المعجزة على خوارق الأنبياء والكرامة على خوارق الأولياء معنيين اصطلاحيان ليسا موجودين في الكتاب والسنة وإنما اصطلح عليهما العلماء فيما بعد وإن كانا في مدلولهما يرجعان إلى ما تقرر في النصوص من الحق

অর্থঃ শায়েখ সালেহ বিন আব্দুল আযিয রহ. এর লেখা উসূল ঈমানে আছে, মুযিজা ও কারামাতের মধ্যে পার্থক্য হলো, মুযিজা নবুওয়তের দাবির সাথে সম্পৃক্ত হয়। কিন্তু কারামাত এর ব্যতিক্রম। কেননা, কারামাতওয়ালা নবুওয়তের দাবি করেন না এবং নবীর অনুসরণের কারণে এবং নবীর দ্বীনে অটল থাকার কারণে তার কারামাত হাছিল হয়েছে। সুতরাং মুযিজা নবীর জন্য এবং কারামাত অলির জন্য। আর দুটোই স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত বিষয়ে এক। অনেক ইমামগণ এই দিকে গেছেন যে, অলিদের কারামাত বাস্তবে নবীদের মুযিজার মধ্যে প্রবেশ হয়ে যায়। কেননা, কারামাতগুলো অলির হাছিল হয়েছে নবীর অনুসরণ করার কারণে। সুতরাং অলির প্রতিটি কারামাত তার রসূলের মুযিজার অন্তর্ভুক্ত, যে রসূলের শরিয়ত দ্বারা সে আল্লাহর ইবাদত করছে।

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, নবীদের নিয়ম ভঙ্গ করা নুসরতে মুযিজার প্রয়োগ এবং অলিদের নিয়ম ভঙ্গ করা নুসরতে কারামতের প্রয়োগ দুটি পরিভাষাগত অর্থ যে পরিভাষা কিতাব ও সুন্নাতে নেই। পরবর্তীতে এদুটি পরিভাষা উলামাগণ করেছেন। যদিও দুটির মূল বিষয় ও মাদলুল নস দ্বারা প্রমাণিত এবং হক।

তাছাড়া পরবর্তী ওলামায়ে কেলাম মুজিয়া ও কারামাতের মধ্যে যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন মুহতারাম মাওলানার বয়ানে আমরা সে পার্থক্যের বিতিক্রম দেখতে পাই না। যেমন, ইমাম রাযি রহ. ও ইমাম কুরতুবি রহ. পার্থক্য বয়ান করতে গিয়ে বলেন, নবী মুযিজাকে প্রকাশ করবে বরং এর দ্বারা চেলেক্ষ করবে। কিন্তু অলি তাঁর কারামতকে গোপন রাখবে। মুহতারাম মাওলানা ব্যক্তিগত অলৌলিক নুসরতকে গোপন রাখতেই বলেন, চেলেক্ষ করার কথা তো কখনোই বলেন না। সুতরাং ওনি যদি গায়বি নুসরতকে কোনো বয়ানে মুযিজা নামে বলেও থাকেন তাহলে তিনি শব্দগত ও আভিধানিকভাবে বলেছেন। অর্থাৎ এমন এক নুসরত যা কোনো মাখলুক করতে পারে না। আসবাববিহীন নুসরত। মুযিজা অর্থাৎ অক্ষমকারী নুসরত। সুতরাং এইটা ভুল ধরার মত কোনো কিছু নই।

তাছাড়া আমাদের কাছে এরকম কাগজও পৌছেছে যেখানে উল্লেখ আছে, মুহতারাম মাওলানাকে পরিভাষাগত পার্থক্য রক্ষার কথা বলা হলে মুহতারাম মাওলানা মেনেও নেন।

সুতরাং এখন এই নিয়ে বলাবলি করা নিছক ফেৎনা ছড়ানো ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ফিৎনায় পড়া থেকে হেফাজত করুন।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

সা'আদ সাহেব ইসলামে দ্রাস্ত আকিদার এক নতুন সংযোজন করলেন। উম্মতের এই প্রথম ব্যক্তি যিনি মু'জিয়াকে অস্বিকার করলেন।

মন্তব্যের জবাব :

সিলেটে 'সিম' তরকারিকে 'উরি' বলে। জিনিস যদি একটাই হয়, নামের ভিন্নতায় স্বাদ ভিন্ন হয় না। সিমের যে স্বাদ উরির একই স্বাদ। পরবর্তী উলামা হযরতগণের পরিভাষার উপর ভিত্তি করে পূর্ববর্তী উলামা হযরতগণকে দ্রাস্ত বলা নিজের দ্রাস্তি প্রকাশ করার নামান্তর। দ্বিতীয়ত, মুহতারাম মাওলানা এখানে মুযিজাকে অস্বিকার করেননি। সর্বোচ্চ এই কথাই বলা যেতে পারে, পূর্ববর্তী উলামা হযরতগণের মত তিনিও মুযিজাকে নবীর সাথে খাছ না করে অলিদের কারামাত অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় মানুষ ও দায়িদের গায়বি নুসরতকেও মুযিজা নামে উল্লেখ করেছেন। অথবা এভাবে বলা যেতে পারে, মুযিজাকে নবুওয়তের সাথে খাছ না করে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের সাথে মানুষকে অক্ষম করা আল্লাহর গায়বি মদদকে মুযিজা নামেই ব্যক্ত করেছেন।

১৭. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

হযরত মূসা আ. থেকে বড় এক ভুল হয়ে গেছে এবং তিনি এক অপরাধ করে ফেলেছেন জামাআত এবং কওমকে ছেড়ে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য 'নির্জনতা' অবলম্বন করেছেন।

তাহসিল :

অভিযোগকারী যেভাবে মুহতারাম মাওলানার কথাগুলো রঙিয়ে লিখেছেন সে কথাগুলোর সারাংশ হলো, মূসা আ. কওমকে ছেড়ে আল্লাহর মুনাযাতের জন্য দ্রুত চলে যাওয়াটা ছিল ভুল ও ইজতেহাদি খতা। মাওলানার এই তাফসির পূর্বসূরী মুফাসসির হযরতদের কিতাব থেকে নকল করা তাফসির। দাওয়াতি কাজের তারতিব বুঝাতে গিয়ে হয়তো অনেক সুন্দর করেই বলেছেন। বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য বহুত কিতাবে উক্ত কথাগুলো থাকার কারণে মুহতারাম মাওলানা সাহেব ভুল করেছেন আমরা বলতে পারি না। তারপরও কিছু ভুল বুঝাবুঝি তৈরি হয়েছে এবং মাওলানার কথা থেকে কিছু মানুষের ‘গলত ফাহাম’ (ভুল বুঝা) হয়েছে। ওলামায়ে কেরামের এক জামাত রুজু করার দাবি জানিয়েছেন। তিনি রুজুও করেছেন এবং বলেছেন, হযরত মূসা আ. কে ছোট করার জন্য কিছু বলিনি। তারপরও যদি এরকম কিছু বুঝা যায় তাহলে তার থেকে রুজু করেছি। আপনারাও এরকম করে উক্ত ঘটনাটি বয়ান করবেন না। পূর্বসূরি বড়দের মত তিনি রুজু হওয়ার পর আর কিছু বলার থাকে না এবং এই বিষয় বিশৃংখলা বৈধ হতে পারে না।

মাওলানার হৃদয়বিদারক এই ঘটনাটি আমাদেরকে স্বরণ করিয়ে দেয় হুদাইবিয়ার সন্ধির কথা। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য রসূল হওয়া সত্ত্বেও সন্ধিপত্র থেকে রসূল শব্দটি কেটে দেওয়ার দাবি উঠে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই দাবি মেনেও নেয়। এখন আমরা মাওলানা সা’আদ সাহেব যে তাফসির করেছেন তার সমস্ত উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব নয়, কিছু উদ্ধৃতি আপনাদের খেদমতে পেশ করছি।

في تفسير مفاتيح الغيب للعلامة فخر الدين الرازي

على الآية سؤالات: السؤال الأول: قوله: { وَمَا أَغْجَلَكْ } استفهام وهو على الله محال الجواب أنه إنكار في صيغة الاستفهام ولا امتناع فيه... السؤال الثاني: أن موسى عليه السلام لا يخلو إما أن يقال إنه كان ممنوعاً عن ذلك التقدم أو لم يكن ممنوعاً عنه ، فإن كان ممنوعاً كان ذلك التقدم معصية فيلزم وقوع المعصية من الأنبياء ، وإن قلنا إنه ما كان ممنوعاً كان ذلك الإنكار غير جائز من الله تعالى . والجواب : لعله عليه السلام ما وجد نصاً في ذلك إلا أنه باجتهاده تقدم فأخطأ في ذلك الاجتهاد فاستوجب العتاب :

(১) অর্থঃ ঐতিহাসিক তাফসির গ্রন্থ, ‘মাফাতিহুল গাইব’ এর মধ্যে আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযি রহ. লিখেছেন, আয়াতটির উপর অনেকগুলো প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্ন, (অর্থঃ হে মূসা, কিসে তোমাকে ত্বরা করলো?) এটা একটা প্রশ্ন। আর এরকম প্রশ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়াটা অসম্ভব। (কেননা, তিনি সব জানেন, আর প্রশ্ন সাধারণত জানার জন্যই করা হয়ে থাকে) উত্তর, এখানে প্রশ্নের সূরতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। (অর্থাৎ জানার জন্য প্রশ্ন করা উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়ের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা উদ্দেশ্য) আর এরকম অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের প্রশ্ন আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে হতে বাধা নিষেধ নেই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, এরকম কওমের আগে অগ্রসর হওয়া ও ত্বরা করার ব্যাপারে হয়তো মূসা আ. নিষেধপ্রাপ্ত ছিলেন কিংবা নিষেধপ্রাপ্ত ছিলেন না। যদি তিনি অগ্রসর হওয়া ও ত্বরা করার ব্যাপারে নিষেধপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর এই অগ্রসর হওয়া ও ত্বরা করাটা ছিল গুনাহ। তখন নবীদের থেকে গুনাহ সংঘটিত হওয়ার ইলযাম এসে যায়। আর যদি আমরা বলি যে, মূসা আ. ত্বরা করার ব্যাপারে তিনি নিষেধপ্রাপ্ত ছিলেন না। তাহলে ত্বরা করার কারণে আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে প্রশ্ন করাটাও অসম্ভব।

উত্তর, হয়তো মূসা আ. এক্ষেত্রে তিনি কি করবেন কোনো নস বা দলিল পাননি। তাই তিনি ইজতিহাদ করে দ্রুত অগ্রসর হলেন ও ত্বরা করলেন। আর এই ইজতিহাদে তিনি ভুল করে ফেললেন, তাই তিনি ভর্ৎসনার সম্মুখীন হলেন।

কওমের সর্বশেষ ব্যক্তি হওয়ার জন্য। কিন্তু মূসা আ. এবিষয়টি বেখেয়ালে ত্যাগ করলেন প্রতিশ্রুত সময়ে দ্রুত পৌঁছার জন্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি দ্রুত লাভ করার জন্য। আর খুশির প্রতিশ্রুতি বিষয়ের প্রতি মানুষের অবস্থা এরকমই হয়ে থাকে। তখন কামনা করে যদি পাখির ডানায় সে আরহন করতে পারতো। নবী মূসা আ. এর জন্য আল্লাহর ওয়াদার চাইতে বেশি আনন্দদায়ক কিছুই নাই।...

আরও কতক ওলামায়ে কেরাম বলেন, অন্তরে যা উদয় হয় আয়াতটির অর্থ হবে এরকম, কোন্ জিনিস তোমাকে তাড়া দিলো তোমার কওম থেকে এককি হয়ে আসতে? সন্তোষভাবে এখানে অস্বীকৃতিটা তাদের থেকে এককি হওয়ার কারণে। আর ত্বরা ও তাড়াহুড়ার অস্বীকৃতি মূলত সেটা মাধ্যম হওয়ার কারণে। তাই মূসা আ. উয়র পেশ করলেন যে, আমি ইজতিহাদ করতে ভুল করে ফেলেছি। আমি মনে করেছি সামান্য পরিমাণ অগ্রসর হওয়াটা সঙ্গে থাকার ব্যাপারে কোনো ত্রুটি হবে না এবং এটাকে এককি ধরা হবে না। সঙ্গে রাখার ব্যাপারে কোনো দোষারোপ হবে না। আর সামান্য অগ্রসর হওয়ারও কারণ হলো, আপনার আদেশ দ্রুত পালন করে আপনার সন্তুষ্টির স্থায়িত্ব তলব করা।...

في تفسير البيضاوي

وما أعجلك عن قومك يا موسى سؤال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها من حيث إنها نقيصة في نفسها انضم إليها إغفال القوم وإيهام التعظم عليهم فلذلك أجاب موسى عن الأمرين وقدم جواب الإنكار لأنه أهم قال موسى هم أولاء على أثري أي ماتقدمتهم إلا تخطى يسيرة لا يعتد بها عادة وليس بيني وبينهم إلا مسافة قريبة يتقدم بها الرفقة بعضهم بعضا وعجلت إليك رب لترضى فإن المسارعة إلى إمتثال أمرك والوفاء بعهدك توجب مرضاتك

(৩) মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ের সর্বোচ্চ তাফসিরের কিতাব তাফসিরে বাইযাবিতে আছে,

আর তোমাকে তোমার কওম থেকে কিসে ত্বরা করালো? এইটা ত্বরা করার কারণ সম্পর্কের একটা সুওয়াল। এই প্রশ্নটির ভিতরে ত্বরাকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের বিষয়টিও রয়েছে। কেননা, ত্বরা করা সন্তোষভাবে একটা দোষ বা খুঁত। তারপর আবার এই ত্বরার সাথে এসে যুক্ত হলো কওমকে অবহেলায় রেখে আসা এবং তাদের উপর অহংকার করার অহম (খেয়াল) হওয়া। এই জন্যে মূসা আ. দুইটি বিষয়েরই জবাব দিলেন। অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জবাবটি আগে দিলেন। কেননা, এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মূসা আ. বললেন, ওরা তো আমার পশ্চাতে আছে। স্বাভাবিকভাবে যা ধরা হয় না এরকম তাদের সামান্য আগে আমি এসেছি। আমার মাঝে এবং তাদের মাঝে কাছাকাছি সামান্য দূরত্ব। এতটুকু দূরত্বে বন্ধুরা আপোষে একজন আরেকজনের আগে বেড়ে থাকে। আর আমি আপনার কাছে দ্রুত এসেছি আপনার সন্তুষ্টির জন্য। কেননা, আপনার আদেশ পালনে ও ওয়াদা পূরণে দ্রুত করাটাই আপনার সন্তুষ্টিকে আবশ্যিক করে দিবে।

في تفسير الكشاف لجار الله الزمخشري

وَمَا أَعَجَّلَكَ (أي شيء عجل بك عنهم على سبيل الإنكار ، وكان قد مضى مع النقباء إلى الطور على الموعد المضروب . ثم تقدمهم شوقاً إلى كلام ربه وتنجز ما وعد به ، بناء على أجهاده وظنه أن ذلك أقرب إلى رضا الله تعالى

(৪) অর্থঃ তাফসিরে কাশ্শাফে আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরি রহ. উল্লেখ করেন,

আর তোমাকে কিসে ত্বরা করালো? অর্থাৎ কোন জিনিসে তোমাকে তাদের থেকে ত্বরা করালো? (প্রশ্নটি) অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের তরিকায় হয়েছে। তিনি নাকিবদের সাথে করে নির্ধারিত ওয়াদা মোতাবিক ত্বর পর্বতের দিকে চলছিলেন। তারপর তিনি আল্লাহ তা'আলার কালাম ও ওয়াদা বাস্তবায়নের প্রতি অগ্রহি হয়ে, ইজতিহাদ করে এবং এই মনে করে যে আগে বাড়াটা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির অধীক নিকটবর্তী ধারণা করে তাদের থেকে আগে চলে আসলেন।

في مفردات غريب القرآن
للعلامة الراغب الاصفهاني
عجل: العجلة طلب الشيء وتحريره قبل أوانه وهو من مقتضى الشهوة فلذلك صارت مذمومة في عامة القرآن حتى قيل العجلة من الشيطان، قال (سأريكم آياتي فلا تستعجلون - ولا تعجل بالقرآن - وما أعجلك عن قومك - وعجلت إليك) فذكر أن عجلته وإن كانت مذمومة فالذي دعا إليها أمر محمود وهو طلب رضا الله تعالى،

(৫) অর্থঃ আল্লামা রাগেব ইস্ফাহানি রহ. 'মুফরাদাত' কিতাবে উল্লেখ করেন,

'উজলত' (তাড়াহুড়া) বলা হয় সময় হওয়ার আগেই জিনিসকে তলব করা ও ইচ্ছা করা। আর এটা প্রবৃত্তির চাহিদা থেকেই হয়। এই জন্য পুরা কুরআন শরিফের সব উজলত (তাড়াহুড়া) নিন্দনীয় হয়েছে। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, উজলত শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, অর্থঃ আমি অচিরেই আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে দেখাবো। সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া করো না। কুরআন দ্বারা তাড়াহুড়া করো না। তোমাকে তোমার কওম থেকে কিসে তাড়াহুড়া করালো? আমি আপনার কাছে তাড়াহুড়া করে এসেছি। ইস্ফাহানি রহ. বলেন, মূসা আ. উল্লেখ করলেন যে, তার তাড়াহুড়া করাটা যদিও মাযমূম নিন্দনীয়, কিন্তু তাড়াহুড়া করার কারণ ছিল প্রশংসনীয়, আর সেটা হলো আল্লাহর তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করা।

في البحر المديد تفسير ابن عجيبة

قال الكواشي: ولما كان سؤال الرب تعالى لموسى يقتضي شيئين: أحدهما: إنكار العجلة، والثاني: السؤال عن السبب والحامل عليها، وقال القشيري: هم أولاء على أثري ما خلّفْتُهُم لتضييعي إياهم، ولكن عَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لترضى. قال: يا موسى، رضائي في أن تكون معهم، ولا تتقدمهم ولا تسبقهم، وكونك مع الضعفاء، الذين استصحبتهم في حصول رضائي، أبلغ من تقدّمك عليهم

(৬) অর্থঃ তাফসিরে বাহরে মাদিদে আছে, আল্লামা কাওয়াসি রহ. বলেন, মূসা আ. কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলার করা প্রশ্নটি দুইটি বিষয়ের দাবি করে। এক, ত্বরা করার অস্বীকৃতি। দুই. কারণ ও কারণের উপর উদ্বুদ্ধকারী সম্পর্কে সুওয়াল করা।...

আল্লামা কুসাইরি রহ. বলেন, (মূসা আ. এর উক্তি) ওরা আমার পশ্চাতেই আছে। আমি তাদেরকে ধ্বংস করবো এই উদ্দেশ্যে আমি তাদেরকে পশ্চাতে রাখেনি। কিন্তু আমি আপনার কাছে তাড়াহুড়া করে আপনার সন্তুষ্টির জন্য এসেছি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মূসা, তাদের সাথে থাকার মধ্যেই আমার সন্তুষ্টি ছিল। তুমি তাদের আগে বাড়বে না। তাদের আগে অগ্রসর হবে না এবং দুর্বলদের সাথে তোমার থাকা, যাদের সাথে

তুমি ছিলে, আমার সন্তুষ্টি হাসিলের ব্যাপারে অধীকতর সন্তুষ্টির মাধ্যম ছিল, তাদের থেকে আগে বাড়ার চাইতে ।

تفسير أبي سعود
وقلنا له أي شيء أعجلك منفردا عن قومك وهذا كما ترى سؤال عن سبب تقدمه على النقباء مسوق
لإنكار انفراده عنهم لما في ذلك بحسب الظاهر من مخايل إغفالهم وعدم الاعتداد بهم مع كونه مأمورا
بإستصحابهم وإحضارهم معه

(৭) তাফসিরে আবু সাউদের মধ্যে আছে, আর আমি তাকে বললাম, কোন জিনিস তোমাকে তোমার কওমকে রেখে একা একা চলে আসতে ত্বর করা? এইটা যেরকম তুমি দেখতেছো যে, নির্বাচিত নাকিবদের আগে আসার কারণ সম্পর্কে একটা প্রশ্ন, ঠিক সেরকমই তাদেরকে রেখে মূসা আ. একাকি আসার অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্যও বলা হয়েছে। কেননা, বাহ্যত একাকি আসার মধ্যে কওমকে অবহেলায় রেখে আসার ভাবনা এবং তাদেরকে গুরুত্ব না দেওয়ার বিষয়টি রয়েছে। অথচ তিনি তাদের সাথে থাকা ও তাদেরকে নিয়ে হাজির হওয়ার ব্যাপারে আদিষ্ট ছিলেন।

في التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور.. والاستفهام مستعمل في اللوم . والذي يؤخذ من كلام المفسرين
وتشير إليه الآية : أنّ موسى تعجل مفارقة قومه ليحضر إلى المناجاة قبل الإبان الذي عيّنه الله له ،
اجتهاداً منه ورغبة في تلقي الشريعة حسبما وعده الله قبل أن يحيط بنو إسرائيل بجبل الطور ، ولم يراع
في ذلك إلا السبق إلى ما فيه خير لنفسه ولقومه

(৮) আল্লামা ইবনে আশুর রহ. তাফসিরে তাহরির ও তানবিরে উল্লেখ করেন,

আয়াতের প্রশ্নটি তিরস্কারের জন্য ব্যবহার হয়েছে। মুফাসসিরদের ইবারতে যা আছে এবং যে দিকে কুরআন শরিফের আয়াতটি ইঙ্গিত করে তা হলো, আল্লাহ তা'আলা যে সময় মূসা আ.কে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন সে সময় আসবার আগে বনি ইসরাইল ত্বর পাহাড়ে পৌঁছার আগেই আল্লাহর মুনাজাতে হাজির হওয়ার জন্য তিনি কওমকে একাকি পৃথক রেখে দ্রুত চলে আসলেন। তিনি এ কাজ ইজতেহাদ করে এবং আল্লাহর ওয়াদা মোতাবিক শরিয়ত পাওয়ার উৎসাহে করলেন। নিজের জন্য ও নিজের কওমের জন্য যেখানে কল্যান রয়েছে সে দিকেই তিনি মনোনিবেশ করলেন।

(৯) মুফতি শফি' রহ. মা'আরিফুল করআনে লিখেন,

ত্বর করা সম্পর্কে মূসা (আঃ) কে প্রশ্ন ও রহস্য :

মূসা (আঃ) তার সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে আশা করেছিলেন যে, তারাও বোধ হয় ত্বর পর্বতের নিকট পৌঁছে গেছে। তার এই ভ্রান্তি দূর করা এবং বনী ইসরাইল যে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছে, এই খবর দেয়াই ছিল উপরোক্ত প্রশ্নের বাহ্যতঃ উদ্দেশ্য। (ইবনে-কাসীর)

রুহুল মা'আনীতে কাশশাফের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে : এই প্রশ্নের কারণ ছিল মূসা (আঃ) কে তার সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া এবং এই তুরা করার জন্যে হুশিয়ার করা যে, নরুওয়তের পদের তাগিদ অনুযায়ী কওমের সাথে থাকা, তাদেরকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখা এবং সঙ্গে আনা উচিত ছিল। তাঁর তুরা করার ফলশ্রুতিতে সামেরি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। এতে স্বয়ং তুরা করার কাজেরই নিন্দা করা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণের মধ্যে এই ক্রটি না থাকা বাঞ্ছনীয়। “ইনতিসাফ” গ্রন্থের বরাত দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, এতে মূসা (আঃ) কে কওমের সাথে সফর করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয় যে, যে ব্যক্তি কওমের নেতা, তার পশ্চাতে থাকা উচিত : যেমন লূত (আঃ) এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্দেশ দেন যে, মুমিনদেরকে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে পড় এবং তাদেরকে অগ্রে রেখে তুমি সবার পশ্চাতে থাকো। (মা'আরিফুল কুরআন, মুফতি শাফি রহ. অনুবাদক, মাওলানা মহিউদ্দিন খান - ৬/১৩২, এক বলিয়মে সৌদিআরবের ছাপা- ৮৬১ পৃষ্ঠা)

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

সা'আদ সাহেব এই মন্তব্য করে মুলহিদ ও যিন্দিকের কাতারে শামিল হওয়ার পথ সুগম করলেন।

মন্তব্যের জবাব :

نعوذ بالله من ذلك এই মন্তব্যের ইলযাম তো শুধু মাওলানা সা'আদ সাহেবের উপরই পড়ে না। বরং আমাদের তাফসির লেখকদের এক জামাত, বহুত আলেম ওলামার উপরও গিয়ে পড়েছে। আল্লাহ আমাদের যবানকে হেফাজত করুন।

১৮. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

হযরত মূসা আ. কর্তৃক হযরত হারুন আ. কে নিজের স্থলাবিধিক্ত বানানোও অনুচিত কাজ হয়েছে।

তাফসিল :

হারুন আ. কে মূসা আ. নিজের স্থলাবিধিক্ত বানিয়ে কওমের মধ্যে রেখে আল্লাহর দরবারে একাকি মূসা আ. এর হাজির হওয়াটা এক জামাত মুফাসসিরিনদের মতে আল্লাহর কাছে অনুচিতই ছিল। এই জন্যেই আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করলেন, হে মূসা, তোমার কওম থেকে তোমাকে কে তুরা করালো? মুফাসসিরগণের উক্তিগুলো আমরা ১৭ নং অভিযোগের অধীনে উল্লেখ করেছি।

উম্মতকে সাথে নিয়ে চলার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে মুহতারাম মাওলানা মূসা আ. এর ঘটনা উল্লেখ করলেন। তাফসির কিতাবগুলো থেকে জানা যায়, কওমকে সাথে নিয়ে কিতাব আনার জন্য তুর পর্বতে মূসা আ. যাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ ছিল। কিন্তু কওমকে পিছনে রেখে মূসা আ. আল্লাহর অধিক সম্ভ্রটি লাভের উদ্দেশ্যে ও কিতাব আনার আশ্রয়ে একাকি আল্লাহর দরবারে হাজির হোন। একদল মুফাসসিরগণের মতে এটা ছিল মূসা আ. এর ইজতিহাদি ভুল। মুফাসসিরগণের মতে কওমকে একাকি রেখে আসার কারণে তারা সামেরির দ্বারা গুমরাহির শিকার হয়। ১২ হাজার বাদে বাকি ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাইল বাছুর পূজায় আক্রান্ত হয়ে গুমরাহ হয়ে যায়।

মুহতারাম মাওলানা যা বলেছিলেন তাফসিরের আলোকেই বলেছিলেন। কিন্তু কিছু মানুষের ‘গলত ফাহাম’ হয়েছে এবং ভুল বুঝাবুঝি হয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে। এই জন্যে তিনি মজমাতে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, মূসা আ. এর সাথে বেআদবি মূলক কোনো কথা আমি বলেনি, বলতে চাইনি। আশ্বিয়াদের ব্যাপারে সামান্য বেআদবি সহ্য করা যাবে না। কিন্তু আমার বক্তব্য থেকে এমন কিছু বুঝা গিয়ে থাকলে, এর থেকে আমি রুজু করলাম, অর্থাৎ ভুল স্বীকার করলাম। এরকম আমিও করবো না। আপনারাও এরকম করবেন না। এই রুজুর পরে আমাদের আর কিছু বলার থাকে না।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- **وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قومى واصلىح ولا تتبع سبيل المفسدين** - আল্লাহ তায়ালায় কাছে যদিও মুছা আ. এর এই কাজ পছন্দনীয়, কিন্তু সা’আদ সাহেবের কাছে কাজটি অপছন্দনীয় হিসেবে গণ্য হয়েছে। এখন সা’আদ সাহেবের ভক্তগণ কার পক্ষ নেবে? মাও. সা’আদ সাহেবের, না আল্লাহর?

মন্তব্যের জবাব :

অভিযোগকারী মূসা আ. এর এ কাজটিকে মুহতারাম মাওলানার কাছে অপছন্দনীয় দাবি করে চরম একটা ভুল মন্তব্য করলেন। মুহতারাম মাওলানা এক জামাত মুফাসসিরগণের উক্তি নকল করেছেন মাত্র। এখানে মাওলানাকে দোষারোপ করে প্রকারান্তরে এক জামাত মুফাসসিরগণকে দোষারোপ করে যাচ্ছেন। যুগের পর যুগ, শত শত বছর ধরে যারা তাদের তাফসির নকল করেছেন সবাইকে দোষারোপ করে যাচ্ছেন। এত দোষারোপকারী অভিযোগকারীর সাথে আমরা নাই।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর কাছে কাজটি পছন্দনীয় হয়েছিল বলে নিশ্চিত করে অভিযোগকারী কীভাবে বললেন? যেখানে মুফাসসিরগণের দুই দলের দুটি মত রয়েছে। একদলের মত, এটা ছিল ইজতিহাদি ভুল। তাহলে কী অভিযোগকারী বলতে চান ভুল কাজ করেও আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় হওয়া যায়?

১৯. অভিযোগকারীর ভাষায় মাওলানা সা’আদ সাহেবের কথা :

সকাল-সকাল কুরআন তেলাওয়াত করা এবং নফল নামায পড়ার তো একটা অর্থ বুঝে আসে। কিন্তু আল্লাহ আল্লাহ বলে যিকির করে কী অর্জন হয়? কিছুই অর্জন হয় না।

তাফসিল :

মুহতারাম মাওলানার কথা হিসাবে যা উল্লেখ করলেন তার সারাংশ হলো, কুরআন তিলাওয়াত ও নফল নামায তাতো ঠিক আছে। কিন্তু আল্লাহ আল্লাহ বলে যিকির করে কিছুই অর্জন হয় না।

প্রথমতঃ একথাগুলো মাওলানা সা’আদ সাহেবের দেওয়া অজিফার সম্পূর্ণ বিপরীত। সব তাবলিগের সাথীরাই জানেন মাওলানা সা’আদ সাহেব মাসনূন যিকিরের কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যখন তিনি বাইয়াত নেন

তখন অন্যান্য তাসবিহাতের সাথে এক হাজার বার আল্লাহ আল্লাহ বলে যিকির করার পরামর্শও যে দেন এসব সব সাথীরা জানেন। এরকম মিথ্যা কথা বলে বুঝমান সাথীকে বিভ্রান্ত করা যায় না।

দ্বিতীয়ত : যদি কোনো ব্যাণে কোনো হিকমতের উদ্দেশ্যে কিংবা কুরআন হাদিসের সঠিক তথ্য প্রদান ও মূল সূনাতের পরিচয় দানে বলে থাকেন যে, শুধু আল্লাহ আল্লাহ বলে যিকির করলে বুয়ুর্গদের অভিজ্ঞতার কথা, এর দ্বারা কিছু ফায়দা হয়, কুরআন-হাদিসে এরকম যিকিরের নির্ধারিত কোনো সাওয়াবের ওয়াদা নেই, তাহলে তিনি সত্য বলেছেন। কুরআন শরিফের কোনো আয়াতে বা সহিহ কোনো হাদিসে এ কথার প্রমাণ নেই যে, আল্লাহর নবী এক হাজার বার কিংবা পাঁচ হাজার বার আল্লাহ আল্লাহ যিকির করেছেন বা উম্মতকে করতে বলেছেন। একজন সাহাবি থেকে এ কথার প্রমাণ বের করতে পারবে না যে, তিনি এক হাজার, পাঁচ হাজার বার আল্লাহ আল্লাহ যিকির করেছেন। তাই আহলে হক উলামায়ে কেরাম বলে থাকেন, আল্লাহ আল্লাহ বলে যিকির করা নবী বা সাহাবাওয়ালা সূনাত নয়। এসব যিকিরের উপর নির্ধারিত কোনো ছাওয়াবের ওয়াদা নেই। তবে এসব যিকির করা না যায়েজও নয়। এসব যিকির করা যায়েজ। আমাদের বুয়ুর্গরা এসব যিকির করেছেন, করতে বলেছেন এবং অভিজ্ঞতালব্ধ ফায়দার কথা বলেছেন। সেই ফায়দার কথা চিন্তা করেই হয়তো মুহতারাম মাওলানা অন্যান্য মাসনূন তাসবিহাতের সাথে আল্লাহ আল্লাহ বলে এক হাজার বার যিকির করতেও বলেন।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

মানহুস, বদবখতদের ভাগ্যে আল্লাহর যিকির নসিব হয় না। তাইতো তিনি নিজেও আল্লাহর নামের যিকির করেন না। অন্যকেও তা থেকে বিরত রাখেন। *فصلوا وأصلوا*

মন্তব্যের জবাব :

আল্লাহ তা'আলার নামের যিকির তিনি করেন না, করতে বলেন না, এরকম মন্তব্য করে গালি দিলেন। মন্তব্যটি পড়তে আমাদের ভয় লাগে। প্রিয় পাঠক, কথাগুলোর অসারতা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করার জন্য বাইয়াত কালের সরাসরি উনার কথাগুলো শুনুন কিংবা যারা বাইয়াত হয়েছেন তাদের থেকে খবর নিন। অভিযোগকারী যদিও মিথ্যা কথা চাপিয়ে দিয়ে গালি দিয়েছেন, আমরা এখানে সত্য থেকেও গালি দিব না। সাথী ভাইদেরও বলবো গালি না দেওয়ার জন্য। কারণ, আমরা জানি, 'কিফাতুল মুফতি' গ্রন্থে আছে, ইয়াযিদকে গালি দেওয়াও না যায়েজ।

(কিফাতুল মুফতি, ১/২৯৮)

২০. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

এই এক তাবলিগই নবুওয়তের কাজ। এ ছাড়া দ্বীনের যত কাজ আছে : দ্বীনী ইলম শিখানো, দ্বীনী ইলম শিখা, আত্মশুদ্ধি, কিতাবাদী রচনা করা কোনোটাই নবুওয়তের কাজ নয়।

তাহসিল :

মাওলানা মন্জুর নোমানি রহ. লিখেছেন,

মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলতেন,

“দ্বীনের আম তালিম ও তরবিয়তের যে তরিকা আমরা এই আন্দোলনের মাধ্যমে প্রচলন করতে চাচ্ছি শুধু এই তরিকাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় প্রচলন ছিল এবং এই পদ্ধতিতেই তখন আমভাবে দ্বীন শিখা ও শিখানো হতো। পরবর্তীতে আরও যে সকল তরিকা এই লাইনে আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন, কিতাব রচনা ও সংকলন করা এবং কিতাবি শিক্ষা ইত্যাদিকে সাময়িক প্রয়োজনই সৃষ্টি করিয়েছে। কিন্তু এখন লোকেরা শুধু এগুলোকেই আসল বুঝে নিয়েছে এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার তরিকাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। অথচ আসল তরিকা ওটাই এবং আমভাবে তালিম ও তরবিয়ত (শিক্ষা ও দীক্ষা) কেবলমাত্র ওই তরিকাতেই দেওয়া যেতে পারে।”

(মাওলানা মন্জুর নোমানি রহ. সংকলিত (উর্দু) মালফুজাত : মাওলানা ইলিয়াস রহ., মালফুজ নং-৮৪)

প্রিয় পাঠক, উচ্চতর শিক্ষার জন্য বর্তমানে মাদ্রাসা খুবই জরুরী। যদিও নবীর যামানায় এগুলো ছিল না, কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের দুর্বলতার কারণে এসবের প্রচলন ঘটে যায় এবং জরুরী হয়ে বসে। মাওলানা ইলিয়াস রহ. মাদ্রাসা শিক্ষাকে অস্বীকার করেননি। কারণ তিনি নিজেও একজন মাদ্রাসা শিক্ষিত। মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেবও মাদ্রাসা শিক্ষিত এবং কাশিফুল উলূম মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস। কিন্তু মাওলানা ইলিয়াস রহ. চাইতেন, সাহাবায়ে কেরামের যামানায় দ্বীন শিখা ও শিখানোর যে তরিকা ছিল এইটা যিন্দা হয়ে যাক। উম্মতের কোনো তবকার মধ্যে দ্বীন শিখা ও শিখানো সীমাবদ্ধ না হয়ে যাক। আমভাবে বিভিন্ন তবকার আপোষের দূরত্ব দূর করে সবাই মিলে মিশে এক জামাত হয়ে যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী ঈমান ইলম ও আমল শিখবো। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সাহাবাওয়ালা তরিকাকে আমরা গ্রহণ করবো। কারণ, প্রয়োজনীয় ইলম শিক্ষা করা সবার উপরই ফরজ। এসব হাসিলের সাহাবাওয়াল তরিকা হলো দাওয়াতি তরিকা।

ফকিহুল উম্মত হযরত মাওলানা মুফতি মাহমুদ হাসান রহ. লিখেছেন,

সব নবীকে, বিশেষ করে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা শিক্ষক হিসাবে পাঠিয়েছেন। আর দ্বীন শিখা ও শিখানোর দায়িত্ব সবাইকে দেওয়া হয়েছে। শিখা ও শিখানোর তরিকা বিভিন্ন রকমের রয়েছে। প্রথম যামানায় না আজকালের মত মাদ্রাসা ছিল, না খানকা ছিল, না কিতাবাদি রচনার ধারা ছিল, না ওয়াজ নসিহতের মাহফিল ছিল, না বিভিন্ন সংগঠন বানানোর দস্তুর ছিল। সাধারণত মুখে মুখে শিখা-শিখানোর আমল ছিল।... পরবর্তীতে হাদিস জমা করা ও শিখার প্রচলন ঘটেছে এবং এর দ্বারা দ্বীন শিখানো হয়েছে। মাদ্রাসা কয়েম করা হয়েছে এবং এর দ্বারা দ্বীন শিখানো হয়েছে। এসব তরিকাগুলো যায়েজ ও উপকারীও। প্রথম প্রথম দ্বীন শিখা - শিখানোর যে তরিকা ছিল সেটা কিতাব ছাড়াই ছিল। প্রত্যেক যামানাতেই কিতাব ছাড়া দ্বীন শিখা শিখানোর দস্তুর বাকি ছিল। যদিও হুবহু প্রথম যুগের মত ছিল না, কিন্তু ‘ফন্না’ (প্রাতিষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিক ও কিতাবনির্ভর) কখনই হয়নি। বর্তমানে তাবলিগি জামাতের মুজাহাদায় আল্লাহ তা'আলা আবার সেই তরিকার ব্যাপক প্রচলন ঘটিয়ে দিলেন। সুতরাং এইটা বলা সঠিক যে, দাওয়াত ও তাবলিগি নবীওয়ালা কাজ। মাদ্রাসা ছাড়া, কিতাব ছাড়া দ্বীন শিখা শিখানো চেষ্টা করা, এর জন্য নিজের জীবনকে ওয়াকফ করে দেওয়া সমস্ত নবীদের তরিকা। কিন্তু দ্বীন শিখার অন্যান্য তরিকাকে না যায়েজ বলাও যায়েজ নেই এবং এটা তাবলিগের উসুলের খেলাফ।

(ফাতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪/২০৭)

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. লিখেছেন,

“ইলম সম্পর্কেও মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর তাহকিক এই ছিল যে, দ্বীনের তালিম ও তায়াল্লুম (শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ) কে কিতাবের অক্ষরসমূহের মধ্যে এবং মাদ্রাসার সীমানায় আবদ্ধ করাটা হলো পরবর্তী যুগের তরিকা এবং উম্মতের বিরাট অংশকে এই সম্পদ থেকে বঞ্চিত করারই নামান্তর। এইভাবে উম্মতের খুবই ক্ষুদ্র একটা তবকা দ্বীনের ইলম দ্বারা উপকৃত হবে এবং এটাও তত্ত্বগত ও চিন্তাগত ভাবে হবে। দ্বীনের তালিম ও তায়াল্লুমের স্বভাবগত ও সর্বজনীন পদ্ধতি, যার দ্বারা লাখো মানুষ কোনো সাজসরাজ্য ছাড়াই সামান্য সময়ে ইলমে দ্বীন নয়, বরং নফসে দ্বীন (দ্বীনের জ্ঞান, আমল এবং দাওয়াতের হেকমতের সমন্বয়) হাসিল করতে পারে। আর সেই পদ্ধতি হলো, ইখতিলাত ও ইজতিমা (মেলামেশা ও একত্র হওয়া), সুহবত (সান্নিধ্য), সায়ী (মেহনত) ও আমলের মধ্যে নম্রতা এবং নিজের পরিবেশ থেকে বাহির হওয়া। কোনো ভাষা ও সংস্কৃতি যেমন সংশ্লিষ্ট মানুষের সংস্পর্শ ও সান্নিধ্য দ্বারাই শুধু আয়ত্ব করা যায় এবং সেটি ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষার স্বভাব পদ্ধতি তদ্রূপ দ্বীনের বিশুদ্ধ ইলমও দ্বীনদারদের সংস্পর্শ, সান্নিধ্য, ওঠাবসা ও মেলামেশা দ্বারাই হাসিল হতে পারে এবং এটাই হলো দ্বীনের ইলম হাসিল করার স্বভাব পন্থা। কেননা, দ্বীনি ইলমের এমন অনেক বিষয় আছে যা কলমের নাগালের বাইরে। দ্বীন একটি সচল, গতিশীল ও জীবন্ত বিষয়। আর কিতাব হলো নিষ্প্রাণ লেখা ও রেখার সমষ্টি। ‘নিষ্প্রাণ’ কিছু থেকে ‘জীবন্ত’ কিছু লাভ হওয়া প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ।

দ্বীনের কিছু অংশের সম্পর্ক হলো অংগ প্রত্যংগের সাথে। সেগুলো অংগ প্রত্যংগের সঞ্চালন দ্বারাই হাছিল হবে। কিছু অংশের সম্পর্ক হলো হৃদয়ের সাথে। সেগুলো হৃদয় থেকে হৃদয়েই পরিবাহিত হতে পারে। আর কিছু অংশের সম্পর্ক হলো চিন্তা ও মস্তিস্কের সাথে। সেগুলো অবশ্য কিতাব থেকে হাছিল হতে পারে। এ সুস্ব বিষয়টা একবার তিনি এভাবে বয়ান করেছেন-

“মানুষের প্রতিটি অংগ প্রত্যংগের স্বতন্ত্র ও বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। চোখ দিয়ে আমরা দেখার কাজ করি। চোখ এ দায়িত্ব পালনে প্রকৃতিগতভাবে বাধ্য। তার দ্বারা শ্রবণের কাজ নেয়া সম্ভব নয়। তদ্রূপ বিহিঃপরিবেশ সম্পর্কে অনুভব করা হলো হৃদয়ের কাজ। মস্তিস্কের কাজ হলো হৃদয়ের অনুভবকে বিন্যস্ত করণ। মস্তিস্ক হলো হৃদয়ের অনুগত। আর হৃদয়ের অনুভব আসে পরিবেশ থেকে। মস্তিস্কের বিন্যস্তকরণেরই নাম হলো ইলম। মস্তিস্ক তখনই নির্ভুল ভাবে বিন্যস্তকরণে সক্ষম হবে, অর্থাৎ ইলম হাছিল করতে পারবে যখন হৃদয় সঠিকভাবে অনুভব করবে। আর এই অনুভব জড় ও নিষ্প্রাণ কিতাব থেকে হাছিল হতে পারে না। এটাতো হবে আমলের মাধ্যমে। আমি এ কথা বলি যে, মাদ্রাসাগুলো বন্দ করে দেওয়া হোক। আমার কথা শুধু এই যে, মাদ্রাসার তালিম হলো উচ্চস্তরের সম্পূরক ও পূর্ণতাদায়ক। প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য এটা উপযোগি নয়।”

(মাও. আবু তাহের মেহবাহ অনূদিত “দ্বীনি দাওয়াত, পৃষ্ঠা-২৭১-২৭২)

মাওলানা আলি মিয়া রহ. আরও লিখেছেন,

ইলম ও তালিম সম্পর্কে এটা এমন তাহকিকপূর্ণ ও দলিলভিত্তিক, জ্ঞানপূর্ণ ও সারগর্ভ বক্তব্য যাকে ইলমিভাবে উলামায়ে কেরাম নিজেদের বহস, চিন্তা-গবেষণা, তালাশ ও তাহকিকের বিষয়বস্তু বানানো উচিত। মাওলানার দাওয়াতের এই তালিম ও শিক্ষা বিষয়ক অংশটুকু এমনি গুরুত্বপূর্ণ ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারা, যার উপর আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ও ইলম চর্চায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ গভীর চিন্তাভাবনা করা উচিত এবং এর থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। কিন্তু মাওলানার দাওয়াতের এই অংশটুকুকে বুঝার সবচেয়ে কম চেষ্টা ও কম মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। (সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভী রহ. সংকলিত (উর্দু) ‘দ্বীনী দাওয়াত’, পৃষ্ঠা- ৩১১, ৩১৩)

প্রিয় পাঠক,

মুহতারাম মাওলানা হয়তো সেই কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। হযরত উলামায়ে কেরাম ও অসংখ্য সর্বসাধারণ উম্মাতের মাঝের দূরত্ব দূর করতে চাচ্ছেন। আমভাবে সাহাবা-ওয়ালা পদ্ধতিতে ঈমান, আ'মাল, আখলাক, ইলমে না'ফে, যিকির, দাওয়াত, জিহাদ ইত্যাদিকে যিন্দা করার মেহনতের নাম তাবলিগ। বিচ্ছিন্নভাবে বিচ্ছিন্ন কিছু মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক ইলম শিখা-শিখানো, খানকার কিছু মানুষের অজিফা ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির তরিকা, কিছু মানুষের কিতাব লেখা ইত্যাদি যায়েজ এবং সময়ের প্রেক্ষিতে ক্ষেত্র বিশেষ এই যায়েজগুলো শুধু যায়েজই নয়, বরং অত্যাবশ্যকীয় বটে। তবে এ কথা বলতেই হবে যে, নবীওয়ালা মেহনত এমন নয়। নবীওয়ালা মেহনতের সাথে এই এক তাবলিগী কাজের বড় মিল পাওয়া যায়। এর দ্বারাই উম্মত বেশি উপকৃত হচ্ছে। উম্মতের জাহালাত দূর হচ্ছে। প্রয়োজনীয় ইলম যিন্দা হচ্ছে। সাহাবাদের মত ঈমান, নামায, ইলম ও যিকির, ইকরামে মুসলিম, ইখলাসে নিয়ত, দাওয়াত ও তাবলিগ, এই সিফাতগুলো যিন্দা হওয়ার নববী তারতিব যিন্দা হচ্ছে। সুতরাং আমাদের আকাবির হযরতদের মত আমাদেরকে এই কাজে লাগতে হবে। আমীরের দেওয়া তারতিব ও তাকাযার আলোকে সমস্ত দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে এই কাজকে যিন্দা করতে হবে। দ্বীনের অন্যান্য শূ'বার মেহনত যা সময়ের ব্যবধানে বড় প্রয়োজন সেগুলোকেও যিন্দা রাখতে হবে। সবাই মিলে মেহনত করতে হবে।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

ইহা ৮ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত চারটি আয়াত অস্বিকারের নামান্তর। আওলিয়া ও উলামায়ে কেরাম থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য ইহুদি-নাসারারা অনেক পূর্ব থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছে, তাদের ঐ প্রোগ্রামটিই সা'আদ সাহেবের মাধ্যমে কার্যকরী করা হচ্ছে।

মন্তব্যের জবাব :

আয়াতগুলোর আমল করছেন নাকি অস্বিকার করছেন বিজ্ঞ পাঠক ৯ নং মন্তব্যের জবাবে লেখা সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারাই বুঝতে পেরেছেন। মুসলমানদেরকে মুহতারাম মাওলানা আউলিয়া ও উলামায়ে কেরামগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করছেন নাকি সাহাবা-ওয়ালা পদ্ধতিতে আমভাবে মুসলমানদেরকে আউলিয়া ও উলামা বানাচ্ছেন এসব সচেতন জাতীর কাছে স্পষ্ট। অযথা দাবি করে জাতীকে বিভ্রান্ত করা যাবে না।

কুরআন শরিফের সূরা ইউনুছের ৬২, ৬৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অলি হওয়ার মাপকাঠি যখন ঈমান ও তাকওয়া বলা হলো, তাহলে মুহতারাম মাওলানা ও এই সিলসিলার পূর্ব আমিরগণ যে কত লক্ষ লক্ষ বরং কোটি কোটি মানুষকে আল্লাহর অলি বানিয়ে যাচ্ছেন তা সবাই বুঝতে পারছেন। সারা দুনিয়া দেখছে। কুরআন শরিফের সূরা ফাতিরের ২৮ নং আয়াতে خشيّة (আল্লাহ-ভীতি) এবং আনপড় সাহাবাগণের ইলম যখন আলেম হওয়ার মাপকাঠি তাহলে এই এক মেহনতের দ্বারা সারা বিশ্বের কত লক্ষ লক্ষ মানুষ আলেম হচ্ছে, এর কোনো ইয়ত্তা নেই। সুতরাং মুহতারাম মাওলানা একেক মুসলিমকে, হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর কথা মত, একেকটা মাদ্রাসা ও খানকা বানিয়ে যাচ্ছেন। এখানে আমরা নাজাতের জন্য প্রয়োজনীয় ইলমের কথা বলছি, বর্তমানের ইলমের উচ্চতর শিক্ষার কথা বলছি না। সে ইলম তো বর্তমানে মাদ্রাসা থেকেই হাসিল করতে হবে।

২১. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

মাদ্রাসার উস্তাদরা বেতন নেওয়ার কারণে দুনিয়াবি ধান্দায় জড়িয়ে আছে। এ কারণে দ্বীনের খেদমতের জন্যও তাদের কিছু সময় দেওয়া উচিত।

তাকসিল :

মুহতারাম মাওলানা বলেছেন কি না জানি না। তবে মাদ্রাসার প্রতি এবং মাদ্রাসার উস্তাদ উলামাদের প্রতি মাওলানার যে তা'জিম ও তাকরিম, মহব্বত ও আত্মিক টান এবং মাওলানার বয়ানে উলামাদের তা'জিম ও ইকরামের লাইনে যে তাকিদ ও জোর এসবকিছু প্রমান করে মাওলানা কথাগুলো বলেননি, বললেও এইভাবে বলেননি। তবে এ কথা সত্য, কোনো কোনো মাদ্রাসার কোনো কোনো উস্তাদ বেতন-টেতন ইত্যাদি ইলম ও কুরআন-হাদিস শেখানোর বদলা ভাবে ভাবে এবং নিতে নিতে, এগুলো ইলমের যে বদলা নয়, বরং আটক সময়ের বদলা, এ সব ভুলে গিয়ে এক ধরনের দুনিয়াবি ধান্দায় জড়িয়ে থাকতেও পারেন। মাদ্রাসায় পড়ানোটা অন্যান্য দুনিয়াবি চাকুরির মত মনে করতে করতে ওই দুনিয়াবি চাকুরির বিমিময়-ভাবটা কারোর মধ্যে চলে আসতেও পারে। মুহতারাম মাওলানা ইসলাহ ও তরবিরের জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার কথা তাকে বা তাদেরকে বলতেও পারেন। এটা হয়তো খুসুসি ব্যক্তির খুসুসি পরামর্শ কিংবা খুসুসি মজলিসের খুসুসি বয়ান। এরকম বয়ান, এরকম পরামর্শ আমাদের উস্তাদবর্গ থেকে বহুত শুনেছি। সাল দেওয়া মাদ্রাসার বহুত উলামা হযরতগণ বলে থাকেন, সাল দিয়ে আমাদের অনেক ইসলাহ হয়েছে। নিজামুদ্দিন মারকাযের সুহবতে থেকে হযরতজি দাঃবাঃ এর বাতানো উলামাদের তারতিব মেনে আমাদের অনেক ইসলাহ ও ফায়দা হচ্ছে।

আমাদের কমতিগুলো বলে আমাদের উস্তাদগণ যদি আমাদের ইসলাহের জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হতে বলেন, তাহলে মুহতারাম মাওলানা বললে দোষের কী! নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ভেবে দেখুন, স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে অনেক সময় অনেক কথাই আসে যেগুলো আমভাবে উপাস্থাপন করা যায় না। উপাস্থাপন করলে যারা ওই ব্যক্তি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকুফহাল থাকেন তারা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েন না। বাকিরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়, এটাই স্বাভাবিক ও বাস্তবতা।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

যিনি নিজে দুনিয়াবি ধান্দায় জড়িয়ে পৃথিবীর সব মসজিদে ফেৎনা-ফাসাদ ছড়িয়ে দিলেন, নিজামুদ্দিন মসজিদকে মুসলমানদের রক্তে রক্তাক্ত করলেন, তিনি উলামাদেরকে দুনিয়ার ধান্দার অপবাদ দিচ্ছেন। ইহা সাধারণ মুসলমানদের কাছে উলামায়ে কেরামকে হেয়প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা নয় কি?

মন্তব্যের জবাব :

উলামায়ে ছু, যাদের অনুসরণ করলে দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ হয়ে যাবে। উলামায়ে আখিরাত, যাদের অনুসরণ করলে দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব হওয়া যাবে। উলামায়ে ছু ও উলামায়ে আখিরাতের পরিচয় ও আলামতগুলো ইমাম গাযালি রহ. 'এহইয়া-উল-উলূম' গ্রন্থে সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে শাইখুল হাদিস যাকারিয়া রহ. 'ফাযায়েলে সাদাকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেন। মাওলানা জোবায়ের সাহেব অনূদিত বাংলা 'ফাযায়েলে সাদাকাত' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের ১৩৫ পৃষ্ঠায় উলামায়ে ছু ও উলামায়ে আখিরাত চিনবার আলামতগুলো যদি আমরা বয়ান করি জুমার খুতবায় কিংবা অন্য কোনো মজমায় তাহলে আমরা কি

উলামাদের হয় করছি? সাধারণ মানুষকে সতর্ক করছি যে, যেকোনো বিষয়ে যে কাউকে জিজ্ঞেস করা যাবে না।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরিন রহ. বলতেন,

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

অর্থঃ নিশ্চয় এই ইলম হলো দীন। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য করো কাদের থেকে তোমাদের দীন গ্রহণ করছো, (মুসলিম শরিফ)।

যদি আমরা উম্মতের সামনে নবীর এই হাদিস-

قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ عَنِ الشَّرِّ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي عَنِ الشَّرِّ وَسَلُّونِي عَنِ الْخَيْرِ . يَقُولُهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ « أَلَا إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خَيْرُ الْعُلَمَاءِ »

অর্থঃ রাবি বলেন, এক লোক নিকৃষ্ট সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাইলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা আমার কাছে নিকৃষ্ট সম্পর্কে সুওয়াল করো না। তোমরা আমার কাছে উৎকৃষ্ট সম্পর্কে সুওয়াল করো। রাবি বলেন, তিনি একথাগুলো তিন বার বললেন। তারপর বললেন, সাবধান, জেনে রাখো, নিশ্চয় নিকৃষ্টের নিকৃষ্ট হলো নিকৃষ্ট উলামাগণ এবং উৎকৃষ্টের উৎকৃষ্ট হলো উৎকৃষ্ট উলামাগণ।

(দারেমি)।

যদি এই হাদিস বয়ান করি তাহলে কি আমরা উলামাদের হয় করছি?

মুহতারাম মাওলানা দুনিয়াবি ধাক্কায় জড়িয়ে সারা দুনিয়ার মসজিদসমূহে ফেৎনা ছড়িয়ে দিয়েছেন নাকি পূর্ব তিন আমীরগণ ইমারতের তারতীবে কাজ চালিয়ে গেছেন, উনাদের মত মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ)ও ইমারতের হক তারতীব যিন্দা রাখতে চাইছেন আর কিছু মানুষ বিশৃংখলা করছেন? আসলে কী বলবো,

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين

(হে আল্লাহ, আমাদেরকে হককে হক হিসাবে দেখিয়ে দিন এবং তার অনুসরণ করার তাওফিক দিন। আর বাতিলকে বাতিল হিসাবে দেখিয়ে দিন এবং তার থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দিন)

২২. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন, তা'লীমে বসেছিলে কিনা না? গাশত করেছিলে কিনা না?

তাকসিল :

ইলিয়াস রহ. এর খান্দানের উজ্জল নক্ষত্র মুহতারাম মাওলানার জন্ম নিয়ামুদ্দিনেই। জীবনে বহুত বায়ান করেছেন। আমাদের এই বিশ্ব ইজতিমাতে প্রায় ২০ বছর ধরে বয়ান করে আসছেন। আমাদের জীবনে উনার বহুত বয়ান শুনা হয়েছে। অভিযোগকারীর এই অভিযোগের বয়ান তো আমরা শুনি নাই। মুহতারাম মাওলানা যদি কোনো ব্যানে এরকম কিছু বলেও থাকেন আমরা এটাকে ভুল বলতে পারবো না। দলিলভিত্তিক কথা বলা হলে সেটাকে ভুল বলা যায় না। মুহতারাম মাওলানার অন্য সব কথা প্রমাণ করে এই কথারও একটা ব্যাখ্যা রয়েছে। হাদিসে আছে, “ইলম তলব করা প্রত্যেক মুসলিম নারী পুরুষের উপর ফরজ”। দ্বীনের উপর চলার জন্য প্রয়োজনীয় ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ ও ফরজে আইন। সুতরাং দ্বীনের প্রয়োজনীয় ইলম শেখার জন্য তা’লিমে বসা বা অন্য কোনো মাধ্যম অবলম্বন করা যদি ফরজ হয় তাহলে আল্লাহ কী এই ফরজের হিসাব নিবেন না?

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

অর্থঃ যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে সেটাও সে (কিয়ামতের দিন) দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সেটাও সে (কিয়ামতের দিন) দেখতে পাবে। (সূরা যারিয়াত)

কুরআনের এই আয়াত তো প্রমাণ করে সবকিছুর হিসাব হবে। অভিযোগকারী কি বলতে চান, দ্বীনি ইলম শেখার কোনো হিসাব হবে না? দ্বীনি ইলম শিখেছে নাকি শিখেনি এসব বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ হবে না?

দ্বিতীয়ত, গাশত মানে দাওয়াত। দাওয়াত দেওয়া আল্লাহ তা’আলার হুকুম। হাদিসের কিতাবে পড়েছি, বনি ইসরাইলের এক জনপদ এক বুয়ুর্গ সহ ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরীল আ. এর প্রতি আদেশ আসে। জিবরীল আ. ওই বুয়ুর্গ সহ উক্ত জনপদকে ধ্বংসও করে দেন। ওই বুয়ুর্গে অনায়া ছিল সে দাওয়াতের কাজ করতো না। নিজে নেক আমল করতো। কিন্তু নেক আমলের আদেশ ও বদ আমলের নিষেধ করতো না। হাশরের মাঠে আল্লাহর নবীগণ জিজ্ঞাসিত হবেন উনারা দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ করেছেন কিনা। আমাদের নবী যদি জিজ্ঞাসিত হতে পারেন তাহলে নবীর উম্মতগণ দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিল কিনা, দ্বীনের তাবলিগ ও প্রচারের হুকুম পালন করেছিল কিনা, এই বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে না?

নবীর হাদিস তো প্রমাণ করে উম্মতকে সব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلَّا مِمَّا الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং মানুষের আমীর বা বাদশাহ সেও দায়িত্বশীল। সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর পুরুষ তার আহলে বাইত অর্থাৎ পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর (স্ত্রী) মহিলা স্বামীর আহলে বাইত অর্থাৎ পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং স্বামীর সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সে (স্ত্রী)ও তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর মানুষের গোলাম বা দাস মনিবের মালের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

সেও সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং গাশত তথা দাওয়াত দেওয়া যদি মুমিন মুসলমানের দায়িত্ব হয় তাহলে এই দায়িত্ব সম্পর্কেও কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে জিজ্ঞাসা করবেন। মুহতারাম মাওলানা এই বক্তব্য দিয়ে থাকলেও কোনো ভুল বক্তব্য দেননি। নিজ পরিভাষায় হাদিস কুরআনের কথাই বলেছেন।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

কিয়ামতের দিন বান্দাকে কী জিজ্ঞেস করা হবে সব কোরআন হাদিসে বর্ণিত আছে, সা'আদ সাহেব যা বললেন, তাতো কোনো কুরআন-হাদিসে পাওয়া যায়নি। সা'আদ সাহেব আল্লাহর উপর অসত্য অপবাদ আরোপ করলেন। *ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا*

মন্তব্যে জবাব :

অভিযোগকারীকে বলতে চাই, শুধু কুরআন-হাদিসের আলফাজ অর্থাৎ শব্দ নিয়ে ঘাটাঘাটি করলেও তো পেয়ে যেতেন। শব্দের সাথে সাথে শব্দের অর্থ, হাকিকত ও উদ্দেশ্য নিয়ে কুরআন হাদিস ঘেটে দেখুন, মুহতারাম মাওলানার একটা কথাও কুরআন হাদিস বিরূধী নয়। বরং কুরআন হাদিসের নির্যাস।

আরেকটা কথা, অভিযোগকারী মুহতারাম মাওলানার কথার দলিল পায়নি। তাই বলে কেউ পাবে না এটাতো হতে পারে না। তার না পাওয়ার উপর ভিত্তি করে মুহতারাম মাওলানা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছেন বলার কোনো অধিকার তার নাই। বরং তিনি এরকম মন্তব্য করে জাতীর সামনে তার জাহালাতের প্রমাণ প্রকাশ করে দিলেন। জ্ঞান স্বল্পতার দরুন নিজের না পাওয়াটাকে আল্লাহর না বলার কথা বলে দেওয়া পূর্বকার কোনো আলেমের মধ্যে এরকম দুঃসাহস আমরা দেখি না।

২৩. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

প্রত্যেক সাহাবী অপর সাহাবীর বিরুদ্ধাচরণই করেছেন।

তাকসিল :

অভিযোগকারী যে আন্দায়ে কথাটি উল্লেখ করেছেন মুহতারাম মাওলানা সে আন্দায়ে অবশ্যই বলেন নাই। আর যদি বলে থাকেন তাহলে তিনি যে আন্দায়ে বলেছেন সে আন্দায়ে অভিযোগকারী অবশ্যই বুঝেন নাই। নবীর সাহাবিগণ নবী থাকাকালীন সরাসরি নবীর কথা মত চলেছেন। নবীর ইত্তিকালের পর নবীর রেখে যাওয়া কথা ও আদর্শের উপর চলেছেন। এক্ষেত্রে আপন ইলম ও ইজতিহাদের উপর আমল করেছেন। অনেক সময় না জানলে আরেক ইলম-ওয়ালা থেকে জেনেও আমল করেছেন। দ্বীনের উসূল অর্থাৎ মূল ভিত্তি ও বিষয়ের ক্ষেত্রে সব সাহাবি একমত থাকলেও দ্বীনের ফুরূয়ি অর্থাৎ শাখাগত বিষয়ের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে হাজারও ইখতিলাফ ও ইজতিহাদ ছিল, একজন আরেকজনের বিরূধী ছিল। যার যার ইজতিহাদের উপর আমল করেছেন। মাসায়েল ও ইজতিহাদের ভিন্নতার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে ঐতিহাসিক দুটি যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছে। এতে অসংখ্য সাহাবি শহিদও হয়েছেন। দ্বীনের শাখাগত মাসায়েলের ক্ষেত্রে ইমামগণও একজন আরেকজনের

বিরুদ্ধিতা করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে প্রসিদ্ধ চার মাযহাব সহ বহু মাযহাব তৈরি হয়। ইখতিলাফ রহমত। এরকম ইখতিলাফ দোষনীয় নয়, বরং প্রশংসনীয়। একজন আরেকজনের ভিন্ন মতের উপর আমল করলেও আল্লাহ তা'আলা উভয়কেই সাওয়াব দান করবেন। কিন্তু ইজতিহাদ ও মাসায়েলের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সাহাবাদের আপোষে ঈমানি জোড় মিল মহব্বত ও আমীরের ইতায়াত যোল আনায় বিদ্যমান ছিল। ঈমান ও উসূলে দ্বীনের ব্যাপারে সবাই একমত ছিল। অনুরূপ ইমামগণের আপোষেও জোড় মিল মহব্বত ছিল। সুতরাং মুহতারাম মাওলানা উপরোক্ত কথাটি বলে থাকলে ফুরুয়ী (শাখাগত) মাসায়েলের ক্ষেত্রে সাহাবিগণের ভিন্নতার কথা বলে থাকতে পারেন। কিন্তু অভিযোগকারী বুঝতে পারেননি বোধ হয়। এই জন্যেই তিনি ভুল আন্দায়ে ভুলভাবে উনার কথা উল্লেখ করেছেন।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

মওদুদী সাহেব না থাকলেও সমস্যা নেই, সা'আদ সাহেবের মত যোগ্য স্থলাবিধিক্ত বিদ্যমান রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

১. فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
২. يُوَثِّرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
৩. وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
৪. أَشْدَاءَ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءَ بَيْنَهُمْ

মাওলানার বক্তব্য উল্লেখিত আয়াতগুলোর বিরুদ্ধে নয় ?

মন্তব্যের জবাব :

উল্লেখিত আয়াতগুলোর টুকরাগুলোতে ঈমানি জোড় মিল মহব্বত ও আপোষে ভাই ভাই হয়ে চলা, রহম করা এবং কাফেরদের বেলায় কঠোরতা অবলম্বন করা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। এসব তো সাহাবাদের সিফাত, এগুলোই যিন্দা করার মেহনতের নাম দাওয়াত ও তাবলিগ। অভিযোগকারী মুহতারাম মাওলানার কথা ভুল আন্দায়ে বুঝার কারণে ভুলভাবে দলিল উপস্থাপন করলেন। ফুরুয়ী (শাখাগত) মাসায়েলের ক্ষেত্রে সাহাবাদের ইখতিলাফ তো আমাদের জন্য রহমত। এক্ষেত্রে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধী ছিল, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কুরআন ও হাদিসসমূহে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

- (১) সূরা হাশরের ৫ নং আয়াতের শানে নুযূল ও তাফসির প্রমাণ করে দ্বীনের ফুরুয়ী বিষয়ে সাহাবাদের ইখতিলাফ ছিল। (বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই)
- (২) আমীন জোরে বলা ও আন্তে বলার ইখতিলাফ তাদের মাঝে ছিল।
- (৩) রফয়ে ইয়াদাইন করা, না করার ইখতিলাফ তাদের মধ্যে ছিল।
- (৪) বুকে হাত বাধা, নাকি নাভির নিচে হাত বাধা, এই ইখতিলাফও ছিল।
- (৫) বিতর এক রাকাত, তিন রাকাত, পাঁচ রাকাত ইত্যাদির ইখতিলাফও ছিল।
- (৬) আমীর কে হবে এই নিয়ে তাদের মধ্যে ইখতিলাফ ছিল।

নমুনা হিসাবে ৬ টি উদাহরণ দেওয়া হলো, নতুবা হাজার হাজার মাসায়েলের ক্ষেত্রে হাজার হাজার ইখতিলাফ ছিল। আর সেই ইখতিলাফের উপর ভিত্তি করেই তাবয়ীদের মাঝে ইখতিলাফ দেখা দেয়। অসংখ্য মাযহাব তৈরি হয়। পরবর্তীতে চারটি মাযহাব প্রসিদ্ধি পায়। হাদিসে আছে, নবী বলেছেন, আমার উম্মতের উলামায়ে কেরামের ইখতিলাফ রহমত। তবে মনে রাখবেন, আহলে হকগণ ঈমান ও দ্বীনের উসূলের উপর সবাই

একমত ছিলেন। আশা করি আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা বুঝতে পেরেছেন, মুহতারাম মাওলানা কী বলতে চেয়েছেন আর অভিযোগকারী মাওলানার কথাকে নিজের মত উল্লেখ করে ভুলভাবে কী বুঝিয়েছেন।

২৪. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

হিদায়াতের সম্পর্ক যদি আল্লাহর হাতে হতো, তাহলে নবী পাঠাতেন না।

তাকসিল :

প্রিয় পাঠক, হেদায়াতের মালিক আল্লাহ তা'আলা। তিনি যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন এবং যাকে চান তাকে গুমরাহ করেন। কিন্তু হেদায়াত দেওয়া বা সবকিছুর জন্য দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর একটা 'আদাত' বা 'সুনাত' রেখেছেন। তিনি হেদায়াত কাদের করবেন, পবিত্র কুরআনে আছে, **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا** মর্মার্থঃ যারা মুজাহাদা করবে তাদেরকে তিনি হিদায়াত দিবেন। আরেক জায়গায় আছে, **يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يَنْبِي** মর্মার্থঃ নবীকে মানলে হিদায়াত পাবে। আরেক জায়গায় আছে, **تَطِيعُهُ تَهْتَدُوا** মর্মার্থঃ যারা আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে চায় তাদেরকে আল্লাহ কাছে যাওয়ার হিদায়াত দিবেন। অন্যত্র আছে, **مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ** মর্মার্থঃ যারা নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানবে তাদের দ্বারা আল্লাহকে মানা হয়ে গেল। অর্থাৎ যারা আল্লাহর কাছে চাইবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দিবেন। যারা আল্লাহর হিদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার ইচ্ছা করবে, আল্লাহর কাছে চাইবে, মেহনত মুজাহাদা করবে, আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত পাওয়ার পদ্ধতিগুলো মেনে চলবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হিদায়াত দিবেন। মনে রাখতে হবে, এসবকিছুর তাওফিকও আল্লাহ তা'আলাই দিবেন। আরেকটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার সুনাত ও আদত মোতাবিক রিয়ক, হেদায়াত ইত্যাদি সবকিছু দেন। কিন্তু তিনি এই সুনাত ও আদতের মুহতাজ নন। এই সুনাত ও আদত ছাড়াও দিতে পারেন। তিনি সর্বময় ক্ষমাতার অধিকারী। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে হিদায়াত পেতে হলে নবীকে মানতে হবে, হেদায়াতের রাস্তায় চলতে হবে, হেদায়াতের জন্য দুআ করতে হবে এবং মেহনত মুজাহাদা করতে হবে। ঘরে বসে থাকলে হবে না। আল্লাহই রিয়ক দেন। কিন্তু রিয়কের জন্য ঘরে বসে থাকার বৈধতা কোনো আলেম দেন না। স্বাভাবিক দুনিয়ার রীতি অনুযায়ী আমরা রিয়ক তালাশ করি, আল্লাহ তা'আলাও তালাশ করতে বলেছেন, এইভাবেই আল্লাহ তা'আলা রিয়ক দেন। এটাই আল্লাহ তা'আলার আদত ও সুনাত। অনুরূপ হেদায়াত পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে তরিকা বাতলে দিয়েছেন সে তরিকা অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহর হিদায়াতের আশায় শুধু ঘরে বসে থাকলে হবে না। হেদায়াতের রাস্তায় হাটতেও হবে। এটাই হেদায়াত প্রদানের আদত বা সুনাত। বিনা মেহনতে আল্লাহ তা'আলা যদি হেদায়াত করতেনই তাহলে মেহনতের নবী কেন পাঠালেন? মানবার জন্য কিতাব কেন নাযিল করলেন?

মাওলানা মনজুর নোমানি রহ. লিখেছেন,

মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলেছেন,

আল্লাহ তা'আলার নিয়ম হলো এইযে যদি ওনার সাহায্যের উপর ভরসা করে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি তবে তিনি আমাদেরকে চেষ্টা এবং হরকতের মধ্যে স্থায়ী সাহায্যকে সংযুক্ত করে দেন। **ويزدكم قوة إلى قوتكم** “তোমাদের শক্তির সাথে আরও শক্তি বাড়িয়ে দেন” (সূরা হুদ, ৫২ নং আয়াতের একটি অংশ)। এই আয়াতে সেই দিকেই ইশারা করা হয়েছে। নিজেকে সম্পূর্ণ বেকার মনে করে বসে থাকা হলো ‘জাবরিয়াত’ এবং নিজেরই শক্তির উপর ভরসা করা হলো ‘কাদরিয়াত’ (এই দুইটাই গুমরাহি)। আর সহিহ ইসলাম হলো এই দুই মতবাদের মধ্যবর্তী পন্থা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পরিশ্রম ও কষ্ট করার যে সামান্যতম শক্তি এবং যোগ্যতা দান করেছেন আল্লাহ তা'আলার হুকুম পূরা করার মধ্যে তাকে পূর্ণ মাত্রায় লাগিয়ে দেই এবং

তার মধ্যে কোনো ত্রুটি না করি। কিন্তু কাজের ফলাফলের ব্যাপারে নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় ও দুর্বল মনে করি এবং শুধু আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের উপর ভরসা করি। হুযুর সা. এর জীবনের আদর্শ হতে এটাই আমরা শিক্ষা পাই। সমস্ত মুসলমানদের খিদমতে এটাই আমাদের দাওয়াত।

(মালফূজাত : মাওলানা ইলিয়াস রহ. মালফূজ নং-১২৫)

প্রিয় পাঠক, জানিনা আমরা আপনাকে মুহতারাম মাওলানার কথার উদ্দেশ্য বুঝাতে পারছি কিনা। অভিযোগকারী যদি মুহতারাম মাওলানার কথা পরিবর্তন না করে হুবহু উল্লেখ করতেন কিংবা পুরো বয়ান আপনি শুনতেন, তাহলে কেউই বিভ্রান্ত হতো না।

এ বিষয়ে মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দবঃবাঃ) এর সাথে এক মাওলানার কথোপকথনের একটা লেখা আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তরজমা করে আপনাদের কাছে পেশ করছি-

মাওলানা : আপনি হাদি (হেদায়াত দানকারী) কাকে মানেন ?

মুহতারাম মাওলানা : আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতকে।

মাওলানা : এটা কেমন কথা যে, হেদায়াত আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাতে নেই ?

মুহতারাম মাওলানা : আমার কথা এইটা যে, “হেদায়াত দেওয়ার আল্লাহর এখানে একটা তরিকা ও নিয়ম নির্ধারণ করা আছে, অর্থাৎ ‘إِنَابَةٌ إِلَى اللَّهِ , اجتهاد في الدين’ ইত্যাদি। আর আল্লাহ তা'আলা আপন তরিকার খেলাফ হেদায়াত দেন না। যদি আল্লাহ তা'আলার এখানে কোনো মানুষের মেহনত এবং চেষ্টা ছাড়া হেদায়াত দেওয়া মানজুর হতো তাহলে আশিয়া আ. এর প্রেরণের কী জরুরত ছিল? হযরত আশিয়া আ. ওই মেহনতের তরিকা বয়ান করার জন্য এবং ওই দিকেই ডাকার জন্য প্রেরিত হয়েছেন, যাতে আল্লাহ তা'আলা আপন ওয়াদা পূরা করে দেন এবং মানুষদেরকে হেদায়াত দেন।

তাছাড়া যদি (একথাগুলো) প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু কমতি হয়ে যায়, যার থেকে কোনো মানুষ পবিত্র নয়, তাহলে আমি এই জন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর যদি কোনো মানুষের আমার কথার দ্বারা গলত ফাহাম (ভুল বুঝ) হয়ে থাকে তাহলে সে যেন বুঝে নেয় যে, যে ব্যক্তিই আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতকে হাদি (হেদায়াত দানকারী) মানে না সে ব্যক্তি আমার মতেও ضال ও مضل অর্থাৎ গুমরাহ ও গুমরাহ-করনে-ওয়ালা।

প্রিয় পাঠক, তারপরও কি বুঝমান কোনো সাথী বিভ্রান্ত হতে পারে! কত সুন্দর কথা, আমাদের সালাফ-খলাপ সবাই এরকম কথাই বলে গেছেন। অভিযোগকারীর জানা দরকার, বিকৃত করে, কাট করে কথা উপস্থাপন করলে সবাই বিভ্রান্ত হবে না। কপাল যাদের খারাপ তারাই তাহকিক ছাড়া সবার কথাই বিশ্বাস করে। নিজামুদ্দিনের দরজা সবার জন্যই উন্মুক্ত, আমাদের কথার সত্যতা সেখানে গিয়ে যাচাই করতে পারেন। তাহকিক ছাড়া কারো কথায় জীবনের তারতিব পাল্টানো বড় বোকামি!

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, *إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ* - কুরআন মাজীদেৱ শতাব্দীক আয়াতে প্রমাণিত যে, হোদায়াত আল্লাহর হাতে এবং ইহা ইসলামের একটি মৌলিক আকিদা, কিন্তু সা'আদ সাহেব তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন।

মন্তব্যের জবাব :

মুহতারাম মাওলানার কথাগুলো নিজের মত উপস্থাপন করে মনগড়া বুঝে মনগড়া ফতুয়া দিলে কিন্তু ফতুয়া উল্টো দিকে চলে যেতে পারে। শাহ ওয়ালি মুহাদ্দিসে দেহলভি রহ. হুসাইন আহমদ মাদনি রহ. ও সিন্দি রহ. প্রমুখ আমাদের আকাবির হযরতগণের উপরও এক জামাত আহলে হক ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে কাফির ফতুয়া জারি করা হয়েছিল। তাই বলে ওনারা কেউই কাফির হয়ে যাননি, জগত বিখ্যাত আলেম ছিলেন। একটি আয়াতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে ঈমান থাকে না, বেঈমান হয়ে যায়। অভিযোগকারীর মন্তব্য, মুহতারাম মাওলানা নাকি শতাব্দীক আয়াতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, তাহলে কি তিনি বেঈমান? ইতিহাস প্রমাণ করে, যফর আহমদ উসমানি রহ. লিখেছেন, যিনি মুজাদ্দিদ হবেন তিনি নাকি বিরুদ্ধীদের পক্ষ থেকে বেঈমান ও কুফুরির ফতুয়া পেতে হয়। প্রিয় পাঠক, আমরা জানি, ভুল ফতুয়ার বিভ্রান্তির শিকার তারাই হয় যাদের কপাল খারাপ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাজত করুন।

২৫. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

কুরআন শরিফ বুঝে শুনে তিলাওয়াত করা ওয়াজিব। তরজমা না জেনে তিলাওয়াত করলে তরকে ওয়াজিবের গুনাহ হবে।

তাকসিল :

عن عمر بن الخطاب يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ قَالَ: إِذَا مَرَّ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَإِذَا مَرَّ بِذِكْرِ النَّارِ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

হযরত উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তারা (সাহাবাগণ) কুরআন শরিফকে যথার্থভাবে তিলাওয়াত করতেন (সূরা বাকারা, আয়াত নং-১২১), তিনি বলেন, যখন কেউ তিলাওয়াত করতে করতে জান্নাতের আলোচনা অতিক্রম করতো তখন আল্লাহর কাছে জান্নাত চেয়ে নিতো, জাহান্নামের আলোচনা অতিক্রম করলে তখন আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চেয়ে নিতো। (ইবনে কাসির)

এই ছিল সাহাবাদের তিলাওয়াত, অর্থ না জানলে এরকম তিলাওয়াত করা যায় না।

যথার্থ তিলাওয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাম কুরতুবি বলেন,

إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى يَرْتَلُونَ أَلْفَاظَهُ ، وَيَفْهَمُونَ مَعَانِيَهُ ، فَإِنْ بَفْهَمِ الْمَعْنَى يَكُونُ الْإِتْبَاعُ لِمَنْ وَفَّقَ

তারা তারতীলের সাথে কুরআনের শব্দগুলো তিলাওয়াত করতেন এবং তার অর্থসমূহ বুঝতেন। কেননা, অর্থ বুঝার দ্বারাই আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে তাওফিক দিবেন তারা অনুসরণ করতে পারেন।

في مجموع فتاوي ابن تيمية 248\4
وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب على كل أحد، لكن يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم معانيه ويعرف من السنة ما يحتاج إليه

ফাতুয়ায়ে ইবনে তাইমিয়ার মধ্যে আছে,

অর্থঃ সমস্ত কুরআন মুখস্থ করা এবং কুরআন শরিফের সব অর্থসমূহ বুঝা এবং সমস্ত সুন্নত জানা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব নয়। কিন্তু বান্দার উপর ওয়াজিব হলো কুরআন শরিফের প্রয়োজনীয় অংশ মুখস্থ করা ও তার অর্থ জানা এবং সুন্নতের প্রয়োজনীয় অংশ জেনে নেওয়া।

আল্লামা ইবনে আশুর রহ. তার তাফসিরের কিতাবে লিখেন,

وقد ذكر فقهاؤنا في آداب قراءة القرآن أن التفهم مع قلة القراءة أفضل من كثرة القراءة بلا تفهم، قال الغزالي في الإحياء التدبر في قراءته إعادة النظر في الآية والتفهم أن يستوضح من كل آية ما يليق بها كي تتكشف له من الأسرار معان مكنونة لا تتكشف إلا للموقنين قال: ومن موانع الفهم أن يكون قد قرأ تفسيراً واعتقد أن لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن ابن عباس وابن مجاهد، وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي فهذا من الحجب العظيمة

আমাদের ফুকাহাগণ কুরআন তিলাওয়াতের আদাবের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেন যে, বুঝে বুঝে ও উপলব্ধি করে কম তিলাওয়াত করা না বুঝে, না উপলব্ধি করে অধিক তিলাওয়াত করার চাইতে উত্তম। ইমাম গাযালি 'এহইয়াতে' বলেন, কুরআনের তিলাওয়াতে ফিকির ও تدبر (চিন্তা-ভাবনা) এর অর্থ আয়াতে বার বার দৃষ্টি দেওয়া এবং প্রতিটি আয়াতের যা শান ও উপযুক্ত তা স্পষ্ট করে বুঝার চেষ্টা করা। যাতে করে আয়াতের গোপন রহস্য থেকে আবৃত ভাব ও অর্থ বের হয়ে আসে। আর এটি আল্লাহ তা'আলার তাওফিকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট ছাড়া আর কারো কাছে বেরিয়ে আসে না। তিনি বলেন, কুরআন বুঝার এক প্রতিবন্ধিকতা হলো, কেউ কোনো একটা তাফসির পড়লো আর বিশ্বাস করে নিলো, ইবনে আব্বাস, ইবনে মুজাহিদ প্রমুখ উনাদের থেকে যা বর্ণিত তা ছাড়া কুরআনের শব্দগুলোর আর কোনো অর্থই নেই, এছাড়া যা আছে এসব تفسير بالرأي। এইটা হলো (কুরআনের অর্থ না বুঝার) বড় প্রতিবন্ধকতা সমূহের একটি। (২/৩২)

ফুয়াইল বিন ইয়ায রহ. বলতেন, 'কুরআন তো নাযিল হয়েছে সে অনুযায়ী আমল করার জন্যই। কিন্তু মানুষ উহার তিলাওয়াত করাকেই আমল হিসেবে ধরে নিয়েছে।'

হযরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি কি তোমাদিগকে বিচক্ষণ আলেম সম্পর্কে বলিব না? যে ব্যক্তি লোকদেরকে আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ করে না, তাহাদিগকে আল্লাহর নাফরমানির প্রতি প্রশংসা দেয় না, আল্লাহর আযাব হইতে নির্ভীক করে না, এবং কোনো জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কুরআনকে পরিত্যাগ করে না। এলম ব্যতীত এবাদতে কোনো মঙ্গল নেই। বুঝ ব্যতীত এলমে কোনো মঙ্গল নেই। অপর রেওয়াযাতে আছে, পরহেজগারী ব্যতীত এলমে কোনো মঙ্গল নেই। (অর্থের প্রতি) গভীর ভাবে চিন্তা ব্যতীত কেরাআতে কোনো মঙ্গল নেই। (কানযুল উম্মাল)

(মাওলানা যুবায়ের সাহেব অনূদিত হায়াতুস সাহাবাহ, ৪/৫৬৯)

শাইখুল হাদিস যাকারিয়া রহ. ‘ফাযায়েলে কুরআনে’ অর্থসহ কুরআন শরিফ পড়ার তাকিদে ইমাম গাযালি রহ. এর কওল নকল করে একটি হাদিসের খুব হৃদয়গ্রাহী তাফসিল করেছেন :

হযরত উবায়দা মুলাইকী রাদি. থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, হে কুরআন ওয়ালাগন! তোমরা কুরআন শরিফের সহিত টেক লাগাইও না। রাত্রিদিন কুরআনের হুক আদায় করে তিলাওয়াত করো। কুরআন পাকের প্রচার প্রসার করো। এবং উহাকে মধুর সুরে তিলাওয়াত করো। উহার অর্থের মধ্যে চিন্তা ফিকির করো। যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পারো। দুনিয়াতে উহার বদলা চাইও না। আখিরাতে উহার জন্য বড় বদলা ও প্রতিদান রহিয়াছে। (বাইহাকিঃ শুয়াবাল ঈমান)

এই হাদিসে কয়েকটি হুকুম রহিয়াছে,

৫ নং- উহার অর্থের প্রতি চিন্তা করো। ইমাম গাযালি রহ. উনার এহইয়উল উলূম কিতাবে তাওরাত হতে নকল করেন, আল্লাহ তা’আলা বলিতেছেন, হে বান্দা! তোমার কি আমাকে লজ্জা হয় না? রাত্তায় চলতে চলতে তোমার নিকট কোনো বন্ধুর পত্র পৌছিলে তৎক্ষণাত তুমি থামিয়া যাও। পথের পাশে বসিয়া গভীর ভাবে পড়িতে থাকো। একেকটি শব্দের উপর চিন্তা ফিকির করো। আর আমার কিতাব তোমার নিকট পৌছে, উহাতে আমি সবকিছু স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বার বার উল্লেখ করিয়াছি। যাহাতে তুমি উহার মধ্যে চিন্তা ভাবনা করতে পারো। অথচ তুমি উহাকে বেপরওয়াভাবে উড়াইয়া দাও। তবে কি আমি তোমার নিকট তোমার বন্ধুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে গেলাম? হে আমার বান্দা! তোমার কোনো বন্ধু যখন তোমার সহিত বসিয়া কথা বলে, তখন তুমি আপাদমস্তক সেই দিকে মগ্ন হইয়া যাও। কান পাতিয়া শুনো। গভীর ভাবে চিন্তা করো। কথার মাঝখানে অন্য কেউ কথা বলতে চাইলে ইশারায় তাহাকে থামাইয়া দাও, কথা বলতে নিষেধ করো। আমি তোমার সহিত আমার কালামের মাধ্যমে কথা বলি অথচ তুমি একটুও ভ্রম্বেপ করো না। তবে কি আমি তোমার বন্ধুর চেয়েও নিকৃষ্ট?

৬ নং- কুরআনের বদলা দুনিয়াতে চাইও না। অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াত করিয়া কোনো বিনিময় গ্রহণ করিও না। আখিরাতে উহার জন্য অনেক বড় প্রতিদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। দুনিয়াতে উহার বদলা গ্রহণ করা হইলে এমনি হইল যেমন কেহ টাকার পরিবর্তে কড়ির উপরে সম্ভ্রষ্ট হইয়া গেল।

(ফাযায়েলে কুরআন, পৃষ্ঠা-২৫০, ২৫২)

প্রিয় পাঠক,

কিতাবাদি ঘাটলে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব ওলামায়ে কেরাম কুরআন বুঝে বুঝে পড়ার প্রতি খুব গুরুত্ব দিতেন।

সালাফ-খলাফদের এই নুরানি পথ ধরেই মুহতারাম মাওলানা প্রত্যহ কুরআন শরিফ তিলাওয়াত করার জন্য জোর তাকিদ দিয়ে থাকেন। তরজমাসহ বুঝে-শুনে তিলাওয়াত করার জন্যও অনেক গুরুত্ব প্রদান করেন। মাঝেমাঝে আলি রাদি. এর এই উক্তিটিও নকল করেন।

আমভাবে উম্মতের কী পরিমাণ জাহালাত ও কুরআন শরিফের সাথে তাদের কতটুকু সম্পর্ক, এসব আমাদের সবার জানা। এই জন্যে মুহতারাম মাওলানা আমভাবে প্রয়োজনীয় ইলমকে যিন্দা করার জন্য কুরআন তাফসিরের হালকায় বসতে বলেন, আলেম-উলামাদের মাজলিসকে নিজেদের উপর লায়েম করে নিতে বলেন। তিনি বলেন, প্রত্যহ কুরআন তিলাওয়াত এবং অর্থসহ তিলাওয়াত খুবই জরুরী ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে তিনি শাইখুল হিন্দ রহ. এর তরজমা ও তাফসির পড়ার জন্য বলে থাকেন।

কিন্তু অর্থসহ তিলাওয়াতের উপর মুহতারাম মাওলানার খুব গুরুত্ব দেওয়া এবং প্রয়োজনীয়তা বুঝানোর জন্য ওয়াজিব শব্দ বলাতে, এইটাকে অভিযোগকারী ফিকহি ওয়াজিব বলে ব্যক্ত করে উনার একটা ভুল দাঁড় করালেন। সব জরুরীকে ফিকহি ওয়াজিব বলে ব্যক্ত করা বড় ভুল। তিনি যে ওয়াজিব বলেছেন, উনার এই ওয়াজিবের অর্থ জরুরী ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কীয় উনার সব কথা প্রমাণ করে, অর্থ সহ কুরআন তিলাওয়াতের উপর গুরুত্ব দেওয়াই উনার উদ্দেশ্য। সব ওয়াজিবকে ফিকহি ওয়াজিব ভাবা চরম ভুল। তাজবিদের কিতাবে পড়েছি, নূনে মিম্মে তাশদীদ হলে ওয়াজিব গুনাহ হয়। তাজবিদের এই ওয়াজিব ফিকহি

ওয়াজিব নয়। বরং তিলাওয়াতকে সুন্দর করার জন্য এই গুনাহ খুবই জরুরী। অনুরূপ কুরআন শরিফের সাথে উম্মতের কী পরিমান দূরত্ব, সবারই জানা। এই দূরত্ব দূর করার জন্য কুরআন তিলাওয়াত এবং অর্থ সহ তিলাওয়াতের উপর গুরুত্ব দেওয়াকে যদি ওয়াজিব বলে ব্যক্তও করে থাকেন, সে ওয়াজিব গুরুত্ব ও জরুরীর অর্থে হবে। ফিকহি ওয়াজিব নয়।

তাছাড়া আমাদের কাছে এই কাগজ পৌঁছেছে, যেখানে তিনি ওয়াজিবের কওল থেকে রুজু করেছেন। প্রিয় পাঠক, ফিকহি ওয়াজিব এবং গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝানোর নিমিত্তে ওয়াজিব, এই দুই ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য না করতে পারায় এবং মুহতারাম মাওলানার সব বয়ান ও মেযাজ অভিযোগকারীদের কাছে না থাকায় ভুল বুঝাবুঝি ও বিশৃঙ্খলা জন্ম নিয়েছে। এই জন্যে মাওলানা রুজুও করেছেন। নতুবা এইটি রুজু হওয়ার মত কোনো বিষয়ই নয়। মুহতারাম মাওলানার রুজু হওয়ার পর যারা এই নিয়ে বলাবলি করে এদের উদ্দেশ্য ভালো নয়।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

ঠিকই, তবে ইসলামের ওয়াজিব নয়, দ্বীনে সা'আদের ওয়াজিব। সা'আদ সাহেব নিজের অজানার কারণে গুনাহের নতুন কাঠমো তৈরি করছেন। ইহা মওদুদী ও আহলে হাদিসের আকিদা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নয়।

মন্তব্যের জবাব :

মন্তব্যটি পড়ে মনে পড়লো মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর কথা, মালফূজাতে পড়েছি, তিনি বড় দুঃখে বলেছিলেন, “আজ تعلقات محمدية অর্থাৎ মুহাম্মাদি সম্পর্কগুলো মূর্দা হয়ে গেছে”। স্থূল দৃষ্টির মানুষগুলো মুহাম্মাদি দ্বীনের কথা বুঝতে পারে না। নববী পরিবেশের আবহ সবার মন ছুঁয়ে যায় না। বিশ্রী অসুন্দর প্রেমাস্পদের মধ্যে কী মজা প্রেমহীন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না। বেচারী প্রেমিককে পাগল বলে তার সব কথা উড়িয়ে দেয়।

মুহতারাম মাওলানা কুরআন শরিফের তিলাওয়াত ও বুঝে-শুনে তিলাওয়াত যেটা সাহাবাগণের সুন্নত, তার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া ও জরুরী বলাতে কত কিছু হয়ে যাচ্ছে। ফিকহি ওয়াজিবের অপবাদ দিয়ে দ্বীনে মুহাম্মাদিকে দ্বীনে সা'আদ অবলীলায় বলে দিচ্ছে। এরকম দুঃসাহসের মেযাজ যদি আমাদের আকাবির, তারও আগে মুজতাহিদ ও ইমামগণের মধ্যে থাকতো মুহাম্মাদি দ্বীন খান খান হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দ্বীনে মুহাম্মাদিকে কায়েম রাখবেন। এই জন্যে মুহাম্মাদি মেযাজের কিছু মানুষ হর যামানায়ও রাখবেন। প্রিয় পাঠক, যাদের কথাবার্তা, চাল-চলন, আমল আখলাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার প্রাণপ্রিয় সাহাবাগণের সাথে অধীক মিলে তাদের জামাতে থাকার চেষ্টা করবেন, আর কিছু বলার নেই, এটাই সবার প্রতি আমাদের পরামর্শ। সুস্থ বিবেক দিয়ে নিজেও হক, না হক চেনার চেষ্টা করবেন এবং অন্যদেরও জানিয়ে দিবেন।

২৬. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

আপনাদের কাছে সবচাইতে বড় গুনাহ চুরি, যিনা, ঠিকই এটা বড় গুনাহ, তবে তার চাইতে বড় গুনাহ হলো খুরুজ না হওয়া। তাই হযরত কা'ব ইবনে মালেকের সাথে ৫০ দিন পর্যন্ত কথাবার্তা বন্ধ রাখা হয়।

তাকসিল :

দাওয়াত ইল্লাহ তা'আলার হুকুম ও হাসান লি আইনিহি অর্থাৎ সত্তাগতভাবে ভালো। দাওয়াতের একটা পর্যায় 'জিহাদ' ও 'কিতাল'।

পাকিস্তানের মুরব্বি ভাই আব্দুল ওয়াহাব বলেছেন,

দ্বিতীয় হযরতজি মাওলানা ইউসুফ রহ. বলতেন,

দাওয়াত না দেওয়া এত বড় গুনাহ, এত বড় গুনাহ যে, দাওয়াতের জন্য খুরাজ না হলে কুরআন শরিফে এত বড় ধমকি এসেছে, আর কোনো গুনাহের ব্যাপারে কুরআন শরিফে এত বড় ধমকি আসেনি। আযাব দেওয়ার ঘোষণা এসেছে এবং এই জাতিকে ধ্বংস করে নতুন জাতি সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে।

إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থঃ তোমরা যদি আল্লাহর রাস্তায় বের না হও তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বেদনাদায়ক কঠিন আযাবে শ্রেফতার করবেন এবং তোমাদেরকে পাল্টিয়ে অন্য জাতি নিয়ে আসবেন। তোমরা আল্লাহ তা'আলার সামান্য ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

(সূরা তাওবা, আয়াত নং-৩৯)

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

অর্থঃ হে নবী বলুন, তোমাদের বাপদাদাগণ, তোমাদের সন্তানগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের আত্মীয়-স্বজনগণ এবং তোমাদের অর্জিত সম্পদসমূহ, লসের ভয় করো তোমাদের এমন ব্যবসা এবং তোমাদের পছন্দনীয় মিসকিনগণ যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের চেয়েও বেশি পছন্দনীয় হয় তাহলে তোমরা আল্লাহ তার আদেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করো। আর আল্লাহ তা'আলা ফাসেক কওমকে হিদায়াত করেন না।

(সূরা তাওবা, আয়াত নং-২৪)

আয়াত দুটির অর্থে কিতাল ও জিহাদ কথা তো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। কিতাল ও জিহাদের প্রথম পর্যায় দাওয়াত। আমাদের ওলামায়ে কেরাম আয়াতের ব্যাপকতায় দাওয়াতের জন্য খুরাজ হওয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

মাওলান ইলিয়াস রহ. বলতেন, যার মাফহুম এরকম,

এখন বড় থেকে বড় কোনো আমলই দাওয়াতের আমলের বিকল্প হতে পারে না।

সার্বিক বিবেচনায় মুহতারাম মাওলানা যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত দিয়ে দিয়ে সাহাবাদের জামাত তৈরি করছিলেন। নবীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে প্রত্যেক সাহাবাই দাওয়াতের কাজ করেছেন। আমভাবে দাওয়াত ও জিহাদের আমলকেই সাহাবায়ে কেরাম অনেক বড় জানতেন। উনাদের নজরে দাওয়াত ও জিহাদ তথা দ্বীনের নুসরতকে নিজেদের জান-মালের কুরবানি, আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হয়ে স্ত্রীকে বিধবা, সন্তানদেরকে এতিম করে দেওয়াও অনেক সহজ ছিল। পবিত্র কুরআন শরিফে চুরি যিনার কথা দুই এক জায়গা রয়েছে। কিন্তু দাওয়াত ও জিহাদের আলোচনা পুরো কুরআন শরিফে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। আল্লাহর নবী অসংখ্য হাদিসে সর্বোত্তম আমল হিসাবে দাওয়াত ও জিহাদকে উল্লেখ করেছেন। নবী ও সাহাবাদের দিকে নজর দিলে চোখে ভেসে উঠে যে, উনাদের গোটা জীবন দাওয়াত ও জিহাদ কেন্দ্রিক ছিল। স্থবীর জীবন উনাদের ছিল না। খাইরুল কুরান তথা শ্রেষ্ঠ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো

দাওয়াত ও খুরুজ ফি সাবিলিল্লাহর ফসল। উম্মত বিশ্ব দরবারে মাথা উচু করে দাড়িয়েছিল এই দাওয়াত ও খুরুজ-জিহাদের কারণেই। উম্মতের মাথা আবার নিচু হয়েছে যখন থেকে উম্মত এই কাজ ছেড়ে দিয়েছে। খেলাফত ধ্বংশের মূল কারণই উম্মতের আগের মত সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, দাওয়াত ও জিহাদের জন্য আল্লাহর রাস্তায় জামাত পাঠানো ছেড়ে দেওয়া। বর্তমান যামনায় আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে দাওয়াত দেওয়া এত জরুরী যে, মুসলমানদের আমির যদি বলে থাকেন, দাওয়াত ও আল্লাহর রাস্তায় খুরুজ হওয়া চুরি যিনার চাইতে অনেক বড় গুনাহ, তাহলে তিনি ঠিকই বলেছেন।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

ইহা সা'আদ সাহেবের নতুন দ্বীন। খুরুজ না হওয়া যে চুরি যিনা থেকে বড় কবীরা গুনাহ, তা কুরআন-হাদিসে কোথাও পাওয়া যায়নি। যদি তাই হয় তবে চোরের শাস্তি হাত কাটা বটে খুরুজ না হলে কোন অঙ্গ কাটতে হবে? পৃথিবীর যত মানুষ দাওয়াত তাবলিগের কাজ করে না তারা ব্যাবিচারী ও চোরের চেয়ে নিকৃষ্ট? নাউযুবিল্লাহ!

মন্তব্যের জবাব :

এটা মুহতারামা মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর নতুন দ্বীন নয়, বরং সহিহ হাদিসে খুরুজ না হওয়ার কারণে ৫০ দিন পর্যন্ত অহুদের জিহাদ সহ পরবর্তী সকল জিহাদে অংশগ্রহণকারী সাহাবি হযরত কা'আব বিন মালিক রাদি. সহ তিন সাহাবির সাথে কথা বন্ধ রাখার ঘটনা বর্ণিত আছে এবং ৫০ দিন পর উনাদের তাওবা কবুল হওয়ার ঘোষণা করা হয়।

আল্লামা ইবনে জারির তুবারি রহ. উল্লেখ করেন, আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الربا سبعون حوبًا أهونها مثل وقوع الرجل على أمه

(অর্থঃ) সুদের সত্তরটা গুনাহ রয়েছে, সবচে ছোট গুনাহ, কোনো ব্যক্তি নিজের মায়ের সাথে যিনায় লিপ্ত হওয়ার মতো।

এজাতীয় রেওয়ায়াত ইবনে মাজাহ, তাবরানি, বাইহাকি ও মুস্তাদরাক লিল হাকিম এর মধ্যেও আছে।

প্রিয় পাঠক, অভিযোগকারীর কথা মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা যদি গুনাহ বড় ছোট হওয়ার মাপকাঠি হয় তাহলে সুদের সত্তরটা গুনাহ, ছোট গুনাহটি যদি হয় যিনা করা, তাও আবার নিজের মায়ের সাথে, তাহলে এরকম সত্তরটি গুনাহের সমষ্টি সুদের শাস্তি কী হতে পারে এবং সুদের জন্য কতটি অঙ্গ কর্তন করতে হবে? আসল কথা হলো, হাত কাটা আর না কাটা বড় গুনাহ হওয়ার মাপকাঠি নয়। এই জন্যে সত্তরটি যিনার চাইতেও বড় গুনাহ সুদের জন্য ইসলামে হাত কাটা বা সপ্তেসারে বিধান নেই। সুতরাং ইসলামে যেটাকে বড় বলেছে সেটা বড় হবে শাস্তি হিসাবে হাত কাটা থাক বা না থাক।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের মূল ভিত্তি নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এসব ফরজ তরককারীর জন্য ইসলামে কোনো হুদুদাতের বিধান নেই। তাহলে কী এসব ফরজ তরক করা ছোট গুনাহ হয়ে গেল?

আর দাওয়াত তরক করার গুনাহই ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক জীবনে এসব গুনাহকে জন্ম দেয়। তাহলে দাওয়াত তরককারী নিকৃষ্টতম হবে না?

২৭. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

যিকিরের অর্থ আল্লাহ আল্লাহ বা অন্যান্য তসবিহাত পড়া নয়, যিকিরের আসল অর্থ আল্লাহর আলোচনা করা।

তাকসিল :

আল্লামা রাগেব আসফাহানি রহ. (মৃত-৫০২ হি.) তাঁর 'মুফরাদাত' কিতাবে উল্লেখ করেন, 'যিকির' কখনো অন্তরের ওই অবস্থাকে বুঝায় যার দ্বারা মানুষ পূর্ব পরিচিত কিছুকে ইয়াদ করতে পারে। 'যিকির' এর অর্থঃ অন্তরে কোনোকিছুকে হাজির করা কিংবা যবানে কোনো কিছু বলা বা আলোচনা করা। আল্লামা মানাবি রহ. (মৃত-১০৩১ হি.) প্রায় একই কথা বলেছেন। আল্লামা যুবাইদি রহ. (মৃত-১২০৫ হি.) সুন্দর একটি কথা নকল করেছেন, 'নিস্‌ইয়ান' অর্থাৎ ভুলের বিপরীত ইয়াদের অর্থে যিকির শব্দটি আসে এবং 'সাম্ত' অর্থাৎ নীরবতার বিপরীত আলোচনার অর্থেও যিকির শব্দটি আসে। (তাজুল উরুস-২/২২২)

সুতরাং আল্লাহর যিকির মানে আল্লাহর আলোচনা, এই হলো যিকিরের আসল অর্থ। পবিত্র কুরআন শরিফে 'যিকির' শব্দটি প্রায় ৬৭ জায়গায় এসেছে। আর এসব জায়গার মধ্যে যিকির শব্দটির দ্বারা মুফাস্সিরিনে কেরাম কোথাও কুরআন, কোথাও দ্বীন-শরিয়ত, কোথাও আল্লাহ তা'আলার পাঠানো অহি, কোথাও ইবাদত ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কিন্তু কুরআন শরিফের কোনো জায়গায় যিকির শব্দটি আল্লাহ আল্লাহ ও অন্যান্য শব্দগত অজিফার অর্থে আসেনি। তবে হাদিসে বর্ণিত বিভিন্ন সময়ের অসংখ্য দুআ ও সকল তাসবিহ-তাহলিলকেও যিকির বলা হয়। হাদিসে বর্ণিত এই সব লাফজি বা শব্দগত যিকিরকে মুহতারাম মাওলানা অস্বিকার করেননি। বরং তিনি প্রায় বয়ানেই এবং সব সময় মাসনূন যিকিরের কথা বলে যাচ্ছেন। মাসনূন যিকিরের ফাজায়েল শুনাচ্ছেন। এখানে ওনার শুধু যিকিরের আসল অর্থটি বয়ান করা উদ্দেশ্য ছিল। আল্লাহর স্মরণ ও আলোচনা, এই আসল অর্থের কারনেই কুরআন তিলাওয়াত, নামায, রোজা ইত্যাদি আল্লাহর প্রতিটি হুকুমকেই যিকির বলা হয়। বয়ান নসিহতের মজলিসকেও যিকিরের মজলিস বলা হয়। যার মধ্যে আল্লাহর হুকুম নেই তার মধ্যে আল্লাহর যিকির নয়। যিকিরের আসল অর্থ ও যিকিরের ব্যাপকতার বর্ণনা করাই ছিল ওনার উদ্দেশ্য। হাদিসে বর্ণিত লাফজি বা শব্দগত যিকিরসমূহ অস্বিকার করার উদ্দেশ্য ছিল না। যে সব মাসনূন যিকিরের উপর তিনি অবিরাম আমল করে যাচ্ছেন এবং সব সময় উম্মতকে এই সব যিকিরের উপর উঠানোর জন্য বলছেন ও ফিকির করে যাচ্ছেন তিনি তা কিভাবে অস্বিকার করবেন। একথা কোনো বুঝমান অস্বিকার করতে পারবে না।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

ইহা সা'আদ সাহেবের ভ্রান্ত মতবাদ। প্রচুর আয়াত ও হাদিসে বর্ণিত সব তাসবিহাত ও যিকিরকে তিনি অস্বিকার করলেন ইলম না থাকার কারণে। হাদিসের কিতাবাদিতে তাসবিহাত ও যিকিরের পরিস্কার অধ্যায় রয়েছে।

মন্তব্যের জবাব :

এটা মুহতারাম মাওলানার ভ্রান্ত মতবাদ নয়। উম্মতে মুসলিমার অতীত ও বর্তমানের সমস্ত ওলামা ও ফুকাহায়ে কেরাম, ইমাম, মুজতাহিদ ও মুফাসসির সকলের সিদ্ধান্ত। এমন কোনো কথা বলা ঠিক নয় যার কারণে সাহাবা, তাবিয়ী, ইমাম, মুজতাহিদ, ফকিহ ও যাবতীয় ওলামায়ে কেরামের প্রতি গলত ও জাহালাতের ইলযাম পড়ে যায়।

২৮. অভিযোগকারীর ভাষায় মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

কথা পৌছিয়ে দেয়া দীনের দাওয়াত নয়, বরং স্বশরিরে গিয়ে দাওয়াত দেওয়া, অন্তরে কথা বসিয়ে দেয়া হল দাওয়াত প্রচার মাধ্যমে দাওয়াত দিলে দায়িত্ব আদায় হবে না।

তাকসিল :

মুহতারাম মাওলানা কত সুন্দর কথা বলেছেন। সাহাবা-ওয়ালা দাওয়াতের সাথে মিলিয়ে বলেছেন। যে দাওয়াতের তা'সির বেশি, হরকত ও মেহনত করে সাহাবাদের মত মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে যে দাওয়াত সে দাওয়াতের কথা বলেছেন।

মাওলানা মনজুর নোমানি রহ. লিখেছেন,

হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলতেন, “ বহুত লোক এটা বুঝে থাকে যে, ব্যস, পৌছিয়ে দেওয়ার নাম তাবলিগ। এটা বড় ভুল বুঝ। তাবলিগ হলো, নিজের সামর্থ্য এবং যোগ্যতার সীমা পর্যন্ত লোকদেরকে দ্বীনের কথা এইভাবে পৌছিয়ে দেওয়া যেভাবে পৌছানোর দ্বারা লোকদের মানার আশা হয়। আম্বিয়া আ. এই তাবলিগই নিয়ে এসেছেন।”

(‘উর্দু মালফুজাত’ মাওলানা ইলিয়াস রহ. মালফুজ নং-২০০)

সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. লিখেছেন,

হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলতেন, “দ্বীনি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জামা'আত নিয়ে বের হওয়া ছেড়ে দিয়েছি। অথচ এটাই ছিলো আমাদের জীবনের মৌলিক কাজ। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও দাওয়াত নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে যেতেন এবং যিনিই উনার হাতে বাইয়াত হতেন তিনিও একই উদ্দেশ্যের মজলু হয়ে ঘুরে বেড়াতেন।”

(মাও. আবু তাহের মেছবার অনুদিত “দ্বীনি দাওয়াত” পৃষ্ঠা-২৫১)

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

তাহলে পারস্য ও রোমের বাদশাদের কাছে রাসূল সা. চিঠির মাধ্যমে যে দাওয়াত দিলেন, হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয ও মুজাদ্দিদে আলফে ছানী গংরা চিঠির মাধ্যমে যে দাওয়াত দিলেন তাতে কি দাওয়াতের দায়িত্ব আদায় হয়নি ?

মন্তব্যের জবাব :

রোম ও পারস্যের বাদশাদের কাছে তিনি শুধু চিঠি পাঠাননি। চিঠির সাথে অমলি নমুনা হিসাবে দায়ী সাহাবিদেরকেও পাঠিয়ে ছিলেন। উমর বিন আব্দুল আযিয ও মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ. ওনারা চিঠির মাধ্যমে নসিহত, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি পাঠিয়েছেন। দাওয়াতের ভিত্তি এর উপর রাখেননি।

২৯. অভিযোগকারীর ভাষায় মাওলানা সা'আদ সাহেবের ভুল :

দাওয়াত আগে ইবাদত পরে, দেখুন, আযান আগে নামায তার পরে।

তাকসিল :

মুহতারাম মাওলানা ঠিকই বলেছেন, প্রথমে দাওয়াতের হুকুমই নাযিল হয়েছে। আল্লাহর নবী প্রথমে দাওয়াতের কাজই করেছেন। যারা নবীর কাছ থেকে ঈমান গ্রহণ করেছেন সে সকল সাহাবিগণও দাওয়াত দিয়েছেন। নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ও অন্যান্য ইবাদাত পরবর্তীতে নাযিল হয়েছে। এই জন্য অনেক উলামায়ে কেরাম দাওয়াতকে أم الفرائض অর্থাৎ সকল ফরজের মা হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

আযান নামাযের পূর্বে হয় এজন্য একথা ঠিক নয় যে, দাওয়াত প্রথম আর ইবাদত পরে, বরং নামায প্রথম ফরয হয়েছে আযান অনেক পরে আসছে। তাহলে কি যারা তাবলিগ করে না তাদের নামায হয় না?

মন্তব্যের জবাব :

হাস্যকর মন্তব্য! দাওয়াত আগে, ইবাদত পরে, আযান আগে, নামায পরে এ কথা থেকে তাবলিগ যারা করে না তাদের নামায হবে না, এই মাসআলা কিভাবে উদ্ঘাটন করলেন? ওই কথার সাথে এই কথার কী সম্পর্ক? এটাতো কিয়াস মাআল ফারেক্ব (অযৌক্তিক তুলনা)। আযান একটা দাওয়াত, আবার ইবাদতও। নামায একটা ইবাদত। আযান দেওয়া সুন্নাত। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরজ। নামাযের আগে আযান দেওয়া হয়। তাই ইবাদতের আগে দাওয়াত। এটা একটা বাস্তব কথা। আযান ও নামাযের মধ্যে নামায পরে, এর মানে অস্তিত্বে আসার দিক থেকে পরে, হুকুমের দিক থেকে আযান সুন্নত, নামায ফরজ। যেমন, সালাম সুন্নত, সালামের জবাব ওয়াজিব। এখানে সালামের সুন্নত না আসলে ওয়াজিব অস্তিত্বই আসবে না।

৩০. অভিযোগকারীর ভাষায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

তাওবা কবুলের তিনটি শর্ত মানুষ জানে, কিন্তু চতুর্থ শর্ত আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, মানুষ ভুলে গেছে।

তাকসিল :

প্রশিক্ষ মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহ. তাঁর ঐতিহাসিক বুখারি শরিফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারিতে একশ' জনের হত্যাকারীর তাওবা সম্বলিত হাদিসের ব্যাখ্যা শেষে উল্লেখ করেন,

وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلك إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة بها وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه ولهذا قال له الأخير ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية والتحول منها كلها

অর্থঃ এই হাদিসের মধ্যে মানুষ যে স্থানে গুনাহ লিপ্ত হয় সে স্থান ত্যাগ করার ফজিলত পাওয়া যায়। কেননা, স্বাভাবিক নিয়মের আলোকে বলা যায় যে, সে স্থানে থাকলে ওই রকম কাজের কাছে সে আবার পরাভূত হয়ে যেতে পারে। এই কারণে যে, তার পূর্বের সংঘটিত হওয়া কাজের কথা মনে পড়বে এবং এর দ্বারা আবার ফেৎনায় পড়বে। অথবা সেখানে এমন কোনো ব্যক্তি থাকতে পারে যে তাকে এরকম কাজ করার জন্য সাহায্য করবে ও উৎসাহ দিবে। এই জন্যেই (হাদিসে) শেষ ব্যক্তি (অর্থাৎ আলেম) তাকে এই বলেছিল যে, তুমি তোমার ভূ-খন্ডে ফিরে যেও না। কেননা, সেটা খারাপ জায়গা। সুতরাং এর মধ্যেও এই দিকে ইংগিত রয়েছে যে, তাওবাকারীর উচিত গুনাহকালীন সময়ে সে সমস্ত অবস্থার অভ্যাস তার হয়ে গিয়েছিল সে সমস্ত অবস্থা থেকে পৃথক থাকা এবং সেই সমস্ত থেকে দূরে সরে যাওয়া।

প্রিয় পাঠক, মুহতারাম মাওলানাও কোনো কোনো বয়ানে এই হাদিসের উপর বয়ান করে শেষে বলে থাকেন 'তাকমিলে তাওবা' অর্থাৎ তাওবার পূর্ণতার জন্য চতুর্থ শর্ত হলো আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া। কত সুন্দর কথা, পূর্বকার বড় বড় মুহাদ্দিসগণের কথার মত কথা। অর্থাৎ বর্তমানে তাওবাকারী গুনাহের জায়গা ত্যাগ করে নেকির পরিবেশে, মসজিদের পরিবেশে, ইসালাহের মেহনতে তথা আল্লাহর রাস্তায় বের হলে তাওবার উপর ইস্তিকামাত সম্ভব হবে। আমল শুধরাবে। মুহতারাম মাওলানা একদম সঠিক কথা বলেছেন। ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এর কথার মতই কথা বলেছেন। তাওবাকারীর গুনাহের স্থান ত্যাগ করে আল্লাহর রাস্তায় বের হবে। সর্বোত্তম পরামর্শ।

আসল কথা হলো, তাওবার শর্ত (১) সংঘটিত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, (২) পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করা, এবং (৩) আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া, এই তিনটি শর্তই বলতে হবে, হাদিসের ইবারত থেকে আরও কোনো শর্ত পাওয়া গেলে সেগুলো বলা যাবে না, চারটি শর্ত বলা যাবে না, পাঁচটি শর্ত বলা যাবে না, তিনটিই বলতে হবে, এরকম জেদী ও একগেয়েমি মনোভাব আমাদের মুহাদ্দিসিন, মুফাসসিরিন, মুসান্নিফিন, মুজাতাহিদিন এবং উলামা ফুকাহাদের মধ্যে ছিল না। উনাদের কাছে কুরআনের আয়াত ও হাদিসের ইবারত থেকে কোনো কিছু জাহের হলে অকপটে বলে দিতেন বা কিতাবে লিখে ফেলতেন এবং একজন আরেক জনের মতকে খুব সম্মানের সাথে উল্লেখ করতেন।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহ. আরও একটু পরে গিয়ে উল্লেখ করেন,

وزاد بعض من أدركناه في شروط التوبة أموراً أخرى منها ان يفارق موضع المعصية وان لا يصل في آخر عمره إلى الغرغرة وان لا تطلع الشمس من مغربها وان لا يعود إلى ذلك الذنب فان عاد إليه بان ان توبته باطلة قلت والأول مستحب والثاني والثالث داخلان في حد التكليف والرابع الأخير عزی للقاضي أبي بكر الباقلاني ويرده الحديث

অর্থঃ আমি যাদেরকে পেয়েছি উনাদের অনেকেই তাওবার শর্তসমূহের ব্যাপারে আরও অতিরিক্ত কিছু শর্তের কথা বলেন। যেমন, (১) গুনাহের জায়গা থেকে পৃথক হওয়া। (২) তাওবাকারী জীবনের শেষ প্রাশ্বে গরগরা পর্যন্ত না পৌছা। (৩) সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় না হওয়া। (৪) ওই গুনাহ পুনরায় না করা। যদি পুনরায় করে তাহলে তারা তাওবা বাতিল।

(ইবনে আসকালানি রহ. বলেন) আমি বলি, প্রথম শর্তটি মুস্তাহাব। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তটি (এহণযোগ্য) অর্থাৎ ‘হাদে তাকলিফে’ প্রবিষ্ট। অর্থাৎ অবশ্যই পালনীয় ও অনুসরণীয়। চতুর্থ শর্তটিকে কাজি আবু বকর আল বাকিল্লানি রহ. দিকে সম্পৃক্তি করা হয়। কিন্তু নবীর হাদিস এই শর্তটিকে প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং প্রত্যাখ্যাত শর্তটি বাদে আমরা এখানে মোট ৩ টি শর্ত পেলাম। এর প্রথমটিই হলো এইটা যেটা মুহতারাম মাওলানা উল্লেখ করে থাকেন। সর্বোমোট শর্ত পেলাম, এখন ৩, আগের ৩ টি মোট ৬ টি।

ঐতিহাসিক এই গ্রন্থে তিনি আরও উল্লেখ করেন,

عن عبد الله بن المبارك في شروط التوبة زيادة فقال الندم والعزم على عدم العود ورد المظلمة وأداء ما ضيع من الفرائض وان يعمد إلى البدن الذي رباه بالسحت فيذيبه بالهم والحزن حتى ينشأ له لحم طيب وان يذيق نفسه الم الطاعة كما اذاقها لذة المعصية قلت وبعض هذه الأشياء مكملات

অর্থঃ তাওবার শর্তসমূহের ব্যাপারে মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. থেকে অতিরিক্ত আরও কিছু শর্ত বর্ণিত আছে। ইবনে মুবারক রহ. বলেন, (১) গুনাহ হয়ে যাওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে লজ্জিত হওয়া। (২) পুনরায় না করার উপর দৃঢ় প্রত্যয় করা। (৩) জুলুমের প্রতিকার করা। (৪) যেসব ফরজ সে নষ্ট করেছে সেগুলো আদায় করা। (৫) হারাম দ্বারা যে শরিরটাকে লালন করেছে সে শরিরের প্রতি মনোনিবেশন করা, চিন্তা, পেরেশানি করে এই শরিরটাকে গলিয়ে দেওয়া, যেন নতুন করে পবিত্র গোশত নিয়ে আবার বেড়ে উঠতে পারে। (৬) নেক কাজ করার কষ্টের স্বাদ নফসকে দেওয়া, যেরকম নফসকে গুনাহের স্বাদ দিয়েছিল। (আল্লামা ইবনে হাজার রহ. বলেন,) আমি বলি, এসবগুলোর মধ্যে কিছু কিছু হলো তাকমিলে তাওবা অর্থাৎ তাওবার পূর্ণতার শর্ত।

প্রিয় পাঠক, একটু চিন্তা করে দেখেন, তাকমিলে তাওবা অর্থাৎ তাওবার পূর্ণতা ও তাওবার উপর মজবুত থাকার জন্য চতুর্থ শর্ত গুনাহের স্থান ত্যাগ করে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার কথা বলে মুহতারাম মাওলানা কোনো ভুল করেননি। উনারটা ভুল হলে ইবনে হাজার রহ. সহ এসব বড় বড় মুহাদ্দিস ইমাম ফকিহ সবাই ভুল করে গেছেন। আমরা সহ বাংলাদেশের অসংখ্য উলামায়ে কেরাম, ভারতের বড় বড় মাদ্রাসার হাজার হাজার উলামায়ে কেরাম, আরবের, পশ্চিম বিশ্বের, পূর্ব বিশ্বের উত্তর বিশ্বের, দক্ষিণ বিশ্বের লক্ষ লক্ষ উলামায়ে কেরাম ভুল করছেন? আর গোটা দুনিয়ার মধ্যে কিছু অভিযোগকারীই সঠিক? আল্লাহ আমাদের বুঝার তাওফিক দান করুন।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

তাওবা কবুলের চতুর্থ শর্ত ছাড়া, তাবিয়ীন, উলামা ও মুহাদ্দিছীন কেউ জানলেন না, মাওলানা এই শর্ত কোন আয়াত বা হাদিসে পেলেন?

মন্তব্যের জবাব :

অজ্ঞতাপূর্ণ মন্তব্য, প্রিয় পাঠক, চতুর্থ শর্তটির কথা এই প্রথম মুহতারাম মাওলানাই বলেননি। তাঁর বহুত আগে বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাদের কিতাবে উল্লেখ করে গেছেন। আর তিনি বললেন, কেউ জানে না। এর চাইতে বেশি কিছু লেখার প্রয়োজন মনে করছি না। তাফসিলে কিছু লেখা হলো। সচেতন ব্যক্তি সজাগ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

৩১. অভিযোগকারীর ভাষায় মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

খারিজী লুকমা গ্রহণযোগ্য নয়, খারিজী লুকমা গ্রহণ করলে নামায ফাসিদ হয়ে যায়।

তাফসিল :

মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেব ঠিকই বলেছেন। খারিজী লুকমা গ্রহণযোগ্য নয়। নামাযের বাইরের কেউ লুকমা দিলে ইমাম সে লুকমা গ্রহণ করলে ইমাম, মুআজ্জিন, মুক্তাদি সকলের নামায নষ্ট হয়ে যাবে। নামাযের ভিতরের কেউ লুকমা দিতে হবে।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

উলামায়ে কেরাম মাওলানার ভুল ধরলেন, তাঁকে এবং উম্মতকে গুনাহ থেকে রক্ষা করার জন্য, তাই তাঁর গুরুরিয়া আদায় করার কথা ছিলো। পক্ষান্তরে তিনি খারিজী লুকমা গ্রহণ করা যাবে না বলে তা প্রত্যক্ষান করলেন।

মন্তব্যের জবাব :

মন্তব্যকারীকে বলতে চাই, কোনো জামাতের কোনো ব্যক্তিবর্গের বয়ান ফিকির উসূল আদাবের ব্যাপারে লুকমা দিতে হলে উক্ত ব্যক্তিবর্গ ও জামাতের ভিতরে ঢুকে হাকিকত উদঘাটন করে ভুল ধরতে হয়। ব্যক্তি ও জামাত থেকে বাইরে থেকে হাকিকত উদঘাটন করা যায় না। এমতাবস্থায় ভুল ধরতে গেলে নিজেদেরই ভুল হয়ে যায়, যা সচেতন উলামায়ে কেরাম বুঝতে পারছেন এবং বর্তমানে যা ঘটছে তারই সাক্ষ্য বহন করছে। যা অদূর ভবিষ্যতের জন্য ইতিহাস হয়ে থাকবে।

অভিযোগকারীর ‘উলামায়ে কেরাম মাওলানার ভুল ধরেছেন’ না বলে কিছু উলামায়ে কেরাম ভুল ধরেছেন, বলার দরকার ছিল। কেননা, মুহতারাম মাওলানা ও উনার মুহিব্বিন সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ উলামায়ে কেরামকে উলামায়ে কেরামের জামাত থেকে বাদ দিতে পারেন না। আমাদের বাংলাদেশের শুধু ঢাকাতেই হাজার হাজার

উলামায়ে কেরাম ও মুফতিয়ানে ইজাম রয়েছে। যারা বলছেন, মুহতারাম মাওলানা কোনো ভুল করেননি। মুহতারাম মাওলানাই পুরানো এই মেহনতকে পুরানো আদর্শে রাখতে চাইছেন।

৩২. অভিযোগকারীর ভাষায় মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ভুল :

আসহাবে কাহাফের সাথে বাঘ ছিল , কুকুর নয়।

তাকসিল :

(1) في تفسير البغوي

أكثر أهل التفسير على أنه كان من جنس الكلاب. وروي عن ابن جريج: أنه كان أسداً وسمى الأسد كلباً فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي لهب فقال: "اللهم سلط عليه كلباً من كلابك" فافتترسه أسد صححه الحاكم في المستدرک: 2 / 539 ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 4 / 39

(১) আল্লামা বাগাভি রহ. তার তাকসিরের কিতাবে উল্লেখ করেন,

অধিকাংশ মুফাসসিরগণ এ মতের উপর যে, (আসহাবে কাহাফের সাথে যে প্রাণীটি ছিল) সেটি কুকুর জাতের ছিল। আল্লামা ইবনে জুরাইজ রহ. থেকে বর্ণিত, সেটি বাঘ ছিল। আর أسد কে এখানে কلب এর নাম দেওয়া হয়েছে। আর এটা এই জন্যে যে, নবী সা. উতবা ইবনে আবু লাহাবের বিরুদ্ধে বদদুআ করে বললেন, اللهم سلط عليه كلباً من كلابك হে আল্লাহ, তুমি তার উপর তোমার কلب (কুকুর) সমূহের কোনো একটি কلب (কুকুর) ধাবিয়ে দাও। অতপর তাকে একটা বাঘ বা সিংহ ছুঁ মেরে নিয়ে গেল। এ হাদিসটিকে আল্লামা হাকিম রহ. তার মুস্তাদরাক কিতাবে সহিহ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন, (২/৫৩৯)। আল্লামা যাহাবি রহ.ও সহিহ বলেছেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি ফাতহুল বারিতে এ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন, (৪/৩৯)।

(2) في تفسير روح البيان

قال في "حياة الحيوان" أكثر أهل التفسير على أن كلب أهل الكهف كان من جنس الكلاب. وروي عن ابن جريج أنه قال: كان أسداً ويسمى الأسد كلباً لأن النبي عليه السلام دعا على عتبة بن أبي لهب أن يسلط الله عليه كلباً من كلابه فأكله الأسد

(২) তাকসিরে রুহুল বয়ানে আছে, হায়াতুল হায়ানে আছে,

অধিকাংশ মুফাসসির এ মতের উপর যে, আহলে কাহাফের কুকুরটি কুকুর জাতীয় ছিল। আল্লামা ইবনে জুরাইজ রহ. থেকে বর্ণিত, সেটি বাঘ/সিংহ ছিল। আর أسد কে এখানে কلب এর নাম দেওয়া হয়েছে। আর এটা এই জন্যে যে, নবী সা. উতবা ইবনে আবু লাহাবের বিরুদ্ধে বদদুআ করে বললেন, اللهم سلط عليه كلباً

من كلابك हे आल्लाह, तूमि तार उपर तौमार क्लब (कुकुर) समूहेर कोनो एकटि क्लब (कुकुर) धाबिये दाओ । अतपर ताके एकटा बाघ वा सिंह थेये फेललौ ।

(3) في تفسير محمود الالوسي

وقيل كان أنمر وروي ذلك عن ابن عباس ، وقيل غير ذلك ، ... وزعم بعضهم أن المراد بالكلب هنا الأسد وهو على ما في «القاموس» أحد معانيه

(3) आल्लामा आलुसि रूहल मा'आनिते बलैन,

कतक उलमा मने करेन, एखाने क्लब एर द्वारा उद्देश्य बाघ । अभिधान मते क्लब एर अर्थसमूहेर एकटि अर्थ बाघ/सिंह ।

(4) في تفسير الطبري

فقال بعضهم: هو كلب من كلابهم كان معهم ، وقد ذكرنا كثيرا ممن قال ذلك فيما مضى ، وقال بعضهم: كان إنسانا من الناس طبأخا لهم تبعهم.

(8) आल्लामा त्रुवारि रह. तार ताफसिरेर किताबे उल्लेख करेन,

कतक उलामाये केराम बलैन, सेटि तादेर कुकुरसमूहेर एकटि कुकुर येटा तादेर साथे छिल । एरकम यारा बलैन तादेर उक्ति पिछने खुब বেশि उल्लेख करेछि । आर कतक उलामाये केराम बलैन, सेटा मानुषेर मध्य थेके एकटा मानुष छिल । तादेर बारुचि, ये तादेर अनुसरण करेन ।

(5) في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المتوفى 671

أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقة ،...وقالت فرقة : لم يكن كلبا حقيقة ، وإنما كان أحدهم ، وكان قد قعد عند باب الغار طليعة لهم كما سمي النجم التابع للجوزاء كلبا ؛ لأنه منها كالكلب من الإنسان

(५) आल्लामा कुरतुबि रह. तार ताफसिरेर किताबे उल्लेख करेन,

अधिकांश मुफाससिर एर उपर ये, सेटि हाकिकि कुकुर छिल । ... आरेक उलामा बलैन, सेटि हाकिकि कुकुर छिल ना । सेटा तादेरई एकजन । आर से गर्तेर दरजाय बसेछिल ।

(6) في تفسير الماوردي

وكلبهم باسِطٌ ذراعيه بالوصيد (في) كلبهم قولان : أحدهما : أنه كلب من الكلاب كان معهم ، وهو قول الجمهور . وقيل إن اسمه كان حمران . الثاني : أنه إنسان من الناس كان طبأخاً لهم تبعهم ، وقيل بل كان راعياً

(৬) তাফসিরে মাওয়ারদিতে আছে,

তাদের كلب এর ব্যাপারে দুটি উক্তি রয়েছে। এক, সেটি কুকুরসমূহের একটি কুকুর ছিল যেটি তাদের সাথে ছিল। আর এটা জমহুরের উক্তি। কেউ বলেছেন, এর নাম হামরান। দুই, সেটি মানুষের মধ্য থেকে একটা মানুষ ছিল। সে তাদের বাবুর্চি ছিল এবং তাদের অনুসরণ করেছিল। কেউ বলেন, সে রাখাল ছিল।

(7) في الدر المنثور وفي تفسير ابن أبي حاتم الرازي المتوفى 327

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : قلت لرجل من أهل العلم : زعموا أن كلبهم كان أسدا قال لعمر الله ما كان أسدا ولكنه كان كلبا أحمر خرجوا به من بيوتهم يقال له قطمور

(৭) তাফসিরে দুররে মানসূর ও তাফসিরে ইবনে হাতেম রাযিতে আছে,

ইবনে মুনজির ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি একজন আহলে ইলমকে বললাম, অনেক উলামায়ে কেরাম মনে করেন, তাদের كلب টি ছিল বাঘ। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, সেটা বাঘ ছিল না। কিন্তু সেটা ছিল লাল কুকুর। তারা সেটাকে নিয়ে তাদের ঘর থেকে বের হয়েছিল। সেটার নাম ‘কিতমির’ বলা হয়।

উপরে উল্লেখিত তাফসিরগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি, আসহাবে কাহাফের সাথে যে প্রাণীটা ছিল তার ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়। ১. কুকুর, এটি অধিকাংশ মুফাসসিরদের মত। ২. বাঘ, এটি একদল উলমাদের মত। ৩. মানুষ, এটি কতক মুফাসসিরদের মত।

মুহতারাম মাওলানা আল্লামা ইবনে জুরাইজ রহ. ও একদল উলামাদের উক্তি নকল করেছেন। আর আল্লামা ইবনে জুরাইজ রহ. সাধারণ কোনো মানুষ নয়। তিনি হরমে মক্কার বড় ফকিহ এবং উনার যুগে উনি আহলে হেযাজের ইমাম। জন্ম ৮০ হিজরিতে এবং মৃত্যু ১৫০ হিজরিতে। কোনো মুফাসসিরের তাফসির নকল করা কি অপরাধ? শুধু জমহুরের তাফসির নকল করা যাবে, অন্য কারো তাফসির নকল করা যাবে না। এমন কথা কি কোনো আলেম বলতে পারে। কারো কাছে কোনো মুফাসসিরের তাফসির ভাল লাগতেই পারে, এতে আমরা কোনো খারাপি দেখি না।

অভিযোগকারীর মন্তব্য :

وكلبهم باسط نراعيه بالوصيد

কুরআন মাজিদে কুকুরের কথা বলা হয়েছে।

মন্তব্যের জবাব :

কুরআন শরিফে কুকুর বলা হয়েছে নাকি বাঘ বলা হয়েছে তাফসিরের কিতাব ঘাটাঘাটি করে আমরা তিনটি মত পাই। অধিকাংশের রায় কুকুর, সমস্ত উলামাদের রায় কুকুর নয়। হয়তো অভিযোগকারী মুহতারাম মাওলানাকে দোষারোপ করার জন্যই দুটি মত গোপন রেখে একটি মত প্রকাশ করে উম্মতের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে চাইছিলেন। মাওলানার জেনে রাখা দরকার, সারা দুনিয়ার সকল যোগ্য সাথীরা এবং বিশ্বব্যাপী উলামাদের এক বিশাল জামাত মুহতারাম মাওলানা সা’আদ (দাঃবাঃ) এর অন্ধ অনুসরণ করছে না। বুঝে শুনে

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হক উপলব্ধি করেই তাঁকে অনুসরণ করে যাচ্ছে এবং আমৃত্যু অনুসরণ করে যাবেন।
ইনশা-আল্লাহ।

لله الحمد في النهاية كما في البداية

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

অনেকের মুখে ও বিভিন্ন কাগজ পত্রে আরও কিছু অভিযোগ মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর নামে প্রচারিত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এখন আমরা এই অভিযোগগুলোর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

১ নং অভিযোগ :

তাবলিগ না করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না।

তাফসিল :

প্রথমত বলতে চাই, এইভাবে কাটছাট করে বয়ান বিকৃত করার প্রবণতা যাদের মধ্যে রয়েছে তাদের উদ্দেশ্য কী? **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ** কী? অর্থঃ হে ঈমানদারগণ তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতের পুরো অংশ গোপন রেখে আয়াতের এই প্রথমার্শ প্রকাশ করে যে সাধক ও ভক্তপীর ইসলাম সম্পর্কে সহজ সরল মুসলমানদেরকে ভুল ধারণা দিচ্ছে আমাদের দৃষ্টিতে তারা ওই সাধকের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় যারা বয়ান বিকৃত করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। যদি কুরআন শরিফের পুরো আয়াত পেশ করা হতো তাহলে কারো কোনো প্রশ্ন জাগতো না। পূর্ণ আয়াতটি হলো,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى অর্থঃ হে ঈমানদারগণ তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না নেশাগ্রস্ত ও মাতাল অবস্থায়।

অনুরূপভাবে যদি মুহতারাম মাওলানার পূর্ণ বয়ান শুনতাম তাহলে আমাদেরও কোনো প্রশ্ন জাগতো না। কেননা, তিনি নতুন কোনো কথা বলেন না। তাবলিগের পূর্ব তিন আমীরের কথা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেন মাত্র।

দ্বিতীয়ত, তারপরও তো খন্ড বক্তব্যের এই অংশটুকুর অর্থও তো ভুল নয়। তাবলিগ করার হুকুম তো কুরআন শরিফে রয়েছে। **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ** অর্থঃ হে রসূল, আপনার কাছে আপনার রবে পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তার তাবলিগ করুন, অর্থাৎ তা পৌঁছিয়ে দিন (সূরা মায়িদা, ৬৭ নং আয়াতের প্রথমার্শ)। তাবলিগ করার জন্য নবী সা. এর হুকুমও রয়েছে। **بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً** অর্থঃ যদিও একটি আয়াত হয়, আমার পক্ষ থেকে তাবলিগ করো (বুখারি)। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম পালন না করে জান্নাতে যাবে কি করে?

তৃতীয়ত, যারা দ্বীনের কোনো শু'বায় সবসময় ডুবে থাকেন, দাওয়াত ও তাবলিগের মত মহান কাজ যে কাজ সমস্ত নবীগণ জীবন ওয়াকফ দিয়ে করে গেছেন, আমাদের নবী ও সাহাবাগণ বিলাসি জীবন পরিত্যাগ করে যে কাজের জন্য হরকত ও মেহনত ওয়ালা জীবন গ্রহন করেছেন, এই কাজে যারা সারাক্ষণ নিমগ্ন থাকেন ওনাদের যবান থেকে যদি বের হয় ঈমানহীনতার শ্রোতে ভাসমান ও দুনিয়ার সুখ শান্তি আরাম আয়েশের জীবনে বিভোর মানুষদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বের করার নিমিত্তে এবং দরদমাখা তরগিব ও তারহিবের সাথেই বের হয় এই কথা যে, তাবলিগ করো, তাবলিগ না করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। তাবলিগে গেলে ঈমান ও আমল যিন্দা হবে। তাহলে ওনাদের যবান থেকে দোষের কোনো কথা বের হয়েছে কেউ বলতে পারবে না।

২ নং অভিযোগ :

বাংলোওয়ালি মসজিদে ফরজ নামাযের পর হাত উঠিয়ে দুআ করার এহতেমাম তিনি করেন না। কারণ, অনেক বার দেখা গেছে দুআ না করে তিনি উঠে চলে গেছেন।

তাফসিল :

জাহিলি মন্তব্য। মাঝেমধ্যে ফরজ নামাযের পর হাত উঠিয়ে দুআ না করে উঠে যেতে দেখা যাওয়ায় প্রমান করে উম্মতকে আমলিভাবে সুন্নতের তালিম দিয়ে যাচ্ছেন। কারণ, ফরজ নামাযের পর ইজতেমায়ীভাবে ইমাম মুসল্লি মিলে দুআ করার যে প্রচলন আমাদের দেশে রয়েছে কুরআন হাদিসে নবী ও সাহাবাদের আমলে এমন সময় এরকমভাবে দুআ করার কোনো প্রচলন ছিল না। আমাদের দেশে ফরজ নামাযের পর দুআ করার যে বাধ্যবাধকতা দেখা যায় এবং জনসাধারণের মধ্যে এই দুআর প্রতি তাদের যে আবশ্যিকতা দেখা যায় এসবকিছু প্রমান করে এরকমভাবে এই দুআ করা বিদআত ও নাযায়েজ।

হাদিসের মধ্যে ফরজ নামাযের পর দুআ কবুল হওয়ার কথা বলা হয়েছে, এর ব্যাখ্যা হলো, ফরজ নামাযের পর মাসনুন যেসব দুআ রয়েছে সেগুলো আদায় করা, কিংবা যে যার মত করে আল্লাহ তা'আলার কাছে দুআ করা এবং এই দুআকে আবশ্যিক মনে না করা। মুস্তাহাব মনে করা এবং মুস্তাহাবের উপর সবসময়, কোনো দিন না ছেড়ে আমল না করা। মাঝেমধ্যে ছেড়ে দেওয়া। মানুষ যেন এটাকে আবশ্যিক মনে না করে।

অভিযোগকারীর ভুল ধরা দেখে মনে হচ্ছে সে হয়তো একজন বিদআতি হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইজতিমাগুলো, মক্কা-মদিনা, বিভিন্ন মাদ্রাসাগুলোতেও তো ফরজ নামাযের পর সবসময় এহতেমামের সাথে ইজতেমায়ীভাবে দুআ করা হয় না, তাহলে এই অভিযোগকারী কি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইজতিমা, মক্কা-মদিনা ও বিভিন্ন মাদ্রাসাগুলোকে ভুল বলবেন?

৩ নং অভিযোগ :

যেরকম সমস্ত জিনিস ছেড়ে নামাযের জন্য নামায আদায়ের জায়গা মসজিদে আসা জরুরী। এভাবে মাশওয়ারার জন্য আসা জরুরী। যেভাবে আলাদাভাবে নামায নেই, সেরকমভাবে আলাদা মাশওয়ারা নেই। যেকরম এক মসজিদে দুই নামায নেই, একই নামাযে অংশগ্রহণ করতে হবে। এরকমই মাশওয়ারা। নিজেদের মাশওয়ারাকে সুন্নাতের আলোকে, সীরতের আলোকে সাজাও।

তাফসিল :

وَأْمُرُهُمْ سُورَىٰ بَيْنَهُمْ অর্থঃ তাদের মাঝে তাদের বিষয় পরামর্শভিত্তিক হতো। (সূরা শূরা, ৩৮ নং আয়াতের একাংশ) মাশওয়ারা করা সাহাবাদের বড় সিফাত ছিল, যার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজ যে মাশওয়ারাভিত্তিক হতো সে কথা উল্লেখ করেছেন। মাশওয়ারা করার আদেশ কুরআন শরিফেও রয়েছে।

وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأُمْرِ অর্থঃ আপনি তাদের সাথে মাশওয়ারা করুন। (আল ইমরান, ১৫৯ নং আয়াতের একাংশ) কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই উম্মত আস্তে আস্তে আল্লাহর কাছে প্রশংসিত সাহাবাওয়ালা সিফাত মাশওয়ারাকে ভুলতে শুরু করেছে। দীন কায়েমের জন্য মাশওয়ারা অত্যন্ত জরুরী। সাহাবাদের সময়ে মসজিদে মাশওয়ারা হতো। মাশওয়ারার জন্য মসজিদে আসতে বলা, উম্মতকে মাশওয়ারা উপর ওঠানোর জন্য জোর তাকিদ দেওয়া কি গুরুতর অন্যায়! এক মসজিদে এক জামাতেই নামায হয়। আলাদাভাবে হয় না। অনুরূপ এক মসজিদে মাশওয়ারা এক জামাতেই হবে। মাশওয়ারা উদ্দেশ্যই বলা হয়ে থাকে 'জোড় - মিল - মহব্বত'। অভিযোগকারীর কথা মত মুহতারাম মাওলানা মাশওয়ারাকে সীরত-সুন্নতের আলোকে সাজানোর কথা বলেছেন। এতে বুঝা যায় ওনার উদ্দেশ্য সুন্নত। কারো কাছে যদি কোনো কিছু সুন্নতের খেলাফ মনে হয় আমীরের কাছে প্রকাশ করবে। ইসলামের তরিকায় ইসলাম করবে। ইসলামে বিশৃঙ্খলার সুযোগ নেই।

৪ নং অভিযোগ :

সীরতের মধ্যে আছে, মাশওয়ারা ইস্তেযামি বিষয়ের জন্য । হুযুর সাব্বান্নাহু আলাইহি ওয়া সাব্বাম যুদ্ধগুলোর ব্যাপারে মাশওয়ারা করতেন । ইস্তেযামি উমূরে মাশওয়ারার এহতেমাম হওয়া উচিত । এটা নয় যে, আমালে দাওয়াত নিয়ে মাশওয়ারা হবে । এটা তো মানসূস ।

তাহসিল :

এই অভিযোগটি মূল্যবান একটি মালফূজ বা বাণী হতে পারে, ভুল কখনোই হতে পারে না । ইস্তেযামি বিষয়ে অর্থাৎ কাজটি কীভাবে করা হবে, কখন করা হবে, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পরামর্শ হতে পারে । কিন্তু দাওয়াতের আমল করা যাবে, নাকি করা যাবে না এই নিয়ে তো পরামর্শ হতে পারে না । এতো কুরআন শরিফের অসংখ্য আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত । দাওয়াত দেওয়া আব্বাহ তা'আলার হুকুম এবং সমস্ত নবীদের সুন্নত । দাওয়াত দেওয়ার আমলটি সত্তাগতভাবে 'হাসান লি আইনিহি' । কিতালের মত 'হাসান লি গাইরিহি' নয় । সুতরাং দাওয়াতের আমল মানসূস অর্থাৎ হাদিস কুরআনের নস দ্বারা প্রমাণিত ।

৫ নং অভিযোগ :

আব্বাহর কসম আমি তোমাদের আমীর । যে আমাকে আমীর মানবে না সে জাহান্নামে যাবে ।

তাহসিল :

কোনো কথা কে জোর দেওয়ার জন্য মাঝেমাঝে কসম খেয়ে কথা বলা নবী ও সাহাবাদের কথা বলার একটা তরিকা । দ্বিতীয়ত মামুর যখন আমীরের সামনে এমন সব কর্মকান্ড করে বসে যা একজন আমীরের উপস্থিতিতে করা আদৌ ঠিক নয় তখন আমীর তাঁর উপস্থিতি জানান দিয়ে এ কথা বলা যে, 'এ-ই আমি তোমাদের আমীর' একবারেই যুক্তিসঙ্গত ।

বাস্তব ঘটনা তাই হয়েছে । বড় বড় যিম্মাদার সাথীদের নিয়ে আলমি যিম্মাদার মুহতারাম মাওলানা জরুরী পরামর্শ করছেন । হঠাৎ করে এক দল মাশওয়ারার মধ্যে হাজির হয়ে হট্টোঙল ও বেউসূলি করা শুরু করে দিলো । হট্টোঙল ও বেআদবি করা চরম বেআদবি । যারা আমীর চিনে না, আমীরের সাথে বিআদবি করে এদেরকে আমীর চিনিয়ে দিতে হয় । অবশ্য মুহতারাম মাওলানার কথা শুনে হট্টোঙলকারীরা বলেছিল, আপনাকে আমীর কে বানিয়েছে । আমরা আপনাকে আমীর মানি না । মুহতারাম মাওলানা কিছু বলেননি । হয়তো রাগকে দমিয়ে ফেলেছেন । কিন্তু মাশওয়ারার অন্যান্য সাথীরা বলেছিল, ভাই, কাজ করার জন্য আমরা আমাদের একজনকে আমীর বানিয়েছি ।

তৃতীয়ত, আমীরকে না মানলে জাহান্নামে যাওয়া লাগবে একথা কোনো আহলে ইলম ভাইকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই । আমরা সবাই জানি আমীরের ইত্যাত ওয়াজিব । বিস্তারিত জানার জন্য সর্বশেষে মুসলিম জামাত ও ইমারত বিষয়ক একটা প্রবন্ধ আছে সেখান থেকে জেনে নিবো ।

৬ নং অভিযোগ :

ওনি আমীরত্ব ছেড়ে দিয়ে শুরা মানেন না কেন? আলমি শুরা মানলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ।

তাহসিল :

শুরা মানে পরামর্শ । আহলে শুরা মানে যাদের নিয়ে পরামর্শ করা হয় । মুহতারাম মাওলানা পরামর্শের জন্য খুব জোর তাকিদ দিয়ে থাকেন । এই কাজ যেমন জরুরী এই কাজের জন্য পরামর্শ খুব জরুরী । দেশে দেশে মুস্তাকিল মাশওয়ারার আমল কয়েম করে রেখেছেন । সব সাথীর প্রতি ওনার হেদায়াত, পরামর্শ করে যেন সব কাজ আঞ্জাম দেওয়া হয় । মুহতারাম মাওলানা মারকাযেও মাশওয়ারার তারতিব কয়েম রেখেছেন । প্রতিদিন পরামর্শভিত্তিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ।

দ্বিতীয়ত মুহতারাম মাওলানা নতুন করে তৈরি তথাকথিত আলমি শুরা মানেন না কেন?

ইসলামের প্রথম যুগ থেকে শুরু করে তাবেয়ীন, তাবে' তাবেয়ীন তথা ইসলামের গোটা ইতিহাসে, কুরআন ও হাদিসে ইমারতের তারতিব ছেড়ে দিয়ে এরকম আলমি শুরার তারতিব গ্রহণের প্রমাণ নেই এবং নামজাত অর্থাৎ পরামর্শের সদস্য নির্ধারণ করে রাখার তারতিবও পাওয়া যায় না। মুসলিম জামাতের প্রধান ব্যক্তি, যাকে খলিফাতুল মুসলিমিন, আমীরুল মুমিনিন, সংক্ষেপে খলিফা, আমীর বা ইমাম বলা হয়ে থাকে, এই আমীর বা খলিফার জায়গায় নির্দিষ্ট কোনো আমীরবিহীন আহলে শুরা কিংবা আহলে শুরাদের মধ্যে পালাবদল আমীরের তারতিব ইসলামে নেই। সুতরাং মুহতারাম মাওলানা কেন ইসলামিক তরিকা ছেড়ে অনৈসলামি তরিকা গ্রহণ করবেন। কেন তিনি সুন্নাত ছেড়ে বিদাত মানবেন। কেন তিনি সীরত ছেড়ে বিজাতীদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এই আলমি শুরা মানতে যাবেন। এই মেহনতের প্রায় একশ' বছর গত হয়েছে। প্রথম আমীর ছিলেন মাওলানা ইলিয়াস রহ.। দ্বিতীয় আমীর ছিলেন মাওলানা ইউসুফ রহ.। তৃতীয় আমীর ছিলেন মাওলানা ইনয়ামুল হাসান রহ.। তাবলিগের ইতিহাসেও কিছু মানুষের উপস্থাপিত এই আলমি শুরার অস্তিত্ব নেই।

এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায়, তৃতীয় হযরতজি মাওলানা ইনয়ামুল হাসান রহ. দেশ-বিদেশে শুরার তারতিব গঠন করে গেছেন। কোথাও আহলে শুরা ও কোথাও আমীর ও আহলে শুরা।

মনে রাখবেন, কাজ বাড়ার কারণে কাজের সুবাসার্থে দেশে বিদেশে আহলে শুরা বানিয়েছেন। মারকাযের জন্যেও এক জামাত আহলে শুরা বানিয়েছেন। কিন্তু সারা বিশ্বের সমস্ত শুরা, সাথী ও মুসলমানদের আমীর কিন্তু তিনি নিজেই ছিলেন। আলমি আমীরের জায়গায় আমীরের পরিবর্তে কোনো শুরা বানাননি। তারপর আসুন দেখি, মাওলানা ইনয়ামুল হাসান রহ. এর পরে আলমি আমীর বানানো হয়নি কেন? মাওলানা ইনয়ামুল হাসান সাহেব শুরা বানিয়ে গেছেন আমীর তায়ীন করার জন্য। তাই ওনার ইত্তিকালের পর আমীর তায়ীনের পরামর্শ হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো আমীরের ফায়সালা করতে পারিনি। ইনয়ামুল হাসান রহ. বানানো ১০ জন শুরা থেকে ৩ জন কাজ পরিচালনা করবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ৩ জনের একজন বছর দুই বছরের মাথায় ইত্তিকাল করেন। তারপর দুইজন, মাওলানা যুবাইরুল হাসান রহ. ও মাওলানা সা'আদ সাহেব মিলে প্রায় বিশ বছর কাজ চালিয়ে যান। তারপর ২০১৪ সালে মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেবের ইত্তিকালের পর আহলে রায়, পুরানো সাথী ও মুরব্বিগণেল বিশাল জামাত মুহতারাম মাওলানাকে আমীর হিসাবে গ্রহণ করে নেন। ২০১৭ সালের টঙ্গির বিশ্ব ইজতিমায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শুরাদের উপস্থিতিতে পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত হয় যে, মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) হলেন আলমি যিম্মাদার বা তাবলিগ জামাতের বিশ্ব আমীর। আশা করি এতটুকু লেখার দ্বারা ওনি আমিরত্ব কেন ছাড়েন না বিষয়টি কিছুটা হলেও পরিষ্কার হয়েছে। তবে এখানে আরও অনেকের অনেক প্রশ্ন ও সংশয় রয়েছে, কেউ বলেন, মাওলানা ইনয়ামুল হাসান রহ. বলে গেছেন, এখন থেকে কাজ শুরা তারতিবে চলবে, এজাতীয় সব কথার সমাধান 'মুসলিম জামাত ও ইমারত' নামক প্রবন্ধে পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিতাবের শেষ দিকে প্রবন্ধটি রয়েছে।

মোটকথা, আমিরত্ব কেন ছাড়ছেন না, এক কথায় জবাব যদি দেওয়া হয় তাহলে আমরা বলবো, মুহতারাম মাওলানা ইমারতকে ছেড়ে দিয়ে গোটা ইসলামের ইতিহাস ও সুন্নাত ও সীরতের শিক্ষা থেকে দূরে সরতে পারছেন না এবং আগামী প্রজন্মের সব উম্মতের সামনে একটা ভুল রেওয়াজ কায়ম করতে পারছেন না, আল্লাহর ভয়ে এবং আখিরাতে গ্রেফতারের ভয়ে।

মুহতারাম মাওলানার এই মাজবুতী আমাদেরকে স্বরণ করিয়ে দেয়, হুসাইন রাদি. এর কথা। ইয়াযিদের হাতে প্রচুর সাহাবি বাইয়াত হয়েছেন। হযরত হুসাইন রাদি. নানাজির নুরানি খেলাফত ও ইমারতকে ধ্বংস হতে দেখে তিনি ইয়াযিদকে সহ্য করতে পারেননি। রসূল সা. এর খেলাফত ও ইমারত কায়ম করার জন্য শেষ পর্যন্ত শহিদ হয়ে যান। আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় হযরত উসমান রাদি. মজবুতির কথা, হকের মধ্যে থেকে জান দিয়ে শহিদ হয়ে গেছেন তবুও বাতিলকে তিনি গ্রহণ করেননি এবং ইমারতকেও তিনি ছাড়েননি। বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই। যারা দ্বীন কায়মের আন্দোলন করেন, সাহাবাওয়ালা তারতিবে বিশ্বময় বিপ্লব

ঘটানোর ফিকির করেন ওনাদের জন্য খুবই জরুরী সাহাবাদের বিশুদ্ধ ইতিহাস ও কর্মপদ্ধতিকে ভালোভাবে আত্মস্থ করা।

৭ নং অভিযোগ :

নামাযে এক রুকুন থেকে অন্য রুকুনে যাওয়ার জন্য তাকবীর বলা হানাফি ওলামাদের নিকট সুন্নাত, ওনার মতে সুন্নাত হওয়ার কারণে উম্মতের মধ্যে অবহেলা পাওয়া যায়, অন্যান্য ইমামগণ যাদের মতে এই তাকবীরগুলোর ব্যাপারে আরও কঠোরতা রয়েছে এরকম হওয়াই মুনাসিব মনে হয়।

তাহসিল :

খাহেশাতের বশবর্তী না হয়ে দ্বীনি কোনো মাসলাহাতের কারণে এক মাযহাব থেকে চলে গিয়ে অন্য মাযহাবের উক্তি মোতাবেক ফতুয়া দেওয়া বিজ্ঞ মুফতি ও আলেমের জন্য না যায়েজ নয় এবং নতুনও নয়। ফিকহের কিতাবাদিতে এর ভুরি ভুরি নজীর রয়েছে।

হাম্বলি মাযহাবে ‘তাকবিরে ইনতেকালি’কে ওয়াজিব মনে করেন। দলিল হিসাবে নিম্নের দুটি হাদিস সহ আরও অনেক দলিল ও যুক্তি হাম্বলি ফকিহগণ পেশ করে থাকেন।

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس

(১) অর্থ : রসূল সা. যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন তখন দাড়িয়ে আল্লাহ্ আকবার বলতেন, তারপর রুকুতে যাওয়ার সময় আল্লাহ্ আকবার বলতেন, তারপর রুকু থেকে ওঠার সময় সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদা বলতেন, তারপর দাড়ানো অবস্থায় রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ বলতেন, তারপর সিজদায় যাওয়ার সময় আল্লাহ্ আকবার বলতেন, তারপর সিজদা থেকে ওঠার সময় আল্লাহ্ আকবার বলতেন, এরকমভাবে সব রাকাতেই করে নামায আদায় করতেন। দুই রাকাতের বৈঠকের পরও দাড়ানোর সময় আল্লাহ্ আকবার বলতেন। (বুখারি শরিফ)

وقد قال صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي

(২) অর্থঃ রসূল সা. বলেছেন, তোমরা নামায পড়ো যেমনভাবে তোমরা আমাকে দেখো নামায পড়তে।

(বুখারি শরিফ)

প্রিয় পাঠক, ‘তাকবিরে ইন্তেকালি’ আদায়ে উম্মতের শীতলতা দেখে এবং সুন্নত মনে করে অনেককে ছেড়ে দিতে দেখে মুহতারাম মাওলানা যদি বলে থাকেন যে, তাকবিরে ইন্তেকালির ব্যাপারে আরও শক্ত হুকুম হলে মুনাসিব হয় তাহলে ওনি তো দোষের কোনো কিছু বলেননি। প্রয়োজনীয় কোনো মাসলাহাতের কারণে অন্য মাযহাব থেকে যেখানে ফতুয়া দেওয়া যায়েজ সেখানে ওনি ফতুয়া দেননি, বরং সুন্নতকে অগুরুত্বপূর্ণ মনে করাতে মুহতারাম মাওলানা বলেছেন হুকুমটা আরও শক্ত হলে ভালো হতো। ওনি তো সুন্নতকে গুরুত্ব দিলেন। আমরা ওনাকে বুঝতে পারছি না।

৮ নং অভিযোগ :

এই রাস্তায় সবকিছু আছে, একজন শাইখ তার মুরিদ দ্বারা যাকিছু করিয়ে থাকেন। আ’মালে নবুওয়ত ও আ’মালে বেলায়াতের মধ্যে পার্থক্য শুধু খুরুজ না হওয়া।

তাকসিল :

এই অভিযোগটি ভুল হতে পারে না। এইটা একটা মূল্যবান মালফুজ বা বাণী।

দেওবন্দের মুহতামিম ক্বারি তৈয়ব সাহেব (দাঃবাঃ) এর কাছে এক তাবলিগ বিরুদ্ধী এই অভিযোগটিই পেশ করেছিল তখন দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম বলেছিলেন,

“বহরহাল, ইসলামি নফসের চারটা অংশ এবং চারটা তরিকা। তাবলিগের ভিতর চারো তরিকা জমা হয়ে গেছে। সুহবতে সালাহও আছে। যিকির ও ফিকিরও আছে। মুওয়াখাত ফিল্লাহও আছে। মুহাসাবায়ে নফসও আছে। এই চারটির সমষ্টির নাম তাবলিগি জামাত। সাধারণ মানুষের জন্য ইসলামে নফসের এর চাইতে উত্তম তরিকা হতে পারে না। এই কর্মপদ্ধতির দ্বারা দ্বীন আম (ব্যাপক) হতে চলেছে।”

(জামাতে তাবলিগ পর এ'তেরাজ কী জওয়াবাত (উর্দু) : ক্বারি তৈয়ব সাহেব রহ. পৃষ্ঠা-১১৪-১১৬)

মুফতিয়ে আজম হাটহাজারি হযরত মাওলানা ফয়যুল্লাহ রহ. হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি আহমদ সেরহিন্দি রহ. এর মূল মাকতূবাত থেকে উদ্ধৃতি টেনে “হক কি রাহনুমায়ি আওর ইসলামে নুফুস” কিতাবে উল্লেখ করেন, নবুয়তী মেহনত বেলায়াতি মেহনত অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। কেননা, নবুয়তী মেহনত মূল, আর বেলায়াতি মেহনত তার ছায়া স্বরূপ। যদি কুরবে বেলায়াতের পন্থায় না চলে কুরবে নবুয়তের সুপ্রশস্ত পন্থাকে অবলম্বন করা হয় তখন ফানা-বাকা, জযবা ও সুলুক কিছুই আবশ্যিক হয় না। নবুয়তী মেহনতের পথের পথিকগণ গন্তব্য স্থানে পৌছতে সক্ষম হোন, পক্ষান্তরে বেলায়াতি পথের পথিকগণ অধিকাংশই পথের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যান। আর সাগর ছেড়ে এ ফোটা পানিতে তৃপ্ত হয়ে পড়েন। এবং সম্পূর্ণ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা থেকে আটকে যান ও আসল লক্ষ্যে পৌছানো থেকে বঞ্চিত হোন।

(সত্যের সন্ধান ও আত্মশুদ্ধি, পৃষ্ঠা নং ২০, ২১)

সুতরাং বেলায়াতের তরিকায় নিজের উপর ইসলামের মেহনত করতে শেখানো হয়। আর দাওয়াতি তরিকায় নিজের ইসলামের মেহনতের পাশাপাশি অল্লাহর রাস্তার এই খুরুজই অন্যের হিদায়াতের মাধ্যমও হয়ে যায়।

৯নং অভিযোগ :

সালাহীনগণ যে সব অজিফার কথা বলেন যেমন, অমুক তাসবিহ এত হাজার বার পড়ে নাও ইত্যাদি কোথাও প্রমাণিত নয়। মাসনুন তাসবিহাতের এহতেমাম করো।

তাকসিল :

মুহতারাম মাওলানা সত্য কথা বলেছেন। বিভিন্ন অজিফার অনেক তাসবিহাত যেগুলো কুরআন হাদিসে নেই সেগুলো তিনি অস্বিকার করেননি এবং না যায়েজও বলেননি। শুধু বলেছেন প্রমাণিত নয়। অতটুকু বলা সমস্ত আলেমগণেরই কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, ওনি মাসনুন যিকির ও তাসবিহাতের কথা বলেছেন এবং এগুলো আদায়ের জন্য তাকিদ দিয়েছেন। মুহতারাম মাওলানার প্রতিটি কথার উৎস সিরাত ও সুন্নাতে বিদ্যমান।

অভিযোগকারীকে আমরা বলতে চাই যে, অজিফার বিভিন্ন তাসবিহাত যেগুলো কুরআন হাদিসে নেই সেগুলোর ব্যাপারে মুহতারাম মাওলানা কি মিথ্যা কথা বলে দিবেন যে, এসব কুরআন হাদিসে প্রমাণিত আছে। বিভিন্ন আলিমের অজিফার চেয়ে নবীর অজিফা অর্থাৎ মাসনুন দুআর কথা বলা কী অপরাধ?

১০ নং অভিযোগ :

এই কথা তো ফায়সালা হয়ে গেছে যে, মারকায তো কিয়ামত পর্যন্ত এটাই থাকবে।

তাকসিল :

কারো যখন কোনো বিষয়ের প্রতি দৃঢ়তা এসে যায় তখন তিনি এধরণের কথা বলে থাকেন। এটা আল্লাহ তা'আলার কাছে দুআ-মূলক কথা। হাদিসে আছে, আল্লাহর প্রিয় কোনো বান্দা কসম খেলে আল্লাহ তা'আলা কসম পুরা করে দেন। যেমন কেউ বললো, আল্লাহর কসম, একদিনের ভিতরে বৃষ্টি হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার কসমকে ভঙ্গ হতে দেন না। এক দিনের ভিতরেই বৃষ্টি দিয়ে দেন। পুরানো কাজ করণে ওয়ালা ওলামা হযরতগণ থেকে বহুবার একথা শুনেছি যে, হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস রহ. এই কাজকে, নিজামুদ্দিনের এই যমিনকে এবং ওনার খান্দানকে আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে কবুল করিয়ে নিয়েছেন। সাধারণত এধরণের কথাবার্তা আল্লাহর প্রতি আস্তা ও নেক ধারণা থেকে বলা হয়ে থাকে। আর একটি হাদিসে কুদসির মাফহুম এরকম, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি বান্দার ধারণা অনুযায়ী মুআমালা করে থাকি। অভিযোগকারীকে বলতে চাই, এই সুন্দর সহজ কথাটিকে ঘুরিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া তো ভালো মানুষের লক্ষণ নয়। অভিযোগকারী বলছে, 'নিজামুদ্দিন কিয়ামত পর্যন্ত মারকায থাকবে এই কথা ওনি জানলো কি করে, এর দ্বারা বুঝা যায় ওনি অহি নাযিল হওয়ার দাবি করছেন।'

অভিযোগকারী নেক ধারণার আমল হিসাবে বলতে পারতো এটা ইলহামি কথা, তাহলে তার কথাটি সঠিক হতো। কারণ, অহির রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে আর ইলহামের রাস্তা কিয়ামত পর্যন্ত নিয়াতম হিসাবে নেক বান্দাদের জন্য খোলা থাকবে।

হাদিসে কিয়ামতের আগে মদিনায় দীন ফিরে যাওয়ার কথা যা উল্লেখ আছে তা নিজামুদ্দিন মারকায থাকার আশা করার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। মাশওয়ারা সাপেক্ষে অথবা অপরাগ হয়ে আমীর সহ সমস্ত দীনদারদের দীন বাঁচানোর জন্য মদিনায় হিজরত করা প্রকারান্তরে মারকাযের ফায়সালারই ইত্যাত।

১১. নং অভিযোগ :

হেদায়াত পাওয়ার স্থান মসজিদ ছাড়া কিছু নয়। দ্বীনের ঐ শোবা যেখানে দীন পড়ানো হয়, যদি তারও সম্পর্ক মসজিদের সাথে না হয়, তবে খোদার কসম সেখানেও দীন থাকবে না। হ্যাঁ দ্বীনের তালিম হবে। দীন হবে না।

তফসিল :

এই অভিযোগ উত্থাপনকারীদের মনে রাখতে হবে, দ্বীনি মাদ্রাসা ও আমাদের আকাবিরদের চালু করা দ্বীনি শো'বাগুলোর প্রতি আমাদের মতো মুহতারাম মাওলানারও অত্যাধিক শ্রদ্ধা ও মর্যাদা রয়েছে। দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোকে তিনি দ্বীনের দুর্গ বলে থাকেন। বিভিন্ন ইজতিমায় লাখো লোকের মজমায় মুহতারাম মাওলানা প্রায়ই বলে থাকেন,

“এই দুনিয়ার মধ্যে ইলম ও উলামা হলো সবচে' বড় নিয়ামত। ওনাদের যিয়ারত ইবাদত। উলামাদের মজলিস এবং ওনাদের সুহবত থেকে ফায়দা নেওয়া, জীবনের কদমে কদমে ওলামাদেরকে জিজ্ঞেস করে করে চলা। আমাদের মেহনত ও দাওয়াতের উদ্দেশ্য জাহালাত খতম করা এবং ইলম হাসিলের তলব পয়দা করা। দ্বীনের কোনো শো'বা অস্বিকার করা তো হযরত মুহাম্মাদ সা. এর আহকামাতকে অস্বিকার করার নামান্তর।”

সুতরাং অভিযোগকারীদের উত্থাপিত বক্তব্য থেকে বুঝা যায় মুহতারাম মাওলানা ওই সব প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন যেখানে কেবল দ্বীনের তালিম হয়, দ্বীন শিখানো হয় না। বড় বড় পণ্ডিত হয়, কিন্তু দ্বীনের আসল খিদমতগার হয় না। এই বক্তব্য আমাদেরও। যেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক অমুসলমানও হতে পারে সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ধর্মীয় জ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করলে ধর্মীয় জ্ঞান যিন্দা হতে পারে, কিন্তু দ্বীন যিন্দা হবে না। শুধু ইলমকে দ্বীন বলা হয় না। অহির মাধ্যমে মুহাম্মাদ সা. উপর নাযিল হওয়া ইলম, ইলমের হাকিকত ও ইলমের মাধ্যম কিতাব যদি রিজালের মাধ্যমে হাসিল হয় সহিহ গরজে ও উদ্দেশ্যে তহালেই সেটা দ্বীন হবে। তাছাড়া একসময় অর্থাৎ সাহাবিগণের যামানায় আমভাবে মসজিদই ছিল ইলম ও আমলের মারকায। আর যারা মসজিদ আবাদ করবে তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হবে বলে কুরআন শরিফে ঘোষণাও আছে।

মুহতারাম মাওলানার উদ্দেশ্য, আগের যামানায় তালিমে দ্বীন ও হিদায়াতের আসল মারকায মসজিদই ছিল। আমভাবে সেখান থেকেই সবাই উপকৃত হতো। আকাবিরদের চালু করা দ্বীনের অন্যান্য শো'বাকে ছোট করা উদ্দেশ্য নয়। বরং সবাই মিলে আগের মত মসজিদ আবাদ করার পিছনে লেগে থাকতে হবে। তাহলে আমভাবে সব মুসলমানদের মধ্যে দ্বীন ও প্রয়োজনীয় ইলম যিন্দা হবে। উচ্চতর ইলম তো বর্তমানে মাদ্রাসা থেকেই গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

দারুল উলুম দেওবন্দের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা একটা ফতুয়া আমাদের কাছে পৌছে। ৩১-০১-২০১৮ ঈসায়ী তারিখে দারুল উলুম দেওবন্দের প্যাডে লিখিত এই ফতুয়ায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ব্যাপারে আমরা একটা সিদ্ধান্ত দেখতে পাই। জানি না এটি দারুল উলুম দেওবন্দের ফতুয়া কিনা? এই ফতুয়াটির সারাংশ হলো-

দারুল উলুম দেওবন্দ বলছে, মূসা আ. এর ঘটনার ব্যাপারে আপত্তিকর বক্তব্য থেকে মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেব প্রকাশ্যে মজমায় রুজু করেছেন। সুতরাং এই ঘটনার ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দ 'মুতমায়িন' বলা যেতে পারে। কিন্তু মুহতারাম মাওলানার বয়ানে 'মুজতাহাদানা' আন্দায় অর্থাৎ ইজতিহাদমূলক কথাবর্তা, 'গলত ইস্তিদলাল' অর্থাৎ ভুলভাবে দলিল উপস্থাপন এবং দাওয়াতের ব্যাপারে নিজস্ব এক চিন্তাধারার স্বপক্ষে ভুলভাবে শরয়ি দলিল পেশ করার কারণে দারুল উলুম দেওবন্দ সহ অন্যান্য উলামাগণ একদম 'মুতমায়িন' নয়। এরকম ইজতিহাদপনা দেখে দেওবন্দ মনে করছে, খোদা না খাস্তা তিনি এমন জামাত তৈরি করতে আগাচ্ছেন যাকিনা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত; বিশেষত আমাদের আকাবির হযরতগণের মতাদর্শ থেকে ভিন্ন হবে। দারুল উলুম দেওবন্দ আরও বলছে, আকাবিরদের ফিকির ও চিন্তাধারা থেকে সামান্য সরে দাড়ানো মারাত্মক ক্ষতিকর। আর তাবলিগ জামাতের ভিতরগত দ্বন্দের সাথে দারুল উলুম দেওবন্দের কোনো সম্পর্ক নেই। এরকম কথা সেই প্রথম দিন থেকেই বলে আসছে।

সবশেষে তিনটি সাক্ষরও রয়েছে। এ সাক্ষরগুলো কী সত্যই দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম আবুল কাশেম নুমানী, মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরি ও মাওলানা আরশাদ মাদানি উনাদের কিনা, নাকি স্ক্যানিং করা পূর্ব সাক্ষরের নকল কপি, এই ব্যাপারে আমাদের তাহকিক নেই। তবে একবার দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিমের সাক্ষর নকল করে প্যাডে ভুল ফতুয়া দারুল উলুম দেওবন্দের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে প্রচার করার অযাচিত ঘটনা যে ঘটেছিল তা খোদ মুহতামিম সাহেবই স্বীকার করে বিবৃতিও দিয়েছেন। আমাদের কাকরাইলের কয়েকজন শুরার সাইন নকল করেও মাদ্রাসার প্যাডে একদল বিভ্রান্তকারী চিঠি সাজিয়েছিল যার সত্যতা ওই শুরাদের ট্যাম্পে লেখা মন্তব্য পড়ে আমাদের সবারই জানা হয়ে যায়। সেই কারণে উপরোক্ত ফতুয়া দেওবন্দের কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকতে পারে, সেটা ভিন্ন কথা।

প্রিয় পাঠক, উপরোক্ত ফতুয়ার খুলাসা মোটামুটি ৫ টি বিষয়।

- (১) মূসা আ. এর ঘটনার ব্যাপারে মুহতারাম মাওলানার উপর 'মুতমায়িন' হওয়া।
- (২) মুহতারাম মাওলানার মুজতাহিদ আন্দায়ের বয়ান এবং বয়ানে ভুল ইজতিহাদ ও দলিলের ভুল উপস্থাপন।
- (৩) আকাবিরদের ফিকির ও চিন্তাধারা থেকে সামান্যও সরে দাড়ানো ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর।
- (৪) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত; বিশেষত আমাদের আকাবির হযরতগণের মতাদর্শ থেকে ভিন্ন কোনো নতুন জামাত তৈরি করা।
- (৫) তাবলিগের ভিতরগত বিষয়ে দেওবন্দের কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রথম বিষয় :

মুসা আ. এর ঘটনার ব্যাপারে মুহতারাম মাওলানার উপর ‘মুতমায়িন’ হওয়া।

তাকসিল :

মুসা আ. এর ঘটনার ব্যাপারে মুহতারাম মাওলানা সা’আদ সাহেবের উপর দেওবন্দ ‘মুতমায়িন’ ও আশ্বস্ত। মুহতারাম মাওলানা বাংলাদেশের কাকরাইলে এসেও দ্বিতীয় বার রুজুর ঘোষণা দিয়েছেন। লিখিতভাবে রুজুর ঘোষণা তো আছেই।

কিন্তু একদল উলামা হযরতগণকে দেখা যায় ওই পুরানো ঘটনা নিয়েই বলাবলি, সব মহলে চালাচালি করেই যাচ্ছেন। এই কাজটি কি আমরা ঠিক করছি? এ বিষয়ে দেওবন্দ ‘মুতমায়িন’ হলে আমরা ‘মুতমায়িন’ নয় কেন? যদি এই বিষয় নিয়ে বিশৃংখলা করতে থাকি তাহলে আমরা কি দেওবন্দকে মানছি?

অনেকে বলে থাকেন, মুহতারাম মাওলানা রুজু হওয়ার পরও বার বার বলেন। ইনসাফের সাথে ভেবে দেখুন, রুজু হওয়ার পর মুসা আ. ঘটনাটি দ্বিতীয় বার বলার প্রমাণ আপনার কাছে আছে কি? থাকলে অতিসত্তর দেওবন্দকে জানিয়ে দিন। কারণ, দেওবন্দ এই বিষয়ে ‘মুতমায়িন’ হওয়ার ঘোষণা করেছেন। হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. সহ অনেক আকাবির অনেক মাসআলায় রুজু হয়েছেন। এখন রুজুকৃত ভুল সিদ্ধান্ত উনাদের নামে চালিয়ে দিয়ে উনাদের দোষারোপ করা আমাদের জন্য আদৌ বৈধ হবে কি? অবশ্যই বৈধ হতে পারে না।

দ্বিতীয় বিষয় :

মুহতারাম মাওলানার মুজতাহিদ আন্দায়ের বয়ান এবং বয়ানে ভুল ইজতিহাদ ও দলিলের ভুল উপস্থাপন।

তাকসিল :

আল্-হামদু-লিল্লাহ, অনেক দিন পর হলেও দারুল উলুম দেওবন্দ বুঝতে পারলেন মুহতারাম মাওলানা মুজতাহিদ আন্দায়ে কথাবার্তা বলেন। তিনি একজন মুজতাহিদ। মুহতারাম মাওলানার সুহবতপ্রাপ্ত অনেক উলামায়ে কেরাম আরও অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি একজন মুজতাহিদ। তবে তিনি ‘মুজতাহিদে মুতলাক’ নন। কেননা, তিনি সামগ্রিকভাবে ফিকহি মাসায়েলের ক্ষেত্রে ফিকহে হানাফি ও আহলে ফতুয়া আকাবির হযরতগণের তাকলিদ করে থাকেন। কোনো মাযহাবের তাকলিদের উর্ধ্বে গিয়ে ‘মুজতাহিদে মুতলাক’ হওয়ার রাস্তা অনেক আগে থেকেই বন্ধ হয়ে আছে বলে উলামায়ে কেরাম ও ফুকাহায়ে কেরাম বলে থাকেন।

তবে তিনি ‘মুজতাহিদে মুকায়্যিদ’। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করা। বিশেষ করে মুহতারাম মাওলানা জীবনের শুরু থেকেই দাওয়াত ও তাবলিগের লাইনে ডুবে আছেন। বর্তমানে তিনি এখন দাওয়াত ও তাবলিগের আলমী আমীর বা যিম্মাদার। সারা দিন-রাত এই মেহনত নিয়েই থাকেন। এই মেহনতের ব্যাপারে উনার কাছে আলমী কারগুজারী জমা হতে থাকে সে কারণে যেসব ইজতিহাদ, হিকমাত ও তারতিব উনার কাছে খুলবে ও জাহির হবে অন্য কারো কাছে এরকম জাহির হবে না এটাই বাস্তবতা। বর্তমানে দাওয়াত ও তাবলিগের ব্যাপারে উনি হলেন সবচে’ বড় মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদ।

আর দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে ইজতিহাদ করে মুজতাহিদে মুকায়্যিদ হওয়ার ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়নি। ফুকাহায়ে কেরাম বলে থাকেন, মুজতাহিদ মুকায়্যিদ হওয়ার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।

অনেক ফকিহ ও মুজতাহিদ এই শর্ত করেছেন যে, মুসলমানদের আমীরের ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকতে হবে। ইজতিহাদের যোগ্যতা না থাকলে কীভাবে মুসলমানদের পরিচালনা করবেন এবং আহলে শুরাদের রায় নিয়ে বা না নিয়ে কুরআন হাদিস ভিত্তিক সঠিক ফায়সালা কীভাবে দিবেন। এই জন্যে উনারা মনে করেন, আমীর ইজতিহাদের যোগ্য থাকতে হবে।

কিন্তু দারুল উলূম দেওবন্দ বলছেন, মুহতারাম মাওলানার ভুল ইজতিহাদ ও দলিলের ভুল উপস্থাপন। প্রিয় পাঠক, ভুল ইজতিহাদ ও দলিলের ভুল উপস্থাপনের আপত্তিকর যে বিষয়গুলো উনারা তুলে ধরেছেন সে বিষয়গুলোর জবাব ও তাফসিল বক্ষমান কিতাবটিতে অধ্যয়ন করে আপনারা বুঝতে পেরেছেন মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেব (দাঃবাঃ) কোনো ভুল ইজতিহাদ ও ভুল দলিলবাজি করেননি। কেননা, কুরআন ও হাদিস ও আকাবিরদের ফতুয়া ও মালফূজাত অধ্যয়ন করে আমরা বুঝতে পারলাম অভিযোগকারীদের উপস্থাপিত মুহতারাম মাওলানার ভুলগুলো আসলে ভুলই নয়।

তৃতীয় বিষয় :

আকাবিরদের ফিকির ও চিন্তাধারা থেকে সামান্যও সরে দাড়ানো ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর।

তাফসিল :

এই ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর কাজগুলো কারা করছে।

(১) ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি-ভিডিও, টিভি ও টিভির বংশধরকে আমাদের আকাবির হযরতগণ নাযায়েজ মনে করতেন এবং এ ব্যাপারে ওনারা অনেক কঠোর ছিলেন। কিন্তু কারা এই ব্যাপারে শীথলতা প্রদর্শন করে যাচ্ছে।

(২) আমাদের আকাবির হযরতগণ আল্লাহর রাস্তায় মাস্তুরাতের জামাত বের হওয়ার যায়েজ ফতোয়া দিয়ে গেছেন। বরং এদেরকে বের করানো অনেক জরুরীও মনে করতেন। কিন্তু আজ আমাদের হিন্দুস্তানের বিভিন্ন দারুল ইফতা থেকে আল্লাহর রাস্তায় মাস্তুরাত জামাত বের করাকে না যায়েজ ফতোয়া দেওয়া হয় এবং স্কুল-কলেজে ছাত্রীদের পড়াশুনাকে যায়েজ ফতোয়া দেওয়া হয়। আকাবিরদের পবিত্র মেযাজের এত পরিবর্তন কাদের দ্বারা হচ্ছে?

আমাদের আকাবির হযরতগণ অনেক বড় বড় আলেম ও ফকিহ ছিলেন। ইসলামের বড় বড় কাজ করে গেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত জাতী তাদেরকে স্বরণ রাখবে এবং তাদের সাওয়াবের ধারা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। আমাদের সারা জীবনের খিদমত ওনাদের একদিনের খিদমতের সমান হবে না। ওনাদের পায়ের ধূলোর সমানও আমরা নয়। তারপরও তাদের মধ্যে এমন কিছু মা'জুরি ও অপূর্ণতা রয়ে গিয়েছিল যে মা'জুরি ও অপূর্ণতা সাহাবা, তাবৈঈন ও তাবৈ' তাবৈঈনদের মধ্যে ছিল না। এখন কি আমাদেরকে তাদের এই মা'জুরিরও অনুসরণ করতে হবে, তাদের এই অপূর্ণতা থেকে দূরে সরে এসে সাহাবা ও তাবৈঈনদের পূর্ণতার উপর আমল করা যাবে না? মনে রাখা দরকার ইনহেরাফ এক জিনিস, তাজদিদ এক জিনিস। মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) আকাবির হযরতগণের তরিকা থেকে ইনহেরাফ হননি। বরং আল্লাহ তা'আলা ওনার থেকে তাজদিদের খেদমত নিচ্ছেন।

চতুর্থ বিষয় :

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতা; বিশেষত আমাদের আকাবির হযরতগণের মতাদর্শ থেকে ভিন্ন কোনো নতুন জামাত তৈরি করা।

তাফসিল :

আকাবির হযরতগণের কথা, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণের কথা নকল করলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বাইরে চলে যেতে হলে তাহলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কারা? যে সব অভিযোগ মুহতারাম মাওলানার বিরুদ্ধে দাড়া করানো হলো এসবের অধিকাংশ বিকৃত, আর বাকিগুলো আমাদের আকাবির হযরতগণ ও পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরামের কথার পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছুই নয়।

পঞ্চম বিষয় :

তাবলিগের ভিতরগত বিষয়ে দেওবন্দের কোনো সম্পর্ক নেই।

তাফসিল :

দারুল উলুম দেওবন্দ স্পষ্ট ভাষায় একাধিক বার ঘোষণা করেছেন তাবলিগ জামাতের ভিতরগত বিষয় অর্থাৎ কোনো সাথী মারকায ছেড়ে চলে যাওয়া, আমীর-শুরার ইখতিলাফ ইত্যাদি বিষয়ে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে দেওবন্দপন্থী অনেক উলামাগণ এই ভিতরগত বিষয় নিয়ে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করছেন। অমুক অমুক সাহেব কেন মারকায থেকে চলে গেলেন। অমুক হযরত কেন নিজামুদ্দিন বিরোধী। মাওলানা সা'আদ সাহেব কেন আমীরগিরী ছেড়ে শুরা মানেন না। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে মতের ভিন্নতা ও আরও বিভিন্ন কারণে দু'একজন চলে যাওয়া নতুন কোনো বিষয় নয়। এরকম নজীর দ্বিতীয় ইদারাগুলোতে বহুত রয়েছে। কেউ বাহির হয়ে আলাদা কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন করতে পারেন, কেউ পারেন না। তবে এইভাবে বাহির হওয়ার ঘটনার অনেক উদাহরণ আমাদের কাছে রয়েছে, যেগুলোর উল্লেখ সুখকর নয় বলে আমরা উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম। দেওবন্দ এক্ষেত্রে জড়াবে না। এখন আমরা যদি নিজেরা জড়ায় এবং এইভাবে সব মহলেই যদি জড়ানোর আদর্শ যিন্দা হয় তাহলে একটু ভেবে দেখুন, ইসলামি জগতে কত বিশৃঙ্খলা আসতে পারে।

বিব্রু: বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, ৬ বার রুজু করার পরও ওলামায়ে কেরাম কেন মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) এর ব্যাপারে নিজ অবস্থানে অনড় রয়েছেন?

উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা হয়ে থাকে, বিগত ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ ইসায়ী তারিখে দেওবন্দ যে ঘোষণা পত্র প্রকাশ করেছে তাতে বলা হয়েছে, ওলামায়ে দেওবন্দ মাওলানা সা'আদ সাহেবের ব্যাপারে 'মুতমায়িন' নন। আসলেই কি তাই? ব্যাপারটি তাহকিক করতে বিগত ১৮ এপ্রিল ২০১৮ ইসায়ী তারিখে বাংলাদেশী ওলামায়ে কেরামের একটি জামাত কাক্সলা ও সাহরানপুসহ দেওবন্দ মাদ্রাসা সফর করেন। সফরকালে দেওবন্দের প্রবীণ উস্তায় বাহরুল উলুম আল্লামা নি'য়ামাতুল্লাহ আজমী সাহেব বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরামের কর্মকাণ্ড নিয়ে বারবার দুঃখ প্রকাশ করেন।

উক্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি সুস্পষ্ট করে একাধিকবার বলেন, “ ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ ইসায়ী তারিখে প্রকাশিত পত্রে একদম শুরুতে স্পষ্টভাবে রুজু কবুল হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা আছে। এরপর যা বলা হয়েছে তা ব্যক্তিগত রায় মাত্র। ব্যক্তি বিশেষের রায় নিয়ে তো বাড়াবাড়ি করার কোনো সুযোগ নেই। বরং কারো ব্যক্তিগত রায়ের সাথে অন্যরা দ্বিমত করতেই পারে।”

আযমী সাহেব আরও বলেন, “সেখানে (উক্ত ঘোষণাপত্রে) বলা হয়েছে, ধারণা করা হচ্ছে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বাইরে নতুন কোনো জামাত তৈরি করতে পারেন। এটাতো ভবিষ্যতের কথা, তাও ধারণা প্রসূত। এটার কি কোনো গ্রহণযোগ্যতা আছে। ভবিষ্যতের কোনো বিষয়ে ধারণানির্ভর রায় দেওয়ার কোনো বিধান কি শরিয়তে আছে? তারপরও বাংলাদেশি ওলামায়ে কেরাম এটাকে কেন্দ্র করে এত ভূমিকা রাখছেন কেন?”

প্রতিনিধিদলের একজন উত্তরে বলতে চাইলেন, “ হয়তো দেওবন্দের উস্তায়ের মহব্বতের কারণেই তারা এমনটা করছেন। ” তার কথা থামিয়ে দিয়ে আজমী সাহেব বলেন, “ কেন? তারা কি তাহকিক করার প্রয়োজন মনে করেন না? চিলে কান নিয়ে গেলো শুনেই দৌড় দিতে হয় নাকি? কানের জায়গায় একটু হাত দিয়ে তাহকিক করা যায় না?”

পরিশিষ্ট : বাহরুল উলুম আজমী সাহেবের সাক্ষাতকারের পুরা অডিও রেকর্ড অবিকলভাবে আমাদের প্রকাশনীতে সংরক্ষিত আছে। সত্যসন্ধানীদেরকে সহযোগিতার জন্য আমাদের প্রকাশনী সদা প্রস্তুত।

পরিশেষে অনুরোধ থাকবে, দেওবন্দের নাম অপব্যবহার করে যারা উম্মতকে দ্বিধান্বিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন তারা আল্লাহর ওয়াস্তে পূর্ণ তাহকিকের সাথে প্রতিটি প্রদক্ষেপ গ্রহণ করুন। নতুবা চিলের পিছে দৌড়াতে গিয়ে ক্লান্ত শরীরে কানে হাত দিয়ে আতকে ওঠা ব্যক্তির ন্যায় আপনাকেই লজ্জিত হতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দূরদর্শিতা দান করুন। আমীন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

বিভিন্ন কাগজ-পত্রে, মজলিসে ও আলোচনা-সমালোচনায় মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ) উপর আরও কিছু ভুল আরোপ করা হয়ে থাকে, যেগুলো অভিযোগকারীরা যেভাবে উল্লেখ করে থাকে সেভাবে উল্লেখ করে দিলেও এগুলো ভুল হয় না, একেকটা অনুসরণীয় 'মালফূজ' (বাণী) হয়ে যায়।

১. নং মালফূজ :

যারা গোপনে গুনাহ করে এরা বেহায়া, আর যারা প্রকাশ্যে গুনাহ করে এরা বেহায়া নয়, এরা জানোয়ার।

তাফসিল :

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

অর্থাৎ হায়া বা লজ্জা ঈমানের অংশ (বুখারি, হাদিস নং-৯, মুসলিম, হাদিস নং-৫৭)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. ফাতহুল বারিতে উল্লেখ করেন,

وقد يتولد الحياء من الله تعالى من القلب في نعمه فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته

অর্থঃ হায়া আসে আল্লাহর কারণে, আল্লাহর নিয়ামতে হাবুডুবু খাওয়ার দরুন বুদ্ধিমান নিয়ামত দ্বারা গুনাহের কাজে সাহায্য নিতে লজ্জাবোধ করেন। (১/৭৫)

অনেকে গোপনে গুনাহ করতে লজ্জাবোধ করে না, প্রকাশ্যে মানুষের সামনে গুনাহ করতে লজ্জাবোধ করে। মুহতারাম মাওলানার দৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার দিকে। লজ্জা তো আল্লাহ তা'আলাকে করা উচিত। গোপনে যারা গুনাহ করে, আল্লাহ তা'আলাকে লজ্জাবোধ করে না, এরা বেহায়া, নির্লজ্জ। আর যারা প্রকাশ্যে দশজনের সামনে গুনাহ করে এদের আবার হায়া কী! এদের নির্লজ্জতা তো জানোয়ারের স্তরে পৌঁছে গেছে। এরা বেহায়া নয়, এরা জানোয়ার। জানোয়ারের মত আল্লাহকেও লজ্জাবোধ করে না, আল্লাহর কোনো মাখলুককেও লজ্জাবোধ করে না। কী সুন্দর কথা। হাদিসের নির্যাস। এখানে মুহতারাম মাওলানা বেহায়াপনার দুটি স্তরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এসব কথার মধ্যে আমাদের ইসলাহ রয়েছে। আল্লাহ, মুহতারাম মাওলানাকে এজাতীয় কথা বলার তাওফিক আরও বেশি করে দাও।

এক বিভ্রান্তকারীর কান্ড :

মুহতারাম মাওলানার এই মূল্যবান বাণীটিকে কাট করে শুধু 'গোপনে গুনাহ করলে বেহায়া, প্রকাশ্যে গুনাহ করলে বেহায়া নয়' কয়েক সেকেন্ডের অডিও রেকর্ডের এতটুকু প্রকাশ করে বলে বেড়াচ্ছে, “এই সা'আদ (মুহতারাম মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ)) প্রকাশ্যে গুনাহের বৈধতা দিয়ে দিচ্ছে। প্রকাশ্যে গুনাহ করা যাবে, প্রকাশ্যে গুনাহ করলে বেহায়া হবে না। ইসলামটাকে সে ধ্বংস করে যাচ্ছে।” নায়ুবিব্লাহ মিন যালিকা। আমরা তাকে মিথ্যুক বা বিভ্রান্তিকারী বলা ছাড়া তৃতীয় কোনো রাস্তা আমাদের নেই। কেননা, হাদিসে আছে, তাহকীক ছাড়া শুনে শুনে কথা প্রচার করাই মিথ্যুক হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

২.নং মালফূজ :

এই যামানার রেওয়াজি তরিকাগুলো সাহাবাদের যামানায় ছিল না। সুযোগ আসলো তো পত্রিকায় একটা কলাম লিখে দিলাম। এই রেওয়াজি তরিকাগুলোর দ্বারা রেওয়াজের তারাক্বি হবে, দীন প্রসার হবে না।

তাফসিল :

হযরতজি মাওলানা ইউছুফ রহ. বলতেন,

এই কাজের প্রচার-প্রসারের জন্য রেওয়াজি তরিকাগুলো, পত্রিকা, ইশতিহার, প্রেস ইত্যাদি এবং রেওয়াজি শব্দসমূহ থেকে পুরাপুরি পরহেজ করা জরুরী। এই কাজ পুরোটাই গাইরে রেওয়াজি। রেওয়াজি তরিকাগুলোর দ্বারা রেওয়াজের শক্তি যুগাবে, এই কাজের কিছুই (উপকার) করবে না।

(আহম খত, পৃষ্ঠা-১৩)

প্রিয় পাঠক, এ জাতীয় মালফূজ (বাণী) এই মেহনতের পূর্ব আমীরগণের যবান থেকেও বের হয়েছে। ইসলাম ইসলামি তরিকায় প্রচার হওয়াই উচিৎ, গাইর তরিকায় ইসলাম প্রচার করলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি এবং এর দ্বারা গাইরের প্রচারও হয়। এই বাণীটিতে আমাদের কাজ করার জন্য সুন্দর পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এইভাবে কাজ শুরু করেছেন। গাইর তরিকাকে বর্জন করে চলেছেন। তাছাড়া আমাদের আকাবির হযরতগণের বিভিন্ন কথা, ফাতোয়া ও প্রবন্ধের সারনির্যাস এই বাণীটির মধ্যে রয়েছে। একটু ভেবে দেখুন তো, গাইর তরিকার শ্লোগান দিয়ে আমরাই আকাবিরগণের মেযাজ থেকে দূরে ছিটকে পড়ছি কিনা?

৩. নং মালফূজ :

দাওয়াত এবং ইবাদত দুটোকেই জমা করো। এই জন্যে যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত ছাড়া ইবাদতে লাগবে সে ইবাদতে কীভাবে তারাক্বি করবে।

তাফসিল :

মুহতারাম মাওলানার এই বাণীটি সূরা হা-মীমের ৩৩ নং আয়াতের খুলাসা-

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 'ওয়াও' হরফ দ্বারা দাওয়াত ও ইবাদত দুটোকেই জমা করেছেন।

হাদিসে আছে, দাওয়াত ছাড়া ইবাদতে লাগার কারণে বনি ইসলাইলের এক বুয়ুর্গ ব্যক্তিকে তার কওমের সাথে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। দাওয়াতবিহীন শুধু ইবাদতগুয়ার তো ফাসেক। এই বাণীর সত্যতা আহলে ইলম সবার কাছে স্পষ্ট। অভিযোগকারী কীভাবে এই বাণীটিকে এমন একটি ভুল হিসাবে দাড়া করালো যার জন্যে সারা দুনিয়ায় বিস্ময় খেলা করতে হবে।

৪. নং মালফূজ :

লোকেরা জিজ্ঞাসা করে তোমাদের ইসলাহি তায়াল্লুক কার সাথে? তোমরা বলো, আমার ইসলাহি তায়াল্লুক দাওয়াতের সাথে। যে ব্যক্তি দাওয়াতে লেগেও নিজের ইসলাহের জন্যে কোনো বুয়ুর্গের সুহবতের জরুরত অনুভব করে সে দাওয়াতকে বুঝেই নাই।

তাফসিল :

মুহতারাম মাওলানা ঠিকই বলেছেন। যারা এরকম কথা বলে এরা দাওয়াতকে বুঝেই নাই। যারা বুঝেছে তারা এমন কথা কখনো বলবে না।

দেওবন্দের মুহতামিম ক্বারি তৈয়ব রহ. বলতেন, “বহরহাল, ইসলাহি নফসের চারটা অংশ এবং চারটা তরিকা। তাবলিগের ভিতর চারো তরিকা জমা হয়ে গেছে। সুহবতে সালেহও আছে। যিকির ও ফিকিরও আছে। মুওয়াখাত ফিল্লাহও আছে। মুহাসাবায়ে নফসও আছে। এই চারটির সমষ্টির নাম তাবলিগি জামাত। সাধারণ মানুষের জন্য ইসলাহে নফসের এর চাইতে উত্তম তরিকা হতে পারে না। এই কর্মপদ্ধতির দ্বারা দ্বীন আম (ব্যাপক) হতে চলেছে।” ((উর্দূ) জামাতে তাবলিগ পর এ’তেরাজ কী জওয়াবাত : ক্বারি তৈয়ব সাহেব রহ. পৃষ্ঠা-১১৪-১১৬)

সুতরাং নবীওয়ালা দাওয়াতে লেগেও যারা ইসলাহে নফসের জন্য ভিন্ন কোনো রাস্তা খুঁজে তারা আসলে দাওয়াতকে বুঝেই নাই।

৫. নং মালফূজ :

তাবলিগের ছয় নম্বর পুরা দ্বীন। যে ব্যক্তি এই ছয় নম্বরকে পুরা দ্বীন না বুঝে সে নিজের দইকেই ঠক বলনে ওয়ালা। এরকম মানুষ কখনো তিজারত করতে পারবে না।

তাফসিল :

আল্লামা বুরহানুদ্দিন মিরগেনানি হানাফি রহ. হিদায়া কিতাবে দ্বীনকে ঈমানিয়াত, ইবাদাত, মুআমালাত, মুআশারাত ও আখলাক, এই পাঁচ অধ্যায়ে বর্ণনা করার কারণে অন্যান্য ইমামগণ এই হানাফি মাযহাবকে নাকিছ মাযহাব ঘোষণা করা থেকে বিরত থেকেছেন। মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর যামানায় উলামাদের ঐক্যমতে পরিপূর্ণ দ্বীন হাছিল করার মেহনত ও পরিপূর্ণ দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য এই ছয় সিফাতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যে ছয় সিফাতে হিদায়ার পাঁচ অধ্যায় সহ দাওয়াত ও তাবলিগ অতিরিক্ত আছে। তাহলে এই ছয় নম্বর পুরা দ্বীন হবে না? আমাদের মহান ইমামগণ থাকলে এই ছয় নম্বরকে ঠিকই পুরা দ্বীন ও দ্বীনের মেহনত মেনে নিতেন। অবশ্যই আমাদের মত সংকীর্ণতা করতেন না। কারণ, ‘মুনতাখাব হাদিস’ কিতাবটি ছয় সিফাতের উপর জামে মানে কিতাব। কোনো কোনো আলেম বলে থাকেন, যদি আমরা এই কিতাবের নাম রাখতাম তবে ‘কুরআন ও হাদিসের আলোকে ছয় সিফাত পরিপূর্ণ দ্বীন’ রাখতাম।

৬. নং মালফূজ :

তাবলিগে বের হওয়া দ্বীন শেখার জন্য নয়, দ্বীনই যদি শিখতে হয় তো আরও অনেক রাস্তা আছে। তাবলিগে বের হওয়া তো সত্তাগতভাবে মাকসূদ।

তাফসিল :

দাওয়াত দেওয়া ও তাবলিগ করা ‘হাসান লি আইনিহি’ অর্থাৎ সত্তাগতভাবে ভালো এবং মাকসূদও। তাবলিগ করা আল্লাহ পাকের হুকুম এবং সমস্ত সাহাবাবের তরিকা। তাবলিগে বের হওয়া দ্বীন। তাবলিগে বের হওয়া দ্বীনের মাধ্যম নয়। আর দাওয়াত ও তাবলিগ পূর্ণাঙ্গ হাসিল করার সাহাবাওয়ালা মেহনত।

৭. নং মালফূজ :

সাহাবাগণ ঈমান আনার পর মদিনা থেকে ফিরে নিজের এলাকায় যাওয়াটাকে ইরতেদাদ মনে করতো। সুতরাং মারকায থেকে আলাদা হওয়াকে তোমরা সাধারণ মনে করো না।

তাফসিল :

মুসলমানদের আলমি জামাতের আলমি মারকায, যে মারকাযে আলমি যিম্মাদার থাকেন, আলমি পরামর্শ হয়, সারা আলম নিয়ে ফিকির ও মেহনতের তারতিব হয় সে মারকাযের এমনই গুরুত্ব হয়ে থাকে।

৮. নং মালফূজ :

দাওয়াতকে সীরতে সাহাবার দ্বারা সরাসরি বুঝা উচিত। অতীত বা বর্তমানের ব্যক্তিত্বের দ্বারা উপকার নেওয়া এবং ওনাদের আলোচনা করা দাওয়াতকে উচু ছাতা থেকে নিচে নামিয়ে ফেলা।

তাফসিল :

অসংখ্য হাদিসে নবী ও সাহাবাদের সুন্নতকে অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। এই বাণীতে মুহতারাম মাওলানা অনুসরণীয় শ্রেষ্ঠ যুগকে অনুসরণ করার কথা বলাতে দোষের কিছু হতে পারে। আমাদের আকাবির ও আকাবির পূর্ব বড় ইমাম ফকিহ, ওনারা দীন ও ইসলামের অনেক বড় বড় কাজ করেছেন। আমাদের উপর এহসান করেছেন। ওনাদের পায়ের ধূলার সমানও আমরা নয়। তারপরও সাহাবা ও তাবীয়ীন, তাবী' তাবীয়ীনদের যুগে যে পূর্ণতা ছিল, তাদের যুগে সে পূর্ণতার কমতি অবশ্যই রয়েছে। সুতরাং আমাদের আদর্শ হবে সাহাবাদের সীরত থেকে এই কাজকে বুঝা। সাহাবাদের মত কাজ করার যোগ্যতা হাসিলের চেষ্টা করা।

৯. নং মালফূজ :

দ্বীনের উপর চলনেওয়ালা দ্বীনদার বটে, কিন্তু দ্বীনের নুসরতকারী নয়। দায়ী হলো দ্বীনের নুসরতকারী।

তাফসিল :

কুরআন পাকের পরিভাষায় দ্বীনের নুসরতকারীকে 'আনসারুল্লাহ' বলা হয়। নবীরা 'মান আনাসারি ইল্লাল্লাহ' বলে দ্বীনের নুসরতের জন্য আহবান জানাতেন।

মাওলানা মনজুর নোমানির রহ. লিখেছেন,

একদিন কোনো এক ওয়াক্তের নামায জনৈক বুয়ুর্গ পড়ান, নামায শেষে তিনি এই দুআ করেন, যা হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস রহ. অধিকাংশ সময় করতেন।

اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم
অর্থঃ হে আল্লাহ, যে মুহাম্মাদ সা. এর দ্বীনের সাহায্য করে তুমি তার সাহায্য করো, আর যে মুহাম্মাদ সা. এর দ্বীনকে বেইজ্জত করে তাকে তুমি বেইজ্জত করো। হযরতজি তার উপর তিন বার উঁচা আওয়াজে বিশেষ দরদের সাথে ফরমাইলেন, হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে সেই দলভুক্ত করো না। অতপর লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, ভাইগণ এই দুআর প্রতি চিন্তা করুন। এটা এমন একটি দুআ ও বদ দুআ যা সর্বযুগে আল্লাহর খাছ বান্দাগণ করে গিয়েছেন। এটা অতি ভারি দুআ।.....এখন প্রত্যেকেই এই দুআকে নিজের সাথে মিলিয়ে দেখুন যে, তিনি কি নেক দুআর অংশিদার হচ্ছেন, নাকি বদ দুআর নিশানা বনতেছেন। এইটাও খিয়াল থাকে যে, নিজের নামায পড়া রোজা রাখা যদিও বড় দরজার ইবাদত হোক না কেন কিন্তু এটা দ্বীনের নুসরতের কাজ নয়। দ্বীনের নুসরত তো এটাই যে যেটা কুরআন পাক ও আল্লাহর রসূল সা. নুসরত বাতলিয়েছেন। এর জন্য আসল এবং মাকবূল তরিকা হলো যে কাজের প্রচলন স্বয়ং নবী সা. করে গেছেন বর্তমানে সেই তরিকা তাজা ও যিন্দা করার কোশেশ করাই হলো দ্বীনের সবচে বড় নুসরত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তার তাওফিক দান করুন।

(মালফূজ নং ২৩)

১০. নং মালফূজ :

নবী পাক সা. রমাযানে ফরজ রোযাকে ভাঙ্গাইছেন কিন্তু নকল ও হরকতের মধ্যে কমতি আসতে দেয়নি।

তাফসিল :

মুহতারাম মাওলানার এই বাণীটি একটি সহিহ হাদিসের সারনির্যাস।

১১. নং মালফূজ :

এই মাকামের এহতেমাম করো। দুনিয়ার হাল এইযে, মক্কা ও মদিনার পরে যদি কোনো জায়গা ইহতেরামের যোগ্য, অনুসরণের যোগ্য, ইতায়াতের যোগ্য ও আজমতের যোগ্য থেকে থাকে সেটা হলো বাংলা ওয়ালি নিজামুদ্দিন মসজিদ।

তাফসিল :

আলমি মারকাযের এমনই শান হয়ে থাকে। আলমি মারকাযকে হেফাজত করা, সম্মান করা এবং মারকাযের পূর্ণাঙ্গ ইতায়াত করা গোটা মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব।

১২. নং মালফূজ :

দ্বীন প্রচারের জন্য মুসলমান স্বয়ং নিজে আমল নিয়ে যাওয়া। ব্যস, এটাই দ্বীনের প্রচারের মাধ্যম। কোনো মাধ্যমকে এর বিকল্প বুঝা অনেক অবুঝের কথা। আল্লাহর রাস্তায় যেয়ে দাওয়াত দেওয়া হুবহু সুনাত। এই কাজ সুনতের সাদৃশ্য এমন নয়, এইটা সুনতের নিকটবর্তী এমনও নয়, বরং হুবহু সুনত।

তাফসিল :

অন্যান্য মাধ্যম অপারগতার কারণে ব্যবহারের বৈধতা পেতে পারে। মাসনূন তরিকার বিকল্প বুঝা আসলেই অবুঝের কথা। তবে যে সকল বৈধ মাধ্যম ব্যবহারকারীকে আস্তে আস্তে অবৈধ কাজের দিকে নিয়ে যাবে তখন বৈধ মাধ্যমও অবৈধ হয়ে যাবে। দাওয়াতের দরজা দিয়ে এসকল বৈধ মাধ্যমে প্রবেশ করে মা'সিয়াতের দরজা দিয়ে অবৈধ মাধ্যম থেকে বেরিয়ে আসে।

১৩. নং মালফূজ :

এটা আলমি মারকাযের আলমি মাশওয়ারা, দুটি আলাদা আলাদা নয় যে, আলমি মাশওয়ারা আলাদা এবং আলমি মারকায আলাদা। এইটা সম্ভবই নয়। কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভব নয়। কেননা, এটা আলমি মারকায এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

তাফসিল :

এই মালফূজের মাধ্যমে মুহতারাম মাওলানা আমাদের কাছে অনেককিছু স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেখানে আলমি আমীর থাকবে সেখানেই আলমি মাশওয়ারা হবে এবং সেটাই আলমি মারকায হবে। কিয়ামত পর্যন্ত এই আলমি মারকায বহাল থাকা, এর জন্যে আল্লাহর কাছে আশা করা, দুআ করা ও ফিকিরের সাথে মেহনত করা, এতে দোষের কী? আল্লাহ চাইলে কি না হয়। কেউই কি এই ধারণা করেছিল যে, জংগলের ভিতরে তিন কাতারের এই বাংলা ওয়ালি নিজামুদ্দিন মারকায মসজিদ আলমি মারকায হবে। অথচ একশ বছর ধরে এই মসজিদ আলমি মারকায হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরাও আশা করি, এই আলমি মারকায কিয়ামত পর্যন্ত থাকুক। আলমি মারকায শূন্য যেন দুনিয়া না হয়।

এক অভিযোগকারীর হাস্যকর বক্তব্য :

তিনি মন্তব্য করেন, তিনি (মুহতারাম মাওলানা) তো আলিমু গাইব নয়। তাহলে তিনি জানলেন কী করে যে, কিয়ামত পর্যন্ত এই মারকায থাকবে। অথচ আরেক অভিযোগকারী এক সময় এই মারকায সম্পর্কে বলেছিল, এই নিজামুদ্দিন মারকাযে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর আহ ও আসু এখনো বাকি আছে। কিয়ামত পর্যন্ত এটাই মারকায থাকবে।

প্রিয় পাঠক, এ জাতীয় অগ্রীম কথা আমাদের জীবনে হাজার হাজার কথা আছে। এসব কথা সাধারণত অভিজ্ঞতা, ধারণা ও আশা ভিত্তিক হয়ে থাকে। এসব কথার অর্থ আলিমুল গাইব হওয়া নয়। আলিমুল গাইব তো আল্লাহ পাকের এক জাত, একথা সবাই জানে।

১৪. নং মালফূজ :

কিসরা হুকুমত টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়ার কারণ রসূল সা. এর চিঠি ছিড়া নয়, বরং দাওয়াতকে টুকরা করা।

তাহসিল :

হ্যা, একটা কাগজ ছিড়া মূল অন্যায় নয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে অপমান করা হলো আসল অন্যায়। আর এই অপমান প্রকাশ পেয়েছে চিঠি ছিড়ার মাধ্যমে। সুতরাং নবীওয়ালা এই দাওয়াতকে ছোট করে দেখা যাবে না। দাওয়াতকে অপমান করা যাবে না।

১৫. নং মালফূজ :

ফায়সাল অর্থাৎ আমীরের সামনে শুরার অবস্থান শুধু এতটুকু যতটুকু অবস্থান মুক্তাদির থাকে ইমামের পিছনে। মুক্তাদি ইমামের প্রয়োজনে লুকমা দিবে। যদি তিনি লুকমা গ্রহণ করেন তো ঠিক আছে। নতুবা নামাযকে ইমামের যিম্মায় ছেড়ে দিবে।

তাহসিল :

ইমাম মুক্তাদির লুকমা গ্রহণ না করলে মুক্তাদি সালাম পর্যন্ত সবরই করতে হবে। নামায ভাঙ্গার মত ভুল হলে নামাযের পর ইমামকে জানিয়ে দিবে। তদ্রূপ মাশওয়ায় আহলে শুরা হযরতগণ আমীরের কাছে রায় পেশ করবেন, আমীর রায় গ্রহণ করুক বা না করুক শরিয়তের খেলাফ ফায়সালা না দিলে ফায়সালা মেনে নিবে। আর শরিয়তের খেলাফ হলে আমীরকে জানিয়ে দিবে।

১৬. নং মালফূজ :

‘খুরুজ’ এবং ‘নফর’ ব্যতিত সাহাবাদের যামনায় দাওয়াতের কোনো কল্পনাও ছিল না। এই যামনায় মুসলমানগণ ‘খুরুজ’ এবং ‘নফর’ ব্যতিত দাওয়াতের কল্পনা করতে শুরু করেছে। বরং ‘দাওয়াত’কে খুরুজ ব্যতিত ‘দাওয়াত’ বুঝতে শুরু করেছে। একশতে একশ’ সব সাহাবা নকল ও হরকতের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। কোনো একজন সাহাবিও খুরুজের বাইরে ছিলেন না। এটা একটা পাকা কথা।

তাহসিল :

যান্ত্রিক মাধ্যমে শুধু আপন স্থানে বসে বসে দাওয়াত দেওয়া নবী ও সাহাবাদের যুগে আল্লাহ তা’আলা প্রচলন ঘটাননি। যদি এই সকল মাধ্যমে বিশেষ কোনো ফায়দা থাকতো তাহলে এসব পাওয়ার সবচে বেশি হকদার ছিলেন নবী সা. ও সাহাবা রাদি।

১৭. নং মালফূজ :

ব্যবসায়ীর চিন্তায় এটা আছে যে, দোকান আমি সাজাবো, এর মধ্যে সফলতা আল্লাহ তা’আলা দিবেন। আমার অবাক লাগে, যখন আমাদের সাথীরা এই বলে যে, ভাই দুনিয়া দারুল আসবাব, এই জন্য দোকান জরুরী, ব্যবসা জরুরী। এসব করে আল্লাহ তা’আলাকে বলো, তিনি যেন এসবের মধ্যে সফলতা দিয়ে দেন। কখনোই এমন নয়। বরং আমার দোস্তো আল্লাহ তা’আলার সফলতা দেওয়ার নিয়ম আসবাব নয়, বরং তাঁর হুকুমসমূহ

পুরা করা। আসবাব গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলার কাছে সফলতার আশা করা তাওয়াক্কুল নয়। এই নিয়ম তো বেঈমানেরও জানা আছে।

তাফসিল :

ইসলাহের জন্য কত সুন্দর নসিহত। হুকুম যিন্দা করার ফিকির নেই। আসবাদ যিন্দা করতে করতে জীবন যৌবন সব শেষ করে দিচ্ছি। এজাতীয় বানীর মধ্যে আমাদের ইসলাহ রয়েছে। আল্লাহ, তুমি মুহতারাম মাওলানার হিম্মত আরও বাড়িয়ে দিন। সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার তাওফিক তুমি ওনাকে আরও বেশি করে দাও। আমীন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ :

মুসলিম জামাত ও ইমারত

জামাত ও আমীরের আবশ্যিকতা :

ইদানিং দ্বীনি মহলে একটা বাক্য খুব শুনা যায়। “ব্যক্তিপূজা করা যাবে না। আমরা ব্যক্তিপূজা করি না। আমরা আল্লাহর জন্য তাবলিগ করি। কোনো ব্যক্তির জন্য আমরা তাবলিগ করি না।”

প্রিয় পাঠক, “পূজা” শব্দটা সাধারণত হিন্দুদের পরিভাষাগত একটা শব্দ। বারো মাসের তেরো পূজা। হিন্দুরা মূর্তির পূজা করে। মুসলমানগণ সাধারণত ‘পূজা’ এর স্থানে ইবাদত, ইত্যাত ও বন্দেগি ইত্যাদি বলে থাকে। সুতরাং মুসলমানগণ বলে, আমরা আল্লাহর ইবাদত করি, আল্লাহর ইত্যাত করি, আল্লাহর বন্দেগি করি। কিন্তু আমরা আল্লাহর পূজা করি, মুসলমানগণ এইভাবে বলে না। পূজার পরিবর্তে ইবাদত ইত্যাত, বন্দেগি ও গোলামি ইত্যাদি বলে থাকে। সুতরাং ‘ব্যক্তিপূজা’ না বলে ব্যক্তির ইত্যাত বলা উচিত।

এবার আসুন দেখি, ইসলামে ব্যক্তির ইত্যাতের কথা বলা আছে কি? ইসলাম গবেষক সমস্ত আলেম ফকিহ মুজতাহিদ মুহাদ্দিস একমত যে, ব্যক্তির ইত্যাতে ইসলাম ভরপুর। ব্যক্তির ইত্যাত ব্যতীত ইসলাম প্রতিষ্ঠিতই হয় না। মুসলমানদের ছোট্ট একটি জামাত, নামাযের জামাত, এই জামাতের মুক্তাদিদের উপর ইমাম ব্যক্তির ইত্যাতকে ইসলামে ওয়াজিব করে রেখেছেন। ইমামের ইত্যাতবিহীন মুক্তাদির নামায হবে না। ইমামের ইত্যাত ওয়াজিব ও অতি আবশ্যিক। আমরা নামাযে ইমামের ইত্যাত করি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যেই।

দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের বড় জামাত অর্থাৎ পৃথিবীর সব মুসলমান মিলে এক জামাত, এই জামাতের আমীরের ইত্যাতকে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল আবশ্যিক করে দিয়েছেন। মুসলমানদের ছোট্ট জামাতের ছোট্ট ইমামের ইত্যাত নামাযে যেমন জরুরী তার চেয়ে বেশি জরুরী মুসলমানদের বড় জামাতের বড় ইমাম বা আমীরের ইত্যাত। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে জামাতবদ্ধভাবে থাকতে বলেছেন এবং জামাতের আমীরের ইত্যাত করতে বলেছেন। আমীরের ইত্যাত না থাকলে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা হবে। আর মুসলমানদের জামাতে ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। তাছাড়া আমীরের সাথে সংশ্লিষ্ট শরিয়তের অসংখ্য বিষয় রয়েছে। সুতরাং আমরা আমীরের ইত্যাত করি আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্য।

আমীরের ইতায়াতের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। ব্যক্তির ইতায়াত, যাকে লোকে বলে ব্যক্তিপূজা আমরা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই করে থাকি।

আকায়েদ ও ফিকহের কিতাবগুলো মুতাল্লাআ' করলে পরিস্কারভাবে জানা যায় যে, সমস্ত সাহাবা, তাবয়ীন, তাব' তাবয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন আহলে হক ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল ওলামা ও ফুকাহা এ কথার উপর একমত যে, মুসলমানদের একজন আমীর থাকা ওয়াজিব ও আবশ্যিক, বরং অতি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। যেরকমভাবে ইসলামের প্রথম যুগ সাহাবাদের যুগে সকল মুসলমান জামাতবদ্ধভাবে ছিলেন এবং তাদের একজন আমীর ছিলেন, যাকে খলিফা, আমীরুল মুমিনিন বলা হয়। ঠিক একই ভাবে সাহাবা ও তাবয়ীনদের স্বর্ণ যুগের মত হর যামানায় কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানগণ জামাতবদ্ধভাবে থাকা এবং তাদের একজন আমীর থাকা অতি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব ও আবশ্যিক।

মাদ্রাসা সিলিবাসে আকায়েদের সর্বোচ্চ পাঠ্যবই 'শরহুল আকায়েদ আন নাসাফিয়াহ' গ্রন্থে আল্লামা সা'আদ উদ্দিন তাফতায়ানি রহ. লিখেছেন,

في شرح العقائد النسفية

ثم الإجماع على أن نصب الإمام واجب وإنما الخلاف في أنه يجب على الله أو على الخلق بدليل سمعي أو عقلي والمذهب أنه يجب على الخلق سمعا لقوله عليه السلام من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية ولأن الأمة قد جعلوا أهم المهمات بعد وفات النبي عليه السلام نصب الإمام حتى قدموه على الدفن وكذا بعد موت كل إمام ولأن كثيرا من الواجبات الشرعية يتوقف عليه كما أشار إليه بقوله والمسلمون لا بد لهم من إمام الخ

(১) অর্থঃ মুসলমানদের একজন ইমাম নির্ধারণ করা ওয়াজিব এর উপর 'ইজমা' সংঘটিত হয়েছে। ইমাম নির্ধারণ করা আল্লাহ তা'আলার যিম্মায় ওয়াজিব নাকি নকলি ও আকলি দলিলভিত্তিক আল্লাহ তা'আলার মাখলুক বান্দাদের উপর ওয়াজিব এই নিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও শিয়াদের এক দলের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাযহাব হলো, ইমাম নির্ধারণ করা বান্দাদের উপর ওয়াজিব। তা নকলি দলিল দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন, (১) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ তার যামানার ইমামকে চিনলো না তাহলে সে জাহিলি মৃত্যুবরণ করলো। (২) মুসলিম উম্মাহ নবীর ইস্তিকালের পরে ইমাম নির্ধারণ করার বিষয়টি সবচে' বেশি গুরুত্বপূর্ণ সাব্যস্ত করেছেন। এমনকি সে বিষয়টিকে নবীর দাফনের আগে নিয়ে এসেছেন। অনুরূপ প্রত্যেক ইমামের ইস্তিকালের পর উম্মাহ ইমাম নির্ধারণ করার বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। (৩) তাছাড়া শরিয়তের অনেক ওয়াজিব ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ইমামের উপর নির্ভর করে থাকে যে দিকে ইশারা করে আল্লামা নাসাফি রহ. বলেছেন, মুসলমানগণের জন্য একজন আমীর থাকা অতি জরুরী...

(শরহুল আকায়েদ, পৃষ্ঠা- ১৫২)

ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. লিখেছেন,

في السياسة الشرعية لابن تيمية (20)
الفصل الثامن: وجوب اتخاذ الإمارة

يجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم"، رواه أبو داود، من حديث أبي سعيد

وأبي هريرة. أحمد فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيهها على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله - تعالى - أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم، وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ولهذا روي: "أن السلطان ظل الله في الأرض"، ويقال: ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان. والتجربة تبين ذلك. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: "لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم"، رواه مسلم وقال: "ثلاث لا يغفل عنهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم". رواه أهل السنن إلا ابن ماجه، أحمد: وفي الصحيح عنه أنه قال: "الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة"، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" مسلم: فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرب بها إلى الله،

(২) অর্থঃ অষ্টম পরিচ্ছেদ : ইমারত গ্রহণ করা (আমীর নির্ধারণ করা) ওয়াজিব। জানা জরুরী যে, মানুষের অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্ব অর্থাৎ আমীর নির্ধারণ করা দ্বীনের অনেক বড় একটি ওয়াজিব। বরং ইমারত ছাড়া দ্বীন কায়েম হয় না। কেননা, বনি আদম একজন আরেকজনের প্রতি প্রয়োজন থাকার কারণে তাদের মাসলাহাত ও বিষয়াবলি ইজতেমা ও ঐক্য ছাড়া পূর্ণ হয় না। আর ইজতিমার সময় তাদের একজন নেতা থাকা জরুরী। এমনকি নবী সা. বলেছেন, যখন তিন জন কোনো সফরে বের হবে তখন তারা যেন তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়। (আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদ) সুতরাং সফরের ছোট্ট জামাতে একজনকে আমীর বানানোকে আল্লাহর নবী আবশ্যক করে দিলেন সকল প্রকারের জামাতের উপর সতর্ক করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সং কাজের আদেশ ও অসং ও অন্যায় কাজের নিষেধ আবশ্যক করে দিয়েছেন। আর এ দায়িত্ব পূর্ণ হবে না শক্তি ও ইমারত ছাড়া। অনুরূপ তিনি আরও যা ওয়াজিব করেছেন যেমন, জিহাদ, আদল ও ইনসার, হজ্জ কায়েম করা, জুমা ও ঈদ কায়েম করা, মাজলুমকে সাহায্য করা, হুদুদাত কায়েম করা, এসব ইমারাত ও শক্তি ছাড়া পূর্ণ হবে না। এই জন্যে বর্ণিত আছে, সুলতান (আমীর) হলো যমিনে আল্লাহ তা'আলার ছায়া। আরও বলা হয়ে থাকে যে, একজন সুলতান (আমীর) হীন এক রাতের চেয়ে একজন জালেম ইমামের ষাট বছরও বেশি 'আসলাহ' (সংশোধিত)। অভিজ্ঞতা এটা প্রমাণ করে। এই জন্যে ফুযাইল ইবনে আয়ায ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. সহ অন্যান্য সালাফগণ বলে থাকেন, যদি আমাদের এমন একটা দুআ হতো যেটা কবুল হবে তাহলে সেটা দিয়ে আমরা সুলতান (আমীর) এর জন্যে দুআ করতাম। নবী সা. বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের তিনটি জিনিস পছন্দ করেন। (১) তোমরা আল্লাহ ইবাদত করবে এবং তোমরা তাঁর সাথে কোনো কিছু শরিক করবে না। (২) তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আকড়িয়ে ধরো এবং তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে না। (৩) যাকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আমীর বানিয়েছেন তাঁর কল্যান কামনা করবে। (মুসলিম) তিনি আরও বলেছেন, তিনটি বিষয়ে মুসলমানের কলব খেয়ানত করে না। (১) আল্লাহ তা'আলার জন্য আমলকে খালিছ করা। (২) আমীরগণের হিতাকাজী হওয়া। (৩) মুসলমানদের জামাতের সাথে আবশ্যকভাবে জুড়ে থাকা। হাদিসটি ইবনে মাজাহ ছাড়া সব সুনানওয়ালা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আহমদ মুসনাদেও উল্লেখ করেছেন। বুখারি শরিফে আছে, রসূল সা. বলেছেন, দ্বীন হলো নসিহত, দ্বীন হলো নসিহত, দ্বীন হলো নসিহত। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, কার জন্য ইয়া রসূল্লাহ, তিনি বললেন, আল্লাহ ও আল্লাহ তা'আলার কিতাবের জন্য এবং তার রসূল ও মুসলমানদের ইমামগণের জন্য এবং জনসাধারণের জন্য। (মুসলিম)।

সুতরাং দ্বীন হিসাবে এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল হওয়ার আমল হিসাবে ইমারত গ্রহণ করা ওয়াজিব, এর দ্বারা বান্দা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিল করবে...

(আস সিয়াসাতুশ শরয়িয়াহ, পৃষ্ঠা-২০)

(৩) ফিকহে হানাফির নির্ভরযোগ্য ফতোয়ার কিতাব “ ফাতোয়ায়ে শামি’তে আছে,

وفي رد المحتار
ونصبه أهم الواجبات ، فلذا قدموه على دفن صاحب المعجزات

অর্থঃ একজন ইমাম নিয়োগ ও নির্ধারণ করা ওয়াজিবসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। এই জন্যেই সাহাবায়ে কেরাম মুযিজার অধিকারী নবী সা. এর দাফনের উপর ইমাম নির্ধারণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

(ফাতোয়ায়ে শামি-৪/২০৩)

ইমাম নববী রহ. বলেছেন,

أجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة

অর্থঃ ওলামায়ে কেরাম একমত মুসলমানদের উপর একজন খলিফা নির্ধারণ করা ওয়াজিব।

ঐতিহাসিক ইবেন খালদুন বলেন,

نصب الإمام واجب ، وقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين ،

অর্থঃ ইমাম নির্ধারণ করা ওয়াজিব। শরিয়তের দৃষ্টিতে ইমাম তায়ীন করা ওয়াজিব হওয়ার হুকুমটি জানা গেছে সাহাবা ও তাবেরীনের ইজমা দ্বারা।

(৪) আল্লামা কাসানি রহ. বাদায়িউস সনায়ি’তে লিখেছেন,

في بدائع الصنائع 2\9

ولان نصب الامام الاعظم فرض بلا خلاف بين أهل الحق ولا عبرة بخلاف بعض القدرية لاجماع الصحابة رضى الله عنهم على ذلك ولمساس الحاجة إليه لتقيد الاحكام وانصاف المظلوم من الظالم وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد وغير ذلك من المصالح التي لا تقوم الا بامام

অর্থঃ কেননা, বড় ইমাম নিয়োগ ও নির্ধারণ করা ফরজ। আহলে হক সকলের মাঝে এই বিষয়ে কোনো প্রকার ইখতিলাফ নেই। কিছু কাদরিয়াদের ইখতিলাফের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কেননা, এই বিষয়ের উপর সাহাবায়ে কেরাম ইজমা’ ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। মুসলমানদের জন্য একজন ইমামেরও বড় প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, অনেক আহকাম, জালেম থেকে মাজলুমের প্রতিশোধ এবং ঝগড়া-দ্বন্দ্ব নিঃশেষ করা যেগুলো ফাসাদের মূল উপকরণ, এ ছাড়াও আরও অনেক মাসলাহাত, এসব একজন ইমাম ছাড়া কয়েম করা সম্ভব নয়।

(বাদায়িউস সনায়ি’-৯/২)

মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি রহ. ফতুয়া দিয়েছেন,

মুসলমানদের উপর নিজেদের একজন আমীর নির্ধারণ করা ওয়াজিব, বরং গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব।

সুতরাং একথা প্রমাণিত যে, প্রত্যেক যামানায়ই সারা বিশ্বের সব মুসলমান জামাতবদ্ধ হয়ে থাকবে এবং তাদের একজন আমীর অবশ্যই থাকবে। আমীর বিহীন বিক্ষিপ্তভাবে মুসলমান তার দীন-ধর্ম রক্ষা করতে পারে না।

আমীরের যোগ্য হওয়ার শর্তসমূহ :

আল্লামা তাফতযানি রহ. ‘শরহুল আকায়েদ’ কিতাবে আমীরের যোগ্য হওয়ার আবশ্যকীয় যেসব শর্ত উল্লেখ করেছেন সেগুলো হলো,

- (১) কুরাইশী হওয়া। সুতরাং কুরাইশ বংশের বাইরের কাউকে আমীর বানানো যাবে না।
- (২) মুসলিম হওয়া। সুতরাং অমুসলিমকে আমীর বানানো যাবে না।
- (৩) স্বাধীন হওয়া। সুতরাং গোলামকে আমীর বানানো যাবে না।
- (৪) পুরুষ হওয়া। সুতরাং কোনো নারীকে আমীর বানানো যাবে না।
- (৫) আকেল অর্থাৎ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। সুতরাং কোনো পাগলকে আমীর বানানো যাবে না।
- (৬) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোনো নাবালগকে আমীর বানানো যাবে না।
- (৭) মুসলমানদের ‘উম্মুরে’ হস্তক্ষেপ করার মালিকানা রাখা।
- (৮) শরিয়তে আহকাম চালু করা, দারুল ইসলামের সীমানা হিফাজত করা এবং জালেমের পক্ষ থেকে মাজলুমের প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারে সক্ষম হওয়া।

নিম্নে ‘শরহুল আকায়েদ’ কিতাবের ইবারতগুলো অর্থসহ তুলে ধরা হলো।

يشترط ان يكون الإمام قريشياً لقوله عليه السلام الأئمة من قريش وهذا وإن كان خبر واحد لكن لما رواه أبو بكر محتجاً به على الأنصار ولم ينكره أحد فصار مجمعا عليه ولم يخالف فيه إلا الخوارج وبعض المعتزلة الخ
ويشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة أي مسلماً حراً ذكراً عاقلاً بالغاً إذ جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً والعبد مشغول بخدمة المولى مستحقراً في إعين الناس والنساء ناقصات عقل ودين والصبي والمجنون قاصران عن تدبير الأمور والتصرف في مصالح الجمهور
سائساً أي مالكا للتصرف في أمور المسلمين بقوة رأيه ورويته ومعونة بأسه وشوخته قادراً بعلمه وعدله وكفايته وشجاعته على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود دار الإسلام وإنصاف المظلوم من الظالم إذ الإخلال بهذه الأمور مغل بالعرض من نصب الإمام

ইমাম কুরাইশী হওয়া শর্ত। কেননা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমামগণ কুরাইশ বংশ থেকে হবে। এই হাদিসটি যদিও ‘খবরে ওয়াহিদ’, কিন্তু আবু বকর রাদি। এই হাদিসটির দ্বারা আনসারদের উপর দলিল কায়েম করেছেন। কেউই এই বর্ণনাটিকে অস্বিকার করেননি। সুতরাং এই শর্তটি ঐক্যবদ্ধ শর্ত হয়ে গেল। খারেজি ও কিছু মুতায়িলা ছাড়া আর কেউ এর বিরোধীতা করেনি।

আমীর সাধারণ পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হতে হবে। অর্থাৎ মুসলমান, স্বাধীন, পুরুষ, আকেল ও বালগ হতে হবে। (মুসলমান হতে হবে) কেননা, মুমিনদের উপর কাফিরদের কর্তৃত্বের কোনো রাস্তা আল্লাহ তা’আলা রাখেননি। (স্বাধীন হতে হবে, কেননা,) গোলাম তো মালিকের খিদমতেই ব্যস্ত থাকে এবং মানুষের চোখেও তুচ্ছ হয়ে থাকে। (পুরুষ হতে হবে, কেননা,) নারীদের মধ্যে তো দীন ও বুদ্ধির অপূর্ণতা রয়েছে। (বালগ ও

আকেল হতে হবে, কেননা,) নাবালেগ ও পাগল তো মুসলমানদের উমুর পরিচালনায় পূর্ণ সক্ষম নয় এবং জনগণের বিবিধ মাসলাহাতে হস্তক্ষেপের ব্যাপারেও পূর্ণ সক্ষম নয়। আমীর মুসলমানদের উমূরে রায় ও চিন্তাধারা এবং শক্তি দাপট ও বিরত্বের সাহায্যে হস্তক্ষেপের মালিক হতে হবে। আমীর ইলম, আদল ও ইনসাফ, অন্যের অমুখাপেক্ষিতা ও বিরত্বের মাধ্যমে আহকাম চালু করা, দারুল ইসলামের সীমানা হিফাজত করা ও জালেম ব্যক্তি থেকে মাজলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করার ব্যাপারে সক্ষম হতে হবে। কেননা, এ সমস্ত বিষয়ের ত্রুটি ইমাম নির্ধারণের উদ্দেশ্যেই ত্রুটি সৃষ্টি করে।

(শরহুল আকায়েদ, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

ফিকহে হানাফির অন্যতম ফতুয়ার কিতাব ‘ফাতুয়ায়ে শামি’তে আছে,

و في رد المحتار
ويشترط كونه مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا قادرا ، قرشيا

আমীর হতে হবে (১) মুসলিম, (২) স্বাধীন, (৩) পুরুষ, (৪) আকেল, (৫) বালেগ, (৬) আহকাম জারি করতে সক্ষম ও (৬) কুরাইশি।

(ফাতুয়ায়ে শামি- ৪/২০৩)

প্রিয় পাঠক, অনেকে আমীরের জন্য ইলম এবং যথেষ্টতা ও অমুখাপেক্ষিতার শর্তও করেছেন। মূলত আহকাম জারি ও জালেম ব্যক্তি থেকে মাজলুমের প্রতিশোধ নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে অন্যের মুখাপেক্ষি না হওয়ার বিষয়টি সক্ষমতা শর্তের ভিতরে প্রবেশ হয়ে যায়। অনেকে ইজতেহাদের শর্তও করেছেন। আবার অনেকে বলেছেন, ইজতিহাদ শর্ত নয় এবং বিরত্ব ও বাহাদুরিও শর্ত নয়। কেননা, এসব বিষয় একজন মানুষের মধ্যে একত্রে পাওয়াটা খুবই দুস্কর।

(সংক্ষেপিত, ফাতুয়ায়ে শামি)

মুসনিদুল হিন্দ শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রহ. উল্লেখ করেছেন,

واعلم أنه يشترط في الخليفة أن يكون عاقلا وبالغا حرا ذكرا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر نطق وممن
سلم الناس شرفه و شرف قومه ولا يستنكفون عن طاعته

অর্থঃ জেনে রাখো, খলিফার মধ্যে শর্ত করা হয়, খলিফা জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন ও পুরুষ হওয়া। রায়, দর্শন শক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও বাকশক্তি ওয়ালা ও বাহাদুর হওয়া। কওমের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ মেনে নিবে এবং তার ইতায়াত করবে এমন ব্যক্তি হওয়া।

(হুজ্বাতুল্লাহ আল বালেগা ২/৪২৫)

ইলমে কালাম ও ফিকহের কিতাবাদি ঘেটে যা জানা যায়, আমীর নির্ধারণের জন্য উত্তম ব্যক্তি হলো উপরোক্ত আবশ্যকীয় শর্ত সহ (১) আলেম হওয়া, (২) মুত্তাকি হওয়া, (৩) আদেল হওয়া, (৪) মুজতাহিদ হওয়া ইত্যাদি।

হযরত উমর রাদি. বলতেন, এই ইমারতের যোগ্য সেই ব্যক্তিই যে ব্যক্তি (১) শক্তিশালী হবে, কিন্তু কঠোর হবে না। (২) বিনয়-বিনম্র হবে, কিন্তু দুর্বল হবে না। (৩) দানশীল হবে, কিন্তু অপচয়কারী হবে না। (৪) মিতব্যয়ী হবে, কিন্তু কৃপন হবে না।

(মিশরি ছাপার এক বলিয়মের ‘হায়াতুস সাহাবা’, ২/২৩)

আমীরের ইতায়াতের আবশ্যিকতা :

আমীরের ইতায়াত এবং মুসলিম জামাতকে আকড়ে ধরার আবশ্যিকতার ব্যাপারে নিম্নে দুটি আয়াত পেশ করা হলো, আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর ইতায়াত করো, রসূলের ইতায়াত করো এবং তোমাদের ‘উলিল আমর’ (আমীরগণ) এর ইতায়াত করো।

(সূরা নিসা, ৫৯ নং আয়াতের প্রথমার্শ)

‘উলিল আমর’ দ্বারা কারা উদ্দেশ্য এ নিয়ে তাফসিরে ত্ববারি, বাগাভি, ইবনে কাসির ইত্যাদি তাফসিরের কিতাবগুলোর মধ্যে মুফাসসিরদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

(১) আমীরগণ, (২) আলেম ও ফকিহগণ, (৩) রসূল সা. এর পাঠানো বিভিন্ন জামাতের আমীরগণ, (৪) সাহাবিগণ (৫) হযরত আবু বকর রাদি. ও উমর রাদি.।

আল্লামা ইবনে জারির ত্ববারি রহ বিভিন্ন উক্তি নকল করে বলেন,

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة، وللمسلمين مصلحة

অর্থঃ এ সব উক্তি সমূহের মধ্যে সঠিক হওয়ার ব্যাপারে সবচে’ হকদার উক্তি হলো তাদের উক্তি যারা বলেছেন, ‘উলিল আমর’ দ্বারা উদ্দেশ্য মুসলমানদের আমীরগণ ও অভিভাবকগণ। কেননা, যেক্ষেত্রে ইতায়াত রয়েছে এবং মুসলমানদের কল্যান রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে আমীরগণের ইতায়াত করার আদেশ রসূল সা. থেকে বর্ণিত সহিহ হাদিসসমূহে রয়েছে।

সুতরাং আমীরগণের ইতায়াতের আদেশ কুরআন শরিফের এই আয়াতে রয়েছে। আমীর যদি কোনো গুনাহ করার আদেশ দেন তাহলে সে আদেশ মানা যাবে না। তবে অন্য সব বিষয়ে আমীরের ইতায়াত করতে হবে যেসব বিষয় গুনাহ নয় এবং জামাতের সাথে থাকতে হবে।

আরেক জায়গায় আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

অর্থঃ আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আকড়ে ধরো এবং তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

(সূরা আল ইমরান, ১০৩ নং আয়াতের প্রথমার্শ)

বিশ্ব বিখ্যাত তাফসিরের কিতাবগুলোতে আল্লাহর ‘রজ্জু’ এর উদ্দেশ্য লিখতে গিয়ে মুফাসসির হযরতগণের বহুত উক্তি নকল করা হয়।

মুজাহিদ রহ. বলেছেন, রজ্জুর দ্বারা উদ্দেশ্য চুক্তি অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর সাথে করা চুক্তিকে সম্মিলিতভাবে আকড়ে ধরো।

কাতাদাহ রহ. বলেছেন, রজ্জুর উদ্দেশ্য কুরআন অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর কুরআনকে সম্মিলিতভাবে আকড়ে ধরো।

ইবনে আব্বাস রাদি. বলেছেন, রজ্জুর দ্বারা উদ্দেশ্য দীন, ওনার আরেক রেওয়াযাতে আছে, রজ্জুর দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর কিতাব, অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর দীনকে সম্মিলিতভাবে আকড়ে ধরো।

ইবনে য়ায়েদ রহ. বলেছেন, রজ্জুর দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলাম, অর্থাৎ তোমরা ইসলামকে সম্মিলিতভাবে আকড়ে ধরো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. বলেছেন, আল্লাহর রজ্জুর দ্বারা উদ্দেশ্য জামাআত, অর্থাৎ তোমরা জামাআতকে আকড়ে ধরো।

ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন,

يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة، هو خير مما تستحبون في الفرقة"

অর্থঃ হে লোক সকল, আমীরের ইতায়াত করা এবং জামাআতের সাথে থাকা তোমাদের উপর আবশ্যিক। কেননা, এইটা হলো আল্লাহর রজ্জু, যে রজ্জুকে আকড়ে ধরার আদেশ করা হয়েছে। আর জামাআতের মধ্যে এবং আমীরের ইতায়াতের মধ্যে তোমরা যাকে মাকরুহ ও অপছন্দ মনে করো এই অপছন্দনীয় বিষয়গুলোই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে তোমাদের পছন্দনীয় বিষয়গুলোর চেয়েও উত্তম।

(তাফসিরে তুবারি)

সুতরাং তাফসিরের আলোকে বলা যায়, আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে জামাআতের সাথে সম্মিলিতভাবে থাকার আদেশ করেছেন। বিচ্ছিন্ন না হওয়ার জন্য স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত অসংখ্য হাদিস শরিফ থেকে কয়েকটি হাদিস নিম্নে দেওয়া হলো।

عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطْعِمٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَتِكَ لِأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لِأَحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً » . رواه مسلم

(১) অর্থঃ নাকে’ রহ. বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদি. আব্দুল্লাহ ইবনে মুতি’ রাদি. এর কাছে আসলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মুতি’ ইয়াযিদ বিন মুআবিয়ার যামানায় হাররার ঘটনার কারণে একটা সিদ্ধান্তে ছিলেন। তো ইবনে উমর রাদি. কে আসতে দেখে তিনি বললেন, তোমরা আবু আব্দুর রহমানের জন্য একটা গদি নিয়ে আসো। ইবনে উমর রাদি. বললেন, হে ইবনে মুতি’ আমি বসার জন্য তোমার কাছে আসিনি। আমি এসেছি তোমাকে একটা হাদিস শুনিতে দেওয়ার জন্য, যে হাদিসটি আমি রসূল সা. থেকে শুনেছি, রসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমীরের ইতায়াত থেকে হাত ঘুটিয়ে নিলো সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা’আলার

সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার পক্ষে কোনো দলিল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মারা যায়, অথচ তার গর্দানে কোনো বাইয়াত নেই তাহলে সে ব্যক্তি জাহিলি মৃত্যু বরণ করলো।

(মুসলিম)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. ফাতহুল বারিতে উল্লেখ করেছেন,

والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له امام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وان لم يكن هو جاهليا أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد

জাহিলি মৃত্যুর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার মৃত্যুর অবস্থা জাহিলি যুগের মানুষ যারা গুমরাহির উপর মৃত্যু বরণ করেছে তাদের মৃত্যুর মত হয়েছে। তাদের মত তার কোনো অনুসরণীয় ইমাম নেই। কেননা, জাহিলি যুগের মানুষেরা এসব জানতো না। হাদিসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সে কাফির হয়ে মারা গেল। বরং সে গুনাহগার হয়ে মারা গেল। তাছাড়া এটারও সম্ভাবনা আছে যে, এখানে বাহ্যত সাদৃশ্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তার মৃত্যু জাহিলিদের মৃত্যুর মত হয়েছে, যদিও সে জাহিলি নয়। অথবা নবী সা. এ কথাটি ধমক ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা, বাহ্যত অর্থ উদ্দিষ্ট নয়।

(ফাতহুল বারি, ১১/৭)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً الْخ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(২) হযরত আবু হুরাইরা রাদি. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমীরের ইতায়াত থেকে বের হয়ে গেল এবং জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তারপর সে মারা গেল তাহলে সে জাহিলি মৃত্যু বরণ করলো।

(মুসলিম)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شَيْئًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(৩) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার আমীরের পক্ষ থেকে অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখে তাহলে সে যেন সবর করে। কেননা, যে ব্যক্তিই জামাত থেকে এক বিঘত বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করে তাহলে সে তো জাহিলি মৃত্যু বরণ করলো। (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লামা শাওকানি রহ. বলেছেন, জামাতাতে থেকে এক বিঘত পৃথক হয়ে যাওয়ার অর্থ আমীরের ইতায়াত না করা।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(৪) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ রাদি নবী সা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী সা. বলেছেন, মুসলমান ব্যক্তির উপর ওয়াজিব তার পছন্দ অপছন্দ বিষয়ে আমীরের কথা শুনা ও আমীরের ইতায়াত করা যতক্ষণ না তাকে গুনাহের আদেশ করা হয়। অতপর যখন গুনাহের আদেশ করা হবে তখন সেক্ষেত্রে আমীরের কথা শুনা ও মানা যাবে না।

(বুখারি ও মুসলিম)

قَالَ حَدَّثَنِي بَنُ الْإِيمَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَخُنْ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتُ كَيْفَ قَالَ « يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتَنُونِ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِيْسٍ ». قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(৫) অর্থঃ হযরত হুয়াইফা বিন ইয়ামান রাদি. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, আমরা অকল্যানের মধ্যে ছিলাম। আল্লাহ তা'আলা কল্যান নিয়ে আসলেন। আমরা কল্যানের মধ্যে আছি। সুতরাং এই কল্যানের পর কোনো মন্দ আছে কি? রসূল সা. বললেন, হ্যাঁ আছে। আমি বললাম, ওই মন্দের পর আবার কোনো কল্যান আছে কি? রসূল সা. বললেন, হ্যাঁ আছে। আমি বললাম, কল্যানের পর আবারও কোনো মন্দ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। আমি বললাম, এইটা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার পর অনেক ইমাম আসবে যারা আমার হিদায়াত দ্বারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে না, আমার সুন্নতকে সুন্নত হিসাবে গ্রহণ করবে না এবং তাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ বের হবে যাদের অন্তরগুলো মানুষের দেহে শয়তানের অন্তর। আমি বললাম, আমি যদি ওই যামান পেয়ে যাই তখন আমি কি করবো হে আল্লাহর রসূল? রসূল সা. বললেন, আমীরের কথা শুনবে এবং আমীরের ইতায়াত করবে, যদিও তোমার পৃষ্ঠে আঘাত করা হয় এবং তোমার মাল ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তারপরও তুমি আমীরের কথা শুনবে এবং আমীরের ইতায়াত করবে।

(মুসলিম শরিফ)

عن الحارث الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمركم بخمس : بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله وإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم " . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

(৬) হযরত হারেছ আশযারি রাদি. বলেন, রসূল সা. বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের জন্য আদেশ করি, (১) মুসলিম জামাতকে আকড়ে ধরবে। (২) আমীরের কথা শুনবে। (৩) আমীরের ইতায়াত করবে। (৪) হিজরত করবে। (৫) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। আর যে ব্যক্তি জামাত থেকে এক বিঘত বের হয়ে গেল তাহলে ফিরে আসা পর্যন্ত সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেললো। যে ব্যক্তি জাহিলি দাবির দাওয়াত দেয় তাহলে সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং সে মনে করে সে একজন মুসলমান।

(তিরমিযি ও মুসনাদে আহমদ)

আরও বহু হাদিস রয়েছে, প্রায় প্রতিটি হাদিসের কিতাবে ইমারতের অধ্যায়ই রয়েছে। নমুনা হিসাবে কয়েকটি হাদিস আপনাদের খেদমতে পেশ করেছি। বিস্তারিত জানার জন্য হাদিসের কিতাবগুলো মুতাল্লাআ করা যেতে পারে।

আমীর তায়ীনের পদ্ধতি :

যাদের অনুসরণ করার জন্য আমাদেরকে তথা গোটা মুসলিম উম্মতকে আদেশ করা হয়েছে সেই খুলাফায়ে রাশিদিন রাদি. এর যামানার দিকে নজর দিলে আমীর তায়ীনের পদ্ধতিগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তিকালের পর মদিনার মুসলমানগণ আবু বকর রাদি. এর হাতে বাইয়াত শুরু করে দেন। একে একে সবাই তাঁর হাতে বাইয়াত হয়ে যান। অনেক আনসার সাহাবি আনসারদের মধ্য থেকে আমীর চাইলে শেষ পর্যন্ত আবু বকর রাদি. এর হাতেই সবাই বাইয়াত হয়ে যান। কারণ, আমীর বা ইমাম কুরাইশ বংশের হতে হবে এই মর্মের হাদিস থাকার কারণে আনসার সাহাবাগণও আবু বকর রাদি. হাতে বাইয়াত শুরু করে দেন।

ইসলামের দ্বিতীয় আমীর হযরত উমর রাদি.কে পূর্ব আমীর হযরত আবু বকর রাদি. নির্ধারণ করে যান। আবু বকর রাদি. এর ইত্তিকালের পর সবাই হযরত উমর রাদি. এর হাতে বাইয়াত হয়ে যান। ইসলামের তৃতীয় আমীর নির্ধারণের জন্য উমর রাদি. দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার আগে ছয় জনের একটা গুরা কায়েম করে যান। উমর রাদি. শহিদ হওয়ার পর ছয় জন পরামর্শ করে ছয় থেকে তিন জন, তিন জন থেকে একজন অর্থাৎ হযরত উসমান রাদি. আমীর নিযুক্ত হয়ে যান এবং মুসলমানগণ তাঁর হাতে বাইয়াত শুরু করে দেন। হযরত উসমান রাদি. শহিদ হওয়ার পর মুসলমানগণ ইসলামারে চতুর্থ আমীর বা খলিফা হযরত আলি রাদি. এর হাতে বাইয়াত হয়ে যান।

প্রিয় পাঠক, আমীর তায়ীনের পদ্ধতিগুলো যদি সংক্ষেপে বলি, (১) পূর্ব আমীর ইত্তিকালের পর আমীরের যোগ্য কোনো ব্যক্তির হাতে মুসলমানগণের বাইয়াত হয়ে যাওয়া। যেমনটা হয়েছিল আবু বকর রাদি. ও আলি রাদি. এর বেলায় (২) পূর্ব আমীর কর্তৃক ইত্তিকালের পূর্বে আমীর নির্ধারণ করে যাওয়া। যেমনটা হয়েছিল উমর রাদি. বেলায়। (৩) পূর্ব আমীর কর্তৃক ইত্তিকালের পূর্বে আমীর তায়ীনের জন্য আহলে গুরা নির্ধারণ করে যাওয়া। তারপর আহলে গুরাগণ আপোষে পরামর্শ করে আমীরের যোগ্য একজনের হাতে বাইয়াত হয়ে যাওয়া।

‘ফাতোয়ায়ে শামি’ তে আছে,

الإمام يصير إماما بالمبايعة أو بالاستخلاف من قبله (قوله : يصير إماما بالمبايعة) وكذا باستخلاف إمام قبله وكذا بالتغلب والقهر كما في شرح المقاصد .

قال في المسامرة : ويثبت عقد الإمامة إما باستخلاف الخليفة إياها كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وإما ببيعة جماعة من العلماء أو جماعة من أهل الرأي والتدبير .

وعند الأشعري : يكفي الواحد من العلماء المشهورين من أولي الرأي ، بشرط كونه بمشهد شهود لدفع الإنكار إن وقع .

وشرط المعتزلة خمسة . وذكر بعض الحنفية اشتراط جماعة دون عدد مخصوص

অর্থঃ একজন ইমাম তায়ীন হবে ইমামের হাতে বাইয়াত হওয়ার দ্বারা কিংবা তাঁর পূর্বের ইমাম কর্তৃক নির্ধারণ করার দ্বারা। অনুরূপভাবে জোর ও শক্তি বলে কোনো ব্যক্তি ইমামের পদ গ্রহণ করলে সে ব্যক্তিও ইমাম হয়ে যাবে। শরহুল মাকাসিদে এরকমই আছে। ইমামতের আক্দ্ ছাবেত হবে পূর্ব খলিফার নির্বাচনের মাধ্যমে। যেমন আবু বকর রাদি. করেছিলেন। অথবা এক জামাত ওলামা বা এক জামাত আহলে রায় ও আহলে তাদবির (পরিচালনাকারী) বাইয়াত হওয়ার দ্বারা। আশয়ারির মতে আমীর তায়ীনের জন্য আহলে রায় ও প্রসিদ্ধ ওলামা হযরতগণের একজন আলেমের বাইয়াতই যথেষ্ট। তবে শর্ত হলো অস্বীকৃতির রাস্তা বন্ধের জন্য একদল সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তাঁর বাইয়াত হতে হবে। মুতায়িলারা পাঁচ জনের বাইয়াত শর্তারোপ করেছেন। অনেক হানাফি আলেমের মতে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নয়, বরং এক জামাত বাইয়াত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন।

(ফাতুয়ায়ে শামি, ৪/২০৭)

আল্লামা ইবেন আবেদীন রহ. ফতোয়া শামির আরেক জায়গায় বলেছেন,

(والإمام يصير إماماً) بأمرين (بالمبايعة من الأشراف والأعيان ، وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفاً من قهره وجبروته ، فإن بايع الناس) الإمام (ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه) عن قهرهم (لا يصير إماماً)

অর্থঃ দুইটি জিনিসের মাধ্যমে ইমাম তায়ীন হয়ে যাবে, (১) সম্মানি ও মহান ব্যক্তিদের বাইয়াত হওয়ার দ্বারা এবং (২) প্রজাদের মধ্যে ইমামের শক্তি ও বাহুবলের ভয়ে তাঁর হুকুম চালু হয়ে যাওয়ার দ্বারা। সুতরাং লোকজন যদি ইমামের হাতে বাইয়াত হয় কিন্তু তাদের মধ্যে ইমামের হুকুম তাদের শক্তির কাছে ইমামের অপরাগতার কারণে জারি না হয় তাহলে সে ইমাম হবে না।

শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রহ. হুজ্জাতুল্লাহ আল বালেগার মধ্যে লিখেছেন,

‘কয়েকটি পদ্ধতিতে খেলাফত অনুষ্ঠিত হয়। একটি পদ্ধতি এরকম, সময়ের অনুসৃত ব্যক্তির ও প্রভাবি লোক খলিফার হাতে বাইয়াত হয়ে যাবে এবং তাকে নিজেদের বড় হাকিম হিসাবে মেনে নিবে এবং তার ইতায়াতের বাইয়াত করে নিবে তখন সে খলিফা ইমাম আমীর হাকিম শরিয়তের দৃষ্টিতে হয়ে যাবে। তার ইতায়াত আবশ্যক হয়ে যাবে। তার ইতায়াত না করা অর্থাৎ না ফরমানি করা গুনাহ হবে।’

(হুজ্জাতুল্লাহ আল বালেগা ২/৩৯৮)

আমীরের দায়িত্ব :

ইলমে কালাম ও ফিকহের কিতাবাদি ‘মুতালাআ’ করে একজন আমীরের যে দায়িত্বগুলো ও কাজগুলো জানা যায় মোটামুটি তা নিম্নে দেওয়া হলো।

(১) দাওয়াত ও জিহাদের কাজ আঞ্জাম দেওয়া এবং এই নিমিত্তে বিভিন্ন জামাত বিভিন্ন জায়গায় পাঠানোর কাজ করা।

(২) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্ব আমভাবে পালনের তারতিব করা।

- (৩) মুসলমানদের মধ্যে জোড় মিল মহব্বত বহাল রাখার জন্য নসিহত ইত্যাদি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- (৪) জুমা ও ঈদের জামাত কয়েম করা।
- (৫) মুসলমানদের বিচার আচার কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালনার ব্যবস্থা করা।
- (৬) আমীরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি তথা হুদুদাত কয়েম করা।
- (৭) জালেমের জুলুম বন্ধ করার ব্যবস্থা করা ও আপোষে শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- (৮) মুসলমানদের একতা ও জামাতবদ্ধতা রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করে যাওয়া। প্রয়োজনে বিদ্রোহী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পর্যন্ত করা।
- (৯) অভিভাবকহীন ছেলেমেয়েদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা।
- (১০) বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠিত করা, যাকাত উসূল করা, যাকাত, গনিমত, মালে ফাই এর সুষ্ঠু বন্টনের ব্যবস্থা করা।

সুন্নাত ও সীরতের কিতাবগুলোতে আমীরের আরও অনেক দায়িত্ব পাওয়া যায়। এক কথায় আমীর তার মামুর মুসলমানদেরকে নিয়ে পূর্ণ দ্বীন পুরা আলমে সমুন্নত করার চেষ্টা ফিকির ও মেহনতে নিয়োজিত থাকবে।

‘শরহুল আকায়েদ’ গ্রন্থে মুসলমানদের আমীর যে কাজ আঞ্জাম দিবেন তার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والإعياد وقطع المنازعات الواقعة بين العباد وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغار والصغار الذين لا أولياء لهم وقسمة الغنائم ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها أحد الأمة

অর্থঃ একজন আমীরের দায়িত্ব হলো আহকাম চালু করা, হুদুদাত কয়েম করা, শত্রু প্রবেশের ছিদ্র বন্ধ করা, জিহাদের বাহিনী প্রস্তুত করা, সদকা উসূল করা, ডাকাত দল, চোর ও জবরদখলকারীকে পরাজিত করা, জুমা ও ঈদের নামায কয়েম করা, বান্দাদের মধ্যে সংঘটিত ঝগড়া-দ্বন্দ্ব বন্ধ করা, হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত সাক্ষ্যগুলো কবুল করা, ছোট ছেলে মেয়ে যাদের অভিভাবক নেই তাদের বিয়ে দেওয়া, গনিমত বন্টন করা এবং এ জাতীয় আরও অনেককিছু রয়েছে যেগুলোর যিম্মাদারি উম্মত এককভাবে আদায় করতে পারে না।

আকাবিরগণের চিন্তাধারাঃ

এক ব্যক্তি মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ কে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত, হাদিসে আছে, আমীরের বাইয়াত ব্যতীত মারা গেলে জাহিলি মৃত্যু হবে। তাহলে কি আমাদের জাহিলি মৃত্যু হচ্ছে? থানভি রহ. বললেন, আমীর থাকাকালীন যদি কেউ আমীরের হাতে বাইয়াত না হয় তাহলে তার ব্যাপারে এই হাদিস। এখন তো আমীর নেই। আরেক জন থানভি রহ. কে প্রশ্ন করলেন, বর্তমানে তো মুসলিম জামাত নেই, আমীর নেই, তাহলে কি আমরা একটা জামাত তৈরি করতে পারি এবং একজনকে আমরা আমীর তায়ীন করতে পারি? থানভি রহ. উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, জামাত তৈরি করা যায় এবং আমীরও তায়ীন করা যায়। তবে এই জামাত ও আমীরের قوت قاهرة অর্থাৎ শাহি ফরমান জারি করার ক্ষমতা এবং আহকামাত চালু করার ক্ষমতা বর্তমানে নেই।

(ইমদাদুল ফাতুয়া)

এই দুটি জিজ্ঞাসা ও উত্তর থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হযরত মাওলানা আশরাফ থানভি রহ. মনে করতেন, ওনাদের সময়ে কোনো আমীরের বাইয়াত নেই এবং তিনি এটাও মনে করতেন বর্তমানে মুসলমানদের একটা

জামাত ও জামাতের আমীর তায়ীন হতে পারে। তবে ইংরেজদের দখল করা এই দেশে আমীরের ক্ষমতার বলে আহকাম জারি করা ও শত্রু পক্ষকে ঘায়েল করা সম্ভব নয়।

আকাবির হযরতগণ অনেক বড় বড় আলেম ছিলেন। দ্বীন ও ইসলামের অনেক খেদমত করে গেছেন। থানভি রহ. সহ আমাদের আকাবিরগণ হাজার হাজার কিতাব লেখে গেছেন যে কিতাবগুলো কিয়ামত পর্যন্ত আমাদেরকে সঠিক দ্বীন ও শিক্ষার দিকে রাহবরি করবে। ওনারা মুসলমানদের জামাত ও ইমারতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাতেন। ইমারত কায়েম করা উম্মতের যে বড় এক দায়িত্ব ও ওয়াজিব তাও হারে হারে টের পেতেন। ইমারতবিহীন ইসলাম মা-বাপবিহীন এতিম সন্তানের মত সেটাও ওনাদের উপলব্ধিতে ছিল। কিন্তু জামাত ও ইমারত তায়ীনের ব্যাপারে ওনারা মা'জুর ছিলেন।

বিষয়টি পরিস্কার করার জন্য

আরেকটি জিজ্ঞাসা ও সমাধান পাঠ করুন। জিজ্ঞাসাকারী হলেন মুহাম্মাদ ফারুক হুসাইনি, নাজেম, জমিয়ত ওলামা,বিহার। সমাধানকারী মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি রহ.।

জিজ্ঞাসা :

বর্তমান হালতে যদি কোনো প্রদেশের মুসলমান নিজেদের কোনো আমীর নির্ধারণ করে নেন তখন ওই আমীরের শরয়ী হুকুম কী হবে। কারণ, তার কাছে তো আহকাম ও শাহি নির্দেশ জারি করার জন্য কোনো কুওতে নাফেজা বিদ্যমান নেই। প্রত্যেক মুসলমানের উপর এরকম আমীরের ইতায়াত ওয়াজিব কিনা? মুহাম্মাদি শরিয়তের দৃষ্টিতে এরকম আমীরের হুকুম ও ফরমানের ইতায়াত ও আনুগত্য জরুরী কিনা?

সমাধান :

দামি কথা তো এটা যে, মুসলমানদের মুআমালাতের শৃঙ্খলা ও নিয়ম-কানুন একটি মারকাযের সাথে সম্পৃক্ত ও মারকাযের অধীন থাকবে। এবং এই মারকাযের উপর সবাই মুত্তাফিক ও একমত থাকবে। এবং নিজেদের মুআমালাত মামলা-মোকাদ্দামাতে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে শরিয়তের আলোকে সমাধান করাবে। ওই মারকাযের শাখা প্রশাখা বিভিন্ন জায়গায় কায়েম হতে থাকবে এবং সব মারকাযকে মূল মারকায হিদায়াত ও দিকনির্দেশনা দিবে এবং সবগুলোর নেগরানি করবে। পুরা কর্তৃত্ব ও পুরা শক্তি মূল মারকাযের থাকবে। যদি এই ভাবে ইজতেমায়ি এক মারকায বানানো না যায় তবে প্রত্যেক প্রদেশে আলাদা মারকায বানিয়ে নিবে এবং প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে জরুরত অনুসারে মারকাযের শাখাপ্রশাখা কায়েম করে নিবে। এক প্রদেশ দ্বিতীয় প্রদেশের সাথে পরস্পর কল্যান কামনা ও সহানুভূতির সম্পর্ক থাকবে। আপোষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তদারকির সম্পর্ক যেন না হয়। যেই মারকাযের উপর সবাই মুত্তাফিক ও একমত হয়ে মান্যতার ওয়াদা করে নিবে তাহলে হুদুদে শরা'র ভিতরে সেই মারকাযের পাবন্দি (ইতায়াত) আবশ্যিক হবে। ওয়াদা ভঙ্গ করার অনুমতি হবে না। মারকাযের ফায়সালাগুলোকে মানতে হবে। যদি কোনো ফায়সালা

শরিয়তের খেলাফ হয়ে যায়, ফায়সালা ভুল হয়ে যায় তখন ফায়সালাকে নজরে সানি (আপিল)করারও অনুমতি হবে। এরকম মারকায বিদ্যমান থাকাকালীন কোনো আলাদা কমিটি বানিয়ে তার দ্বারা ফায়সালা করানো অনুপযুক্ত ও নিন্দনীয়। কেননা, এর দ্বারা ইত্তিসার এবং বিশৃঙ্খলা পয়দা হবে এবং এর দ্বারা মূল মারকাযের ক্ষতি হবে যে মারকাযের ব্যাপারে আশা হয় যে, আল্লাহ পাক এই মারকাযকে আসল ইমারতের মাধ্যম বানিয়ে দিবেন। এই হিসাবে এই মারকাযকে পুরা সাহায্য করা জরুরী। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় 'কুওতে মুনাফফিয়াহ' ও 'কুওতে কাহেরা' বিদ্যমান না থাকায় বর্তমানে এটির খেলাফতে ইসলামিয়া'র মর্যদা হাসিল হচ্ছে না। এবং তাকে আমীরুল মুমিনিন পদমর্যদা দেওয়া যাচ্ছে না। এই জন্যে যদি কোনো ব্যক্তি, এই প্রদেশের বাসিন্দা নিজের মুকাদ্দামা এখানে ফায়সালা না করিয়ে অন্য কারো দ্বারা করিয়ে নেয় তখন তাকে না বাগি বলা যাবে, না খারিজি বলা যাবে এবং যদি সেই ফায়সালা শরিয়ত অনুযায়ী হয় তখন তাকে গলতও

বলা যাবে না। খেলাফতে ইসলামিয়া থাকাকালীনও অন্য কোনো হাকিম দ্বারা ফায়সালা করিয়ে নেওয়া অন্যায় নয়। তবে মোকাবেলার সূরত ইখতিয়ার যেন না করা হয়।

(ফাতুয়ায়ে মাহমুদিয়া ৪/৫৭৬)

প্রিয় পাঠক, একটু ভেবে দেখুন, একটা মুসলমানদের আলমি জামাত ও মারকায থাকাকে ওনি জরুরি মনে করেছেন। অপরাগ অবস্থায় অন্তত পক্ষে প্রদেশভিত্তিক মারকায কয়েম করার কথা বলেছেন। ইতায়াতের অঙ্গিকার দেওয়ার পর ওই মারকাযের ইতায়াত জরুরী বলে উল্লেখ করেছেন এবং এই আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, বর্তমানে যদিও এই মারকায আমীরুল মুমিনিনের মাকামে নয়, কিন্তু এইভাবে আগাতে আগাতে এক সময় আমীরুল মুমিনিনের অবস্থানে চলে আসতে পারে।

প্রিয় পাঠক, আজকের তাবলিগ জামাত ও তাবলিগ জামাতের ইমারত, বিশ্বব্যাপী নিজামুদ্দিন মারকাযের ইতায়াত, নিজামুদ্দিন মারকাযের অধীন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জায়গায় মারকায, মুসলমানদের বিশাল এই জামাত, বর্তমানে মুসলমানদের বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ করে মুসলমানদের ঈমান ও আমল সুন্দর করে এক জামাত ও এক ইতায়াত তৈরি করার এই ফিকির করার এই মেহনত ও সাহাবাওয়ালা পদ্ধতিতে এক মারকায ও মারকাযের আমীরের ইতায়াতে বিশ্বময় প্রতিদিন হাজার হাজার জামাতের মেহনতের দৃশ্য যদি আমাদের আকাবির হযরতগণ দেখতেন তাহলে আমাদের ধারণা অন্তত আমীরুল মুমিনিনের পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে এই তাবলিগ জামাতে লেগে থাকা ও আমীরের হাতে বাইয়াত হয়ে যাওয়াকে ওয়াজিব বলে ফতুয়া চালু করতেন। হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস রহ. যখন এই কাজ শুরু করলেন তখন এই সামান্য কাজ দেখেই আকাবির হযরতগণের মনেও অনেক আশা জন্মেছিল। মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. বলেছিলেন, ‘ইলিয়াস নিরাশাকে আশা দ্বারা পাল্টিয়ে দিয়েছে’। কেউই মাওলানা ইলিয়াস রহ. ও ওনার কাজের বিরুদ্ধিতা করেননি। সবাই মাওলানাকে সহযোগিতা করেছেন। কতক অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে শাইখুল হাদিস যাকারিয়া রহ. দেওবন্দের মুহতামিম ক্বারী তৈয়ব সাহেব রহ. মাওলানা মান্জুর নোমানি রহ. আবুল হাসান নদভি রহ. মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি রহ. প্রমুখ আকাবির হযরতগণ কলম ধরেছেন।

মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর আন্দোলনঃ

হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস রহ. চিন্তা করে দেখলেন বিশ্ব মুসলিম আজ শতধা বিভক্ত। ঈমান আমল সব হারাতে বসেছে। মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে যার যার পরিমন্ডলে আমল করছে। কিন্তু প্রায় ৯০ ভাগ মুসলমান ঈমান আমল সম্পর্কে কিছুই জানে না। আল্লাহ তা‘আলার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। দুনিয়াদার কাফির মুশরিক ও মূর্তি পূজারীদের সাথে তাল মিলিয়ে একই পদ্ধতিতে জীবন যাপন করছে। খৃষ্টানদের অঞ্চলে খৃষ্টানদের সাথে, হিন্দুদের অঞ্চলে হিন্দুদের সাথে চলতে চলতে জীবনের রিতিনীতি এক হয়ে যাচ্ছে। আপোষের ধর্মীয় তফাত দূর হতে চলেছে। ধর্মান্তরিতের ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। নামে মাত্র মুসলিম পরিচয় ধারণ করে আছে। কিন্তু ইসলাম কি? ইসলামের নবীর নাম কি? ইসলামি জীবন কি রকম হয়? এসবকিছু তারা জানতো না, জানার ব্যাপারে তাদের কোনো ফিকিরও ছিল না। দেশভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক মুসলমানগণ ভাগাভাগি হয়ে আছে। তাদের কাছে দেশ পরিচয়, জাতি ও গোষ্ঠি পরিচয়টাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থ সম্পদ কামাই করে বিলাসি জীবন লক্ষ্যতে পরিণত হয়েছে। নেতা হওয়া, পরিচিত হওয়া এবং আর্থিক অভাবমুক্ত জীবন যাপন করা সফলতার মাপকাঠি হয়ে গেছে এবং সে লাইনে প্রতিযোগিতা চলছে। মুসলমানদের ইতিহাস ঐতিহ্য সব ভুলতে শুরু করেছে।

মাওলানা ইলিয়াস রহ. ভাবলেন, স্বাধীন জাতী মুসলিম উম্মাহ আজ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাদের কী করণ হালত! তাদের কোনো অভিভাবক নেই। নির্যাতিত মুসলিম নির্যাতিতই হচ্ছে, পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই। জাহান্নামে দলে দলে যাচ্ছে, নবী ও সাহাবাদের মত আগলে ধরার মত কোনো মানুষ নেই। কেউ কারো নয়। নিছক আত্মীয়তা ও গোষ্ঠীর বন্ধনে আবদ্ধ। ঈমান ও দ্বীনের বন্ধন নেই। কেউ কাউকে চিনে না, জানে না, বুঝে না। তাদের কোনো জামাত নেই। আমীর নেই। মুসলমানদের কেন এই হালত!! কেন এই অধঃপতন? কেন মুসলমানদের বন্য়ার শ্রোতে ভাসমান বিক্ষিপ্ত কচরিপানার দশা। কেন তাদের ঠাই নেই। মুসলমান তো সিংহের জাতী। সিংহের গর্দান কেন মুচড়িয়ে গেল।

মাওলানা ইলিয়াস রহ. ভেবে দেখলেন, সাহাবাদের বিশাল জামাত, যারা কিছু দিন আগেও কুফুর শিরকে নিমজ্জিত ছিল এবং জাহান্নামের দ্বার প্রাচ্ছে গিয়ে পৌঁছেছিল, তারা এক মেহনতের ফলশ্রুতিতে ঈমানের নূরে ঝলমল করছিলেন, জান্নাতের সুসংবাদ দুনিয়াতে থেকেই পেয়েছিলেন, বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন, পরাশক্তি কিসরা ও কায়সারকে পদাবনত করেছিলেন, তাদের মূল সম্বল ছিল ঈমান, আমল, জামাতবদ্ধতা, আমীরের ইতায়াত, দাওয়াত ও জিহাদ। নবীর ইত্তিকালের পর নবীর সাহাবিগণ নবীর যামানার মতই একজন আমীরের ইতায়াতে থেকে জামাতবদ্ধভাবে আল্লাহ তা'আলার নাযিল করা দ্বীন মেনে চলেছেন এবং দাওয়াত ও জিহাদের মত মহান দায়িত্ব খুব শৃঙ্খলতার সাথে ও এক মারকাযের ইতায়াতে থেকে পালন করেছেন। তারা বিশ্বময় ইসলামের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছিলেন।

সুতরাং মাওলানা ইলিয়াস রহ. বুঝতে পেরেছিলেন মুসলমান জাতি আবার ঘুরে ফিরে দাঁড়াতে হলে মুসলমানদের মূল সম্বল এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার মূল দৌলত ঈমানের শক্তি পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। ঈমানি কালিমার ছায়াতলে সব মুসলমানদের জমা করতে হবে। মুসলমানদের ঈমান, আমল, জামাতবদ্ধতা ও এক ইতায়াত অর্থাৎ পুরা দ্বীন ও দ্বীন কায়েমের দাওয়াত ও জিহাদ পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হলে সাহাবাদের কর্মপদ্ধতির বিকল্প নেই। তাই তিনি গোটা বিশ্বকে সামনে রেখে না মুসলিম, না হিন্দু প্রকৃতির মেওয়াতি মানুষদের মাধ্যমে কাজ শুরু করলেন। তিনি শুধু বেনামাযিকে নামাযি, বেরোজদারকে রোজাদার বানানোর মেহনত শুরু করেননি। এটি পুরা দ্বীন সাহাবাদের তরিকায় পুরা আলমে যিন্দা হওয়ার মেহনত। মুসলমানদের বিভিন্ন মত, বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন দল উপদল সবকে এক জায়গায় এক মারকাযের অধীন, মাসায়েলের শত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কালিমাগো মুসলমানদের এক জামাত বানানোর মেহনত। ইসলামের প্রথম যামানার মত কাজ শুরু করলেন। আল্লাহ তা'আলা ওনাকে কামিয়াবি দিলেন। একে একে তিন হযরতজি চলে গেলেন। এক মারকায নিজামুদ্দিনের ইতায়াতে থেকে সারা দুনিয়াতে এখন কাজ ছড়িয়ে গেছে। আলেম বে-আলেম, সাধারণ শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাই মিলে বিশ্বময় মুসলমানদের এক জামাত তৈরি হয়েছে। নবীর ইতায়াতে থেকে যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম কাজ করেছিলেন এবং আবু বকর রাদি. উমর রাদি. ও তাদের পরবর্তী খলিফা ও আমীর হযরতগণের ইতায়াতে থেকে যেভাবে মুসলমানগণ কাজ করে গেছেন ও দাওয়াত ও জিহাদ চালিয়ে গেছেন ঠিক সেইভাবে আলমি আমীরের ইতায়াতে থেকে দীর্ঘ দিন ধরে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ চলে আসছে এবং চলছে। ঈমানিয়াত, ইবাদাত, মুআমালাত, মুআশারাত, দাওয়াত, জিহাদ, তালিমে দ্বীন, এক জামাত, এক ইমারত, এক ইতায়াত, এক বাইয়াত ইত্যাদি সবকিছুতে এবং পূর্ণ দ্বীনের ব্যাপারে সাহাবাদেরকে পুরাপুরি অনুসরণ করার চেষ্টা চলছে। আগের চেয়ে কাজ অনেক বেড়ে গেছে। মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর সুযোগ্য সাহেবযাদা দ্বিতীয় হযরতজি মাওলানা ইউসুফ রহ. এর সুযোগ্য নাতি মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেব তাবলিগ জামাতের বর্তমান আমীর। তিনি জীবন ও খান্দানকে ওয়াকফ করে দিয়ে দ্বীন কায়েমের সাহাবাওয়ালা দাওয়াত ও মেহনতে কাজ করে যাচ্ছেন।

তাবলিগ জামাতের আমীরের হুকুম :

এক জামাত ওলামায়ে কেরাম যাদের অধিকাংশ সরাসরি তাবলিগি কাজের সাথে জড়িত তারা মনে করেন, তাবলিগ জামাতের আমীরগণ শরয়ী আমীর এবং তাবলিগ জামাতের বর্তমান আমীর মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেব (দাঃবাঃ) শরয়ী আমীর। যদি ওনাদের বলা হয় মাওলানা সা'আদ সাহেবকে কে আমীর বানালো এবং তিনি কিভাবে শরয়ী আমীর হলেন। এ সংশয়ের জবাবে ওনারা বলে থাকেন, যেভাবে একজন শরয়ী আমীর তায়ীন হয়, ইসলামি শরিয়তে আমীর তায়ীনের যে পদ্ধতি রয়েছে সে পদ্ধতিতেই মুহতারাম মাওলানা শরয়ী আমীর হয়েছেন।

তাবলিগি এই জামাতের এই কাজ ১৯১০ ঈসাব্দী সালে শুরু হয়ে ১৯৯৫ ঈসাব্দী সাল পর্যন্ত তাবলিগ জামাতের তিন জন আমীর অতীত হয়েছেন। প্রথম আমীর মাওলানা ইলিয়াস রহ., দ্বিতীয় আমীর মাওলানা ইউসুফ রহ. তৃতীয় আমীর মাওলানা ইনয়ামুল হাসান রহ.। মাওলানা ইনয়ামুল হাসান রহ. এর ইতিকালের বর্ষ ১৯৯৫ ঈসাব্দী সাল থেকে মাওলানা যুবাইরুল হাসান রহ. এর ইতিকালের বর্ষ ২০১৪ ঈসাব্দী সাল পর্যন্ত, এই ১৯ বছর সুনির্দিষ্ট কোনো আমীর ছিল না।

মাওলানা ইনয়ামুল হাসান রহ. ইতিকালের পর কোনো আমীর তায়ীন করা হলো না কেন। এই প্রশ্নের সহজ জবাব সারা দুনিয়া জানে, মাওলানা ইনয়ামুল হাসান রহ. ইতিকালের আগে কোনো আমীর নির্ধারণ করে যাননি এবং ওনার ইতিকালের পর আহলে শুরা, আহলে রায় ও মুরবিগণ মাশওয়ারা করে সুনির্দিষ্ট কোনো আমীর তায়ীন করেননি।

অবশ্য ১৯ বছরের এই মধ্যবর্তী সময় নিয়ে বিভিন্ন তথ্য রয়েছে।

প্রথম তথ্য, কেউ বলছে,

ইনয়ামুল হাসান রহ. ইতিকালের আগে আমীর তায়ীনের জন্য শুরা গঠন করে যান। ইতিকালের পর ওনার বানানো শুরা হযরতগণ মাশওয়ারা করে তিন জনকে কাজ চালিয়ে নেওয়ার যিম্মাদার নির্ধারণ করেন।

১. মাওলানা ইজহারুল হাসান রহ.

২. মাওলানা যুবাইরুল হাসান রহ. ও

৩. মাওলানা সা'আদ (দাঃবাঃ)।

কিন্তু প্রায় দুই বছরের মাথায় ১৯৯৭ সালে মাওলানা ইজহারুল হাসান রহ. ইতিকাল করেন। ইতিকালের আগে ওনিই একক ফায়সাল হিসাবে কাজ চালিয়ে গেছেন। তারপর ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত যিম্মাদারি দুইজনের উপর থাকলেও একক ফায়সাল হিসাবে কাজ চালিয়ে আসছেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন ইজতেমায় মূল বয়ান ও গুরুত্বপূর্ণ ফায়সালা ইত্যাদি মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেব (দাঃবাঃ) ই করতেন। দুআ ও সৎক্ষিপ্ত বয়ান ইত্যাদি মাওলানা যুবাইরুল হাসান রহ. করতেন।

দ্বিতীয় তথ্য, কেউ বলছে,

মাওলানা ইনয়ামুল হাসান সাহেব রহ. বলে গেছেন, এখন থেকে কাজ শুরা ভিত্তিক চলবে। সুতরাং ওনার বানানো শুরা কমে যাওয়ায় শুরাকে পূর্ণ করতে হবে।

উপরোক্ত দুটি তথ্য, এক. হযরতজি ইনয়ামুল হাসান রহ. আমীর তায়ীনের জন্য শুরা গঠন করে যান।

দুই. তিনি শুরা গঠন করে যান এবং এই কথা বলে যান যে, এখন থেকে শুরা ভিত্তিক কাজ চলবে। অর্থাৎ আমীর তায়ীনের জন্য শুরা গঠন করেননি।

দুটি তথ্যের মধ্যে বিশুদ্ধ প্রথম তথ্যটিই হবে এবং ওনার এই কর্ম পদ্ধতিটি হযরত উমর রা. মত হবে। উমর রা.দি.ও পরবর্তী সুনির্দিষ্ট কোনো আমীর তায়ীন করে যাননি। বরং আমীর তায়ীন করার জন্য ৬ জনের শুরা

গঠন করে যান। ওনার ইত্তিকালের পর ছয় জন পরামর্শ করে ৬ থেকে ৩ জন এবং ৩ জন থেকে ১ জন অর্থাৎ সাইয়িদুনা উসমান রাদি. আমীর বা খলিফা নির্ধারিত হয়।

সুতরাং হযরতজি ইনয়ামুল হাসান রহ. হয়তো প্রথম তথ্য মতই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় তথ্যটি গলত মনে হয়। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম জামাতের প্রধান আমীরের জায়গায় আমীর না বানিয়ে শুরা বানানো এবং সুনির্দিষ্ট আমীরবিহীন শুরা ভিত্তিক জামাত পরিচালনার তরিকা গলত এবং সীরত ও সুন্নতের খেলাফ। তাছাড়া তাবলিগের ইতিহাসেও এমন নেই। সুতরাং প্রথম তথ্যটিই সঠিক হবে। আর দ্বিতীয় তথ্যটি হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. বলে গেছেন বলে যদি কারো কাছে সঠিক প্রমাণ থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে আমরা বলবো, তৃতীয় হযরতজি রহ. শুরা ভিত্তিক কাজ পরিচালানোর কথা ইমারতকে বাদ দিয়ে বলেননি। বরং ইমারতের অধীন শুরাভিত্তিক কাজ পরিচালনার কথা বলেছেন। যেমন, ওনার যামানায় ছিল। দেশে দেশে এবং নিজের জন্যেও শুরাদের জামাত বানিয়ে রেখেছেন। কিন্তু সবদেশের সব শুরা, আঞ্চলিক আমীর, দেশভিত্তিক আমীর তথা সবার আমীর ও যিম্মাদর অর্থাৎ বিশ্ব আমীর ও আলমি যিম্মাদার ওনি নিজেই ছিলেন। সুতরাং ওনি যে শুরার কথা বলেছেন সেটা ইমারতের অধীন শুরাই হবে। কেননা, সুনির্দিষ্ট আমীর বিহীন শুরার গলত তারতিবের কথা ওনি বলতে পারেন না।

যাই হোক, তারপরও এটাই সত্য মাওলানা ইনয়ামুল হাসান রহ. এর ইত্তিকালের বছর ১৯৯৫ সাল থেকে মাওলানা যুবাইরুল হাসান রহ. এর ইত্তিকালের বছর ২০১৪ সাল পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট কোনো আমীর ছিল না। এই জন্যেই একজন আমীরের বাইয়াত নেওয়া হয়নি। মাওলানা যুবাইরুল হাসান রহ. ২০১৪ ঈসায়ী সালে ইত্তিকাল হয়ে যাওয়ার পর আহলে রায়, মুরব্বি ও তাবলিগি সাথী মুসলমানদের বিশাল জামাত মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেব (দাঃবাঃ) এর হাতে বাইয়াত হয়ে যান। মুহতারাম মাওলানাও আমীর হিসাবে যিম্মাদারি পালন করে আসছেন। ইসলামি শরিয়তে আছে, মুসলমানদের এক জামাত বাইয়াত হওয়ার দ্বারা আমীর তায়ীন হয়ে যায়। সুতরাং এই বাইয়াত দ্বারাই মুহতারাম মাওলানা আমীর হয়ে গেছেন। তারপর এইভাবে বাইয়াতের ধারা চলতে থাকে। সারা ভারতের পুরানো সাথীদের জোড়ে সবাই মুহতারাম মাওলানাকে আমীর ও যিম্মাদার হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের বিশ্ব ইজতিমায় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের শুরা সাথীদের উপস্থিতিতে মাশওয়ারাতে মুহতারাম মাওলানাকে সারা বিশ্বের যিম্মাদার ও আমীর হিসাবে ফায়সালা হয়। বিভিন্ন জায়গায় বয়ানের শেষে, নিজামুদ্দিনে সব সময় বাইয়াতের ধারা চলতে থাকে। মুসলমানগণ একের পর এক ওনার হাতে বাইয়াত হচ্ছেন। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রথম প্রথম ওই সেই আহলে রায় ও মুরব্বিদের জামাত বাইয়াত দ্বারাই মুহতারাম মাওলানা আমীর হিসাবে তায়ীন হয়ে যান। আমীর তায়ীন হওয়ার জন্য সবার বাইয়াত হওয়া বা সবাইকে জানানোর কথা ইসলামি শরিয়তের কোথাও নেই।

প্রিয় পাঠক, এই জামাতের ওলামায়ে কেরাম আরও বলে থাকেন, অনেকের সংশয় বা প্রশ্ন শরয়ী আমীর হওয়ার জন্য ইসলামি শরিয়তে কিছু শর্ত শারায়ত রয়েছে, মাওলানার মধ্যে কি এসব শর্ত পাওয়া যায়? ওনারা বলেন, শরয়ী আমীর হওয়ার জন্য যেসব শর্ত ফুকাহায়ে কেরাম করেছেন, যেমন, কুরাইশি হওয়া, আহলে বিলায়াত অর্থাৎ মুসলিম, পুরুষ, স্বাধীন, বালেগ ও আকেল অর্থাৎ জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া, পাগল না হওয়া এসবই মাওলানার মধ্যে রয়েছে। অনেকে আলেম হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। অনেকে ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকার শর্তারোপ করেছেন। যদিও ইলম আর ইজতিহাদ জমহুরের মতে আবশ্যিকী কোনো শর্ত নয়, তারপরও এসব শর্তও মাওলানার মধ্যে রয়েছে। তবে ফুকাহায়ে কেরাম যে قوت فاهرة অর্থাৎ জবরদোখলকারী ও শুক্র বাহিনীকে বাহুবলে প্রতিহত করা এবং قوت منفذة হুদূদাত ইত্যাদি কায়েম করার

সক্ষমতা থাকার শর্তারোপ করেছেন সে শর্তটি মূলত উমায়ী ও আব্বাসীয় আমীরগণের ইমারত থেকে হয়তো নেওয়া। কেননা, খুলাফায়ে রাশিদিন তথা অনুসরণীয় খেলাফতে রাশেদার মূল ভিত্তি ছিল দাওয়াত ও জিহাদ। এক মারকায ও এক আমীরের ইতায়াতে থেকে দাওয়াত ও জিহাদের কাজ করে ওনারা ইসলামের প্রচার প্রসার করেছেন। জাহান্নামমুখি মানুষদেরকে জান্নাতমুখি করেছেন। ওনারাও হুদূদাত কায়েম করেছেন। দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে হুদূদাত কায়েম করার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। দাওয়াতের মাধ্যমে তাদের ঈমান ও একিনের এমন হালত ছিল যে, নিজেরাই যিনা ও চুরি শাস্তি দুনিয়াতে ডিসমিস করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম দ্বীন কায়েমের জন্য জান শহিদ করে দেওয়া এবং মাল দৌলত সব খরচ করে দেওয়ার জযবা নিয়ে জামাতবদ্ধভাবে থাকতেন। একতা ও জামাতবদ্ধতার শক্তিতে আল্লাহ তা'আলার নুসরত থাকতো আর কাফেররা এমনিতেই পালাতো। ১৪ শত বছরের ব্যবধানে মুসলমানগণ ঈমানের একিন, আমলের মাজবুতি, জামাতবদ্ধতা, আমীরের ইতায়াত সব হারাতে বসেছে। দীর্ঘ দিন বিশ্বময় মুসলিম জামাত ও জামাতের আমীরের ইতায়াত না থাকতে, থাকতে মানুষের মনে ইতায়াতহীনতার মেযাজ বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং মুসলিমদের জামাত ও তাদের একজন আমীর তৈরি করা যে উম্মতের উপর গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব ও ফরিজা এসব ভুলে গেছে।

সুতরাং বর্তমান প্রতিকূল পরিবেশে সবচে' বড় দায়িত্ব ও কাজ হবে সেটাই যেটা মাওলানা ইলিয়াস রহ. শুরু করেছেন। একটা জামাত তৈরি করে সাহাবাদের মত দাওয়াতের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ে সেই অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। মুসলমানদের ঈমান আমল মজবুত করে আল্লাহর রাস্তায় জান শহিদ করার ঈমান তৈরি করতে হবে। মুসলমানদেরকে ইত্তিহাদ (একতা), জামাতবদ্ধতা, আমীরের ইতায়াত, দাওয়াত এই আমলগুলো শেখাতে হবে। বর্তমানে মুসলিম জামাত ও জামাতের আমীরের এটাই হবে দায়িত্ব। এইভাবে না এগিয়ে যার যার মত করে চলতে থাকলে এবং এই দাওয়াতি ময়দানে ঝাপিয়ে না পড়লে কোনো দিন এক উম্মত গড়ে ওঠবে না। মুসলিম জামাত ও ইমারতের সাহাবাওয়াল পূর্ণ হালত অস্তিত্বে আসবে না। ফিকহের কিতাবগুলোর প্রশিক্ষণ একটা উসূল مَا لَا يَتِمُّ الْوَأْجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ অর্থাৎ, যে মাধ্যম ও অবলম্বন ছাড়া ওয়াজিব অস্তিত্বে আসে না সে মাধ্যম ও অবলম্বনও স্বয়ং ওয়াজিব হয়ে যায়।

তাছাড়া হুদূদাত কায়েম করা এবং শত্রু দলের সাথে যুদ্ধ করাকে ওলামায়ে কেরাম আমীরের দায়িত্ব হিসাবেও উল্লেখ করেছেন। প্রতিকূল পরিবেশে এই হুদূদাত কায়েম না করা এবং যুদ্ধ না করার নজীরও মুসলমানদের স্বর্ণ যুগে রয়েছে। বর্তমানে যদি আবু বকর রাদি. কিংবা ওনাদের কেউ দুনিয়াতে থাকতো তাহলে ওনি ঠিক সেই কাজটিই করতেন যে কাজটি বর্তমানে তাবলিগ জামাত ও জামাতের আমীর করে যাচ্ছেন। ইসলামের প্রথম যামানার মত দাওয়াত ও তাবলিগ করে উম্মতকে উম্মত বানাতেন। শতধা বিভক্ত উম্মতকে এক উম্মত বানাতেন। বর্তমানে এ শর্তটিকে কেন্দ্র করে শরয়ী আমীর হওয়ার বিষয়টি অস্বিকার করে দেওয়া এবং জামাত ও আমীর না বানানো মতো গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব তরকের গুনাহের বুঝা মাথায় নিয়ে চলা আখিরাতে নাজাতের জন্য নিরাপদ রাস্তা নয়। আমীরের ইতায়াত সম্পর্কিত হাদিসের ভান্ডার এবং বাইয়াতবিহীন মারা গেলে জাহিলি মৃত্যু ও জামাতের সাথে থাকার কড়া নির্দেশ এসবকিছুর কারণে কোনো মুসলমান বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারেন না।

ওনারা বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য এইটা নয় যে, মাদ্রাসা খানকা বন্ধ করে সবাইকে এখন তাবলিগ করতে হবে। মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলতেন, যার মাফহূম এরকম, যার যার মত করে শত দলে বিভক্ত হয়ে ইসলামের মেহনত করলে কোনো কাজ হবে না। সবাই একসাথে জামাতবদ্ধভাবে কাজ করা সময়ের বড় ফরিজা ও

ফরজ। সুতরাং বর্তমানে উচ্চতর ইলমের জন্য মাদ্রাসা আবশ্যিক। তবে সাধারণ মুসলমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। আমাদের মারকায আমাদের জন্য যে তারতিব রেখেছেন সে তারতিবের আলোকে মাদ্রাসাও চালাবো এবং দাওয়াতের কাজও করবো এবং এক মারকায ও এক আমীরের ইতায়াতে জামাতবদ্ধভাবে থাকবো। অনুরূপ খানকাওয়ালারা জনবিচ্ছিন্ন না থেকে হাজার হাজার দল না বানিয়ে এক জামাতে এক আমীরের ইতায়াতে থাকবো।

সুতরাং শরীয়তের মেযাজ এবং নবী ও সাহাবাওয়ালা খেলাফত ও ইমারতের হেকমত প্রমান করে তাবলিগ জামাত ও তাবলিগ জামাতের আমীর এবং বর্তমান আমীর মুহতারাম হাফেজ মাওলানা সা'আদ সাহেব (দাঃবাঃ) শরয়ী আমীর।

আরেক জামাত ওলামায়ে কেরাম মনে করেন, মুহতারাম মাওলানা সা'আদ সাহেব শরয়ী আমীর নয়। ওনারা মুহতারাম মাওলানার ইত্তিজামি আমীর হওয়াকে অস্বিকার করছেন না। ওনি তাবলিগ জামাতের ইত্তেযামি আমীর, এই আমীরের গুরুত্বও শরিয়তে রয়েছে। তবে ওনি শরয়ী আমীর নয়। তবে যারা মাওলানা সা'আদ সাহেবকে আমীরই মনে করেন না এবং ওনাকে কে আমীর বানালা এজাতীয় কথা বলে ওনার আমীর হওয়ার বিষয়টিকে উড়িয়ে দেন তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের কাছে তাবলিগ জামাতের কোনো জ্ঞান নেই। তাবলিগ জামাতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কিছুই জানেন না। মুহতারাম মাওলানা আমীর হওয়া, মাওলানা ইনয়ামুল হাসান সাহেবের ইত্তিকাল ও তার পরবর্তী সিদ্ধান্তসমূহ ইত্যাদি কোনো কিছু খবর নেই। এই জন্যে তারা ওনার আমীর হওয়ার বিষয়টি অস্বিকার করেন। এই অজানা ও বেখবর মানুষদের কথা এই ব্যাপারে ধর্তব্য নয়। এখানে যেটা উল্লেখযোগ্য যে, ওলামায়ে কেরামের এক জামাত মনে করেন, মাওলানা সা'আদ সাহেব ইত্তেযামি আমীর। ওনি শরয়ী আমীর নয়। ওনাদের একমাত্র দলিল শরয়ী আমীর হওয়ার জন্য শত্রু পক্ষের আক্রমণ থেকে ইমারতকে টিকিয়ে রাখান জন্য বাহুবল এবং হুদূদাত ইত্যাদি কায়ম করার জন্য সক্ষমতা থাকতে হবে। যেহেতু ওনার এই ক্ষমতা নেই, এই জন্যে মুহতারাম মাওলানা শরয়ী আমীর নয়। যেহেতু ওনি শরয়ী আমীর নয় এজন্যে ওনার হাতে সবার বাইয়াত হওয়াটা আবশ্যিক নয় এবং শরয়ী আমীরের ইতায়াতের জন্য যে সকল হাদিস রয়েছে এবং ইতায়াত না করলে হাদিসসমূহে যে অযীদ রয়েছে, এমনকি বাইয়াতবিহীন মারা গেল জাহিলি মৃত্যু হবে মর্মের যে হাদিসগুলো রয়েছে এসব এই আমীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এসব শরয়ী আমীরের জন্য, ইত্তেযামি আমীরের জন্য নয়।

আমাদের করণীয় :

আমরা এখানে বলবো, মুহতারাম মাওলানা শরয়ী আমীর বা ইত্তেযামি আমীর যেটাই হোক মুসলমানদের একটা ঐক্যবদ্ধ জামাত দরকার এবং এই জামাতের যোগ্য একজন আমীর দরকার। যে জামাত প্রচলিত রুসূম রেওয়াজ বাদ দিয়ে নবী ও সাহাবাদের তর্জে দাওয়াত ও মেহনত করে যাবে। অঞ্চল ভিত্তিক ও দেশ ভিত্তিক সকল বিভাজনের উপরে গিয়ে বিশ্বের সব মুসলমান নিয়ে এক উম্মত গড়ে তুলবে। দাওয়াত ও মেহনত করে এই উম্মত সেই উম্মত হিসাবে গড়ে ওঠবে। দ্বীনের খাতিরে জান ও মাল শহিদ করাটা সহজ হয়ে যাবে। হুদূদাত ও ইজতেমায়ী ভাবে পূর্ণ দ্বীন মেনে চলার যোগ্যত তৈরি হবে। এক আমীর, এক মারকায এবং আলমি এই আমীর ও মারকাযের অধীন যেখানে মুসলমান সেখানে শাখাগত মারকায ও আমীর বা গভর্নর তৈরি হবে। এক উম্মত এক কাজ করে যাবে। একতা ও জামাতবদ্ধতা এবং আমীরের ইতায়াত পুরাপুরি যিন্দা হবে এবং

প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধভাবে আমীরের আদেশে কাফির ও কুফুরির বিরুদ্ধে, দাওয়াতের একটা পর্যায়ের নাম কিতাল, সেই কিতালে ঝাপিয়ে পড়ে শহিদ হয়ে জান্নাত ক্রয় করবে।

সুতরাং প্রথম যেটা প্রয়োজন একটা জামাত ও একজন আমীর। আর ঈমানের মজবুতি ও আমলের উন্নতি এবং জামাতবদ্ধতা। আল্লাহ তা'আলা এই যুগে মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর দ্বারা এই কাজ শুরু করিয়েছেন। এই কাজকে বর্তমানে আল্লাহ তা'আলা অনেক প্রসার করেছেন। বর্তমানে আমভাবে সমস্ত মানুষের দীন পাওয়া, আখিরাতের সফলতা ও জামাতবদ্ধতার জন্য একমাত্র অবলম্বন এই কাজ। এই জামাতের মত দুনিয়াতে দ্বিতীয় কোনো জামাত নেই। মাওলানা ইলিয়াস রহ. শুধু নামায রোযা দাড়ি টুপি যিন্দা করার জন্য এই কাজ শুরু করেননি। মাওলানা বলতেন, যার মাফহুম এরকম, 'আমাকে এক শরিয়ত যিন্দা করার আদেশ করা হয়েছে। আমি এক দীন যিন্দা করার ব্যাপারে আদিষ্ট।' ওনি চাইতেন, সাহাবাদের মত মুসলমানগণ পুরা দীন মেনে চলুক। মুসলমানদের আচার-বিচার সব দীন অনুযায়ী হোক। এখন তো কিছু মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত আমল যিন্দা আছে। তাও অনেক ক্ষেত্রে রুসুম রেওয়াজে ভরপুর। মুসলমানগণ ব্যক্তিগত জীবনে ও ইজতেমায়ী জীবনে এবং আলমি জীবনে বিজাতীয় কালচার ও আদর্শ-মতাদর্শ থেকে একবারে বিচ্ছিন্ন থেকে ইসলামি তরিকায় সব কার্যক্রম পরিচালনা করুক। মুসলমানগণ ঈমান ও আমলে বালিয়ান হয়ে জামাতবদ্ধভাবে পুরা দীন মেনে চলুক। এই ভাবে সমস্ত মুসলমান ঈমান ও আমল নিয়ে এবং এক মারাকায ও এক আমীরের ইতায়াতে থেকে জামাতবদ্ধভাবে দাওয়াত ও জিহাদের কাজ চালিয়ে যাবে।

সুতরাং মুহতারাম মাওলানা শরয়ি আমীর হলে যেভাবে এই জামাতে যুক্ত হয়ে আমাদের জন্য দেওয়া তারতিবের আলোকে কাজ করা জরুরী ও ওয়াজিব হতো, ঠিক ওনি ইন্তেযামি আমীর হলেও এই মহান কাজ ও জামাত থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে থাকা যায়েজ হবে বলে আমরা মনে করি না। কারণ ওনি আমীরুল মুমিনিন না হলেও আমীরুল মুমিনিন হওয়ার রাস্তা এটাই। শতধা বিভক্ত যে যার মত দাওয়াত ও মেহনত করলে কোনো দিন সাহাবাওয়ালা দীন ও জামাত যিন্দা হবে না।

শিক্ষাপ্রদ চমৎকার সাক্ষাৎকার

প্রফেসর : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

মুফতি : ওয়ালাইকুমুস সালাম।

প্রফেসর : মুফতি সাহেব, কিছু বিষয় জানার জন্য আসছিলাম, সময় দিতে পারবেন?

মুফতি : আচ্ছা বলুন কি জানতে চান।

প্রফেসর : ইদানিং দেওবন্দি আলেম কথাটা শুনা যায়, দেওবন্দি আলেম করা? যারা দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে লেখাপড়া করে আলেম হয়েছে তাদেরকে কি দেওবন্দি আলেম বলা হয়?

মুফতি : যেসব আলেম, অর্থাৎ কওমি আলেমগণ যারা আকাবিরে দেওবন্দের চিন্তাধারা লালন করেন তাদেরকে দেওবন্দি আলেম বলা হয়। দেওবন্দ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করুক বা না করুক। আমি দেওবন্দে লেখাপড়া করিনি। কিন্তু আমিও দেওবন্দি আলেম।

প্রফেসর : আকাবিরে দেওবন্দ কারা?

মুফতি : নিকট অতীতে অখন্ড হিন্দুস্তানে অনেক বড় বড় আলেম জন্মেছিলেন। ওনারা সবাই দেওবন্দের ছাত্র শিক্ষক ছিলেন। ওনাদের সবাই মারা গেছেন। ওনাদেরকে আকাবিরে দেওবন্দ বলা হয়।

প্রফেসর : বর্তমানে জীবিত আকাবিরে দেওবন্দ কারা?

মুফতি : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. বলতেন, জীবিত মানুষ ফেৎনায় পতিত হওয়া থেকে নিরাপদ নয়। অনুসরণ করার জন্য মারহুম আকাবির হযরতগণের আদর্শই সবচেয়ে উত্তম। ধরুন, বর্তমানে একজন আলেমের যে অবস্থা ভবিষ্যতে সে অবস্থা বহাল থাকবে কিনা বলা যায় না। তারপরও আমাদেরকে জীবিতদেরকে নিয়ে চলতে হবে যতদিন জীবিতরা আমাদেরকে কুরআন হাদিস মোতাবেক পরামর্শ দিবেন।

জীবিত আকাবিরে দেওবন্দ কারা জিজ্ঞেস করছেন! একটা কথা বলি, আগে অখন্ড হিন্দুস্তানে আলেম ওলামা ও মাদ্রাসা কম ছিল। দেওবন্দ মাদ্রাসা অনেক বড়সড় ও তার নামধাম ছিল। বড় বড় আলেম ওলামা ও যামানার ফকিহগণ যারা আমাদের আকাবির তারা দেওবন্দের সাথে জড়িত ছিলেন। ওনারা বিশ্বময় দ্বীনের খেদমত করেছেন। যেহেতু ওনারা সবাই দেওবন্দের, সেখান থেকেই আকাবিরে দেওবন্দ কথাটা চলে আসে। এখন অনেক মাদ্রাসা হয়েছে, যেমন, দেওবন্দ মাদ্রাসা, ওয়াকফ দেওবন্দ মাদ্রাসা, সাহারানপুর মাদ্রাসা, নিজামুদ্দিনের কাশিফুল উলূম মাদ্রাসা, নদয়াতুল উলামা, করাচির দারুল উলূম, হাটহাজারি মাদ্রাসা, কাকরাইলের মাদ্রাসায়ে দ্বীনিয়া, রাহমানিয়া মাদ্রাসা, মালিবাগ মাদ্রাসা, হাজার হাজার মাদ্রাসা। জীবিতদের মধ্যে যারা আমাদের আকাবিরগণের আদর্শকে ধরে রেখেছেন ওনাদের মধ্যে যারা বড় বড় তারাই এখন আমাদের আকাবিরে ওলামা। আকাবিরে ওলামা হওয়ার জন্য দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র বা উস্তাদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আকাবির হযরতগণের আদর্শকে ধারণকারী যেকোনো মাদ্রাসার বড় বড় আলেম যারা তারাই আমাদের আকাবিরে ওলামা। ওনাদেরকে আকাবিরে দেওবন্দও বলতে পারেন।

প্রফেসর : মুফতি সাহেব, জমহুর ওলামা কারা? জমহুর ওলামা নাকি মাওলানা সা'আদ সাহেব বিরুধী?

মুফতি : আসলে, ফিকহের কিতাবাদিতে জমহুর শব্দটা প্রচুর পাওয়া যায়। কোনো একটা মাসআলার উপর অধিকাংশেরও বেশি আলেম একমত হয়ে যাওয়া, দুই একজন বাদে সব আলেম এই মাসআলায় একমত, তখনই জমহুর শব্দটা বলা হয়। জমহুর এই মাসআলায় একমত। জমহুর ওলামা মাওলানা সা'আদ সাহেব বিরুধী কথাটা সত্য বলা যায় না। ক'দিন আগে ভারতে সা'আদ সাহেবের একেক ইজতেমায় ৩০ হাজার ৪০ হাজার আলেম জমা হয়েছে। সাহারানপুর মাদ্রাসা, দেওবন্দ মাদ্রাসা, নদয়াতুল উলামা, এই মশহুর তিনটি মাদ্রাসার অনেক ওলামা সা'আদ সাহেব বিরুধী নয়। মাদ্রাসা তো আরও হাজার হাজার আছে। বাংলাদেশের হালত আর কি বলবো, হাজার হাজার ওলামা সা'আদ সাহেবকে মহব্বত করেন এবং ওনারা মনে করেন, সা'আদ সাহেব পাতানো ষড়যন্ত্রের শিকার। রাজধানির বাইরের বহু মাদ্রাসা বিস্তারিত কিছুই জানে না। ঢাকার একটা মাদ্রাসার অফিসে কয়েকজন আলেমের সাথে কথা বললাম, ওনারা বিস্তারিত কিছুই জানেন না। এতটুকু বলছে, সা'আদ সাহেব মারাত্মক কিছু ভুল করে ফেলেছে। বললাম, কি ভুল দুই একটা বলেন তো। পেপার পত্রিকায় প্রচারিত কয়েকটা ভুলের কথা বললো। আমরা মাওলানার ভুলগুলোর তাহকিক করে দেখেছি, মাওলানা কোনো ভুল করেননি। যা প্রচারিত আছে, এর অনেকগুলো বিকৃত ও মিথ্যা, আর অনেকগুলো ভুল নয়, বরং এই কাজের উসূল।

এইতো বললাম, দুই দেশের কথা। আমি সরাসরি ইন্দোনেশিয়ান দুই জন আলেমকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের দেশের আলেম ওলামা কি সা'আদ সাহেব বিরুধী? ওনারা বললেন, সবাই সা'আদ সাহেব ও নিজামুদ্দিনের সাথে জুড়ে আছে, ৫ পার্সেন্ট আলেম হবে মুখালিফ। আমরিকা মারকাযের একজন মুফতি সাহেব বয়ান করলো এবং নিজামুদ্দিন ও সা'আদ সাহেবের

ইত্যাতে কথাই বললো। আলমি আন্দায়ে হিসাব কষলে মনে হয় জমহুর আলেম ওলামা নিজামুদ্দিন ও সা'আদ সাহেবের ইত্যাতেই আছে। দুই এক জন বাদে বিশ্বের সব আলেম সা'আদ সাহেব বিরোধী এই কথাটা কতটুকু সত্য আপনিই বুঝতে পারছেন। বিশ্ব বাদ দেন। বাংলাদেশের সব আলেম কি সা'আদ বিরোধী? প্রফেসর সাহেব, জমহুর সা'আদ সাহেব বিরোধী, কথাটা অত সহজ নয়। এটা ধোকা দেওয়ার একটা মন্ত্র। তাছাড়া শুধু ঢাকার কিছু আলেম আর ভারত-পাকিস্তানের কিছু আলেম দ্বারা জমহুর হয়ে যায় না। সারা বিশ্বের এবং চারো মাযহাবের সব আলেম সবাইকে একত্র করে এবং ঘটনা প্রবাহের হাকিকত জানিয়ে হিসাব কষলে জমহুর কোন দিকে যায় আল্লাহই ভালো জানেন।

প্রফেসর : আপনে বলছেন, সা'আদ সাহেব কোনো ভুল করেননি। অনেক আলেম বলছেন, সা'আদ সাহেব ইলিয়াস রহ. এর তরিকায় নাই। তিনি ইলিয়াস রহ. মালফূজ মানেন না।

মুফতি : কোন মালফূজ মানলেন না, বলেন তো।

প্রফেসর : ইলিয়াস রহ. বলে গেছেন “জামইয়্যাতের জন্য শুরা খুব দরকার। এই কাজ শুরা ভিত্তিক চলবে।” সা'আদ সাহেব তো শুরা মানেন না। আলমি শুরা মানলেই তো সব শেষ হয়ে যায়।

মুফতি : যারা বলে সা'আদ সাহেব ইলিয়াস রহ. এর এই মালফূজটি মানেন না তারা ইলিয়াস সাহেবকে চিনে

নাই, ইলিয়াস সাহেবের কাজকেও চিনে নাই, ইলিয়াস সাহেবের এই বাণীটাকেও বুঝে নাই। জামইয়্যাত অর্থাৎ একতা ও জামাতবদ্ধতার জন্য শুরা দরকার। তিনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এই শুরা ইমারতকে বাদ দিয়ে নয়। আমীরই শুরা কায়েম করবে। পরামর্শ করে কাজ করবে। তিনি আমীর বাদ দিয়ে শুধু পরামর্শ ও শুরার কথা বলেননি। আমীরের অধীন শুরা ও পরামর্শের কথা বলেছেন। এই জন্যে সারা জীবন তিনি নিজেই আমীর ছিলেন এবং পরামর্শ করে কাজ করেছেন। ইত্তিকালের পূর্বে ওনার সুযোগ্য সাহেবযাদা মাওলানা ইউসুফ রহ.কে আমীর নির্ধারণ করে গেছেন।

প্রফেসর : মুফতি সাহেব, আপনি ঠিকই বলেছেন, আচ্ছা, আমার একটা সংশয়, ইলিয়াস রহ. রাইপুরি রহ. এর খানকায় গিয়ে বলতেন, হযরত, আওয়ামদের সাথে বাইরে চলতে চলতে যে ময়লা কলবে জমেছে সে ময়লা পরিস্কার করার জন্য আপনার দরবারে এসেছি। এর থেকে বুঝা যায়, তিনি তাসাউফের মেহনতকে কদর করতেন, এবং তিনি নিজেই তাসাউফের মেহনত থেকে উপকার হাসিল করতেন। তিনি নিজে পীরের কাছে বাইয়াত হয়েছেন। খেলাফতও পেয়েছেন। কিন্তু সা'আদ সাহেবের কিছু কথা এই তাসাউফের তকিকার খেলাফ মনে হয়। যেমন তিনি বলে থাকেন, একজন পীর মুরিদকে দিয়ে যে কাজ করাবে সে কাজ আমাদের দাওয়াত ও তাবলিগের মধ্যেও আছে।

মুফতি : প্রফেসর সাহেব, একটা কাজকে পুরাপুরি না চিনলে এরকমই একের পর এক সংশয় সৃষ্টি হতে

থাকবে। রাইপুরি রহ. কে তিনি এই কথা বলে ওনাকে কাজে লাগানোর হেকমত করেছেন মাত্র। কিংবা ওনাকে খুশি করতে চেয়েছেন। কিংবা ব্যক্তিগত কিছু ফায়দা হয় বলে স্বীকারও করেছেন। মাওলানার মনের তামান্না ছিল সব আলেম ওলামা এই কাজে লেগে যাক। দ্বীনের অন্য শো'বা যেহেতু বর্তমানে খুব জরুরী, এই জন্যে কোনো শো'বা বাদ দেওয়া যাবে না। সব শো'বা সচল রেখেই আলেম, গাইরে আলেম, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাই এক জামাত হয়ে এক মেহনত যিন্দা করতে হবে। রাইপুরি রহ.কে বলা মাওলানার এই কথাটিকে মাওলানার সারা জীবনের কাজকর্ম দেখে বুঝতে হবে। অন্যান্য মালফূজে তিনি কী বলেছেন সেটাই লক্ষ রাখতে হবে। তিনি আসলে পীর-মুরিদ যিন্দা করতে চাইতেন না। সাহাবাদের মত দাওয়াত দেওয়ার এক জামাত চাইতেন। তাসাউফের তরিকায় কাজকর্ম থেকে ওনার মন যে ওঠে গেছে স্পষ্ট করে অন্যান্য মালফূজে বিদ্যমান রয়েছে।

তিনি ইসলামের জন্য সাহাবাদের সার্বজনীন তরিকা যিন্দা করতে চাইতেন। তবে তিনি এই তরিকাগুলোকে মন্দও বলতেন না।

কারী তৈয়ব সাহেব রহ. লিখেছেন, যার সারমর্ম হলো, তাসাউফ ও পীর-মুরিদের মধ্যে যাকিছু আছে সবকিছু এই তাবলিগ জামাতের মধ্যেও আছে। আচ্ছা এবার বলুন, প্রফেসর সাহেব, সা'আদ সাহেব কি কোনো নতুন কথা বলেছেন?

প্রফেসর : না, ওনি তো নতুন কোনো কথা বলেননি। আমার মনে হচ্ছে আন্দায়ে সারা জীবনের মেহনতের মোড় পাল্টানো ঠিক হবে না?

মুফতি : অবশ্যই, আসল কথা হলো, অনেকে, এমনকি অনেক পুরানো তাবলিগ করণেওয়ালাও মনে করে, তাবলিগ তো শুধু নামায রোযা যিন্দা করার মেহনত। যারা কালিমা জানে না তাদেরকে কালিমা শিখানোর মেহনত। এইটা একটা ভুল ধারণা। তাবলিগ শুধু নামায রোজা যিন্দা করার মেহনত নয়। ইলিয়াস সাহেব দ্বীনের অপূর্ণ মেহনত শুরু করেননি। তিনি অনুসরণীয় যুগের খলিফাদের প্রতিনিধিত্ব করে সাহাবাদের জামাত যে কাজ করেছিলেন এরকম কাজকরণেওয়ালা মুসলমানদের জামাত তৈরি করা এবং সাহাবাদের মত কাজ করে যাওয়াই ছিল ওনার উদ্দেশ্য। এগুলো আমি বানিয়ে বলছি না। ওনার মালফূজাত, দ্বীনি দাওয়াত সেখান থেকেই বলছি। এই ভুল ধারণা থেকেই বলা হয় তাবলিগে জিহাদ নেই। তাবলিগিরা রাজনীতি করে না। হাসি ওঠে ভাই, প্রফেসর সাহেব, মনে রাখবেন, নবী ও নবীর খলিফাগণ ও সাহাবাগণ যে রাজনীতি করেছিলেন সে রাজনীতি তাবলিগওয়ালারা করে যাচ্ছেন। এক কথায় দ্বীনের পূর্ণ মেহনত করে যাচ্ছেন।

প্রফেসর : আমার মনে কিছু সংশয় ছিল, আল-হামদু-লিল্লাহ, এখন দূর হয়ে গেছে। শুকরান।

মুফতি : সন্দেহ আবার জন্মে নিতে পারে। তাবলিগি কাজটিকে ভালো করে বুঝে নিন। বুঝমান মেহনত করণে ওয়ালা পুরানো সাথীর সাথে মুজাকারা করে নিজে ভালো করে মুতামায়িন হোন। নিজামুদ্দিন গিয়ে এবং মেওয়াতিদের থেকে কাজকে আরও ভালো করে বুঝে নিন। তারপর কোমরে গাছমা বেধে দিশাহারা সাথী ও জাতীকে মুতামায়িন করার ফিকিরে নেমে যান। এই ভাবে মেহনত করতে থাকেন। ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করবেন। আমার জন্যও দুআ করবেন, আমাকেও যেন আল্লাহ তা'আলা হক চিনার শক্তি দেন এবং হকের উপর অটল রাখেন। ঈমান নিয়ে যেন জান্নাতি হয়ে মরতে পারি।

প্রফেসর : মুফতি সাহেব, আরেকটা কথা, অনেকে বলে, যেহেতু সা'আদ সাহেব এখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গেছেন। ওনার উপর সবাই মুত্তাফিক না। এখন ওনার অবস্থান থেকে উনি সরে যাওয়া উচিত। এ বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

মুফতি : এইযে বললাম, প্রশ্ন আসতেই থাকবে। আসলে প্রশ্নবিদ্ধ আমীরকে সরানোর দ্বারা মাসআলা হল হবে না। এই কারণে আমীরের জন্য সরে যাওয়াও যায়েজ হবে না। বরং নতুন একটা প্রচলিত রাজনৈতিক পদ্ধতি চালু হওয়ার দরজা খুলবে। যার কারণে কোনো আমীর ইতমিনানের সাথে কাজে মনোযোগি হওয়ার সুযোগ পাবে না। আমীর বানাও আমীর নামাও এর মধ্যেই সমস্ত চিন্তা ফিকির মেহনতের কুওত শেষ হতে থাকবে। প্রফেসর সাহেব, প্রশ্নবিদ্ধ আমীরকে পাল্টানোর মাসআলা আসবে কেন? আমাদের দেখতে হবে হক, না হক। হকের সাথে জুড়ে থাকতে হবে। হক বলতে হবে, যদিও কারো কাছে তিতা লাগে।

প্রফেসর : জাযাকাল্লাহ, আল-হামদু লিল্লাহ, আমি নিজামুদ্দিন মারকাযে যাওয়ার নিয়ত করছি। আমার জন্য দুআ করবেন।

মুফতি : আমার জন্যও দুআ করবেন। অবশ্যই নিজামুদ্দিন সফর করবেন। মাওলানা সা'আদ সাহেবের সাথে দেখা করবেন। আমার সালাম পৌছে দিবেন এবং আমার জন্য দুআর দরখাস্ত করবেন।

বর্তমানে আমাদের করণীয় কী? এখন আমাদের করণীয় ৩ টি।

(১) তাবলিগের হাকিকত বুঝার চেষ্টা করা। বুঝমান আলেম ও সাখীর সুহবত ও মুজাকারার মাধ্যমে এবং মালফূজাত, দ্বীনি দাওয়াত, মাকাতিবে ইলিয়াস রহ. ইউসুফ রহ. এর বয়ান সমগ্র ইত্যাদি বই-পুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যমে তাবলিগের হাকিকত বুঝার চেষ্টা করা। অর্থ সহ কুরআন শরিফ ও হায়াতুস সাহাবাহ নিয়মিত পড়ার মধ্যে রাখা।

মাওলানা মনজুর নোমানি রহ. লিখেছেন,
মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলেছেন,

‘আমাদের এই তাবলিগী আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে বহুত বড় দরজার এক সাধনা। আফসোস!
লোকজন তার হাকিকত বুঝতেছে না।’

(মালফূজাত (উর্দূ): মাওলানা ইলিয়াস রহ. মালফূজ নং-৯৪)

(২) লম্বা লম্বা সময় নিয়ে নিজামুদ্দিন সফর করা। যেখান থেকে কাজ শুরু হয়েছিল, যে মোবারক জায়গা প্রথম হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস রহ. দ্বিতীয় হযরতজি মাওলানা ইউসুফ রহ. তৃতীয় হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. বর্তমান চতুর্থ হযরতজি মাওলানা সা’আদ কান্কালাভি (দাঃবাঃ) এবং সাইয়িদ মাওলানা আবুল হাসান আলি নদভি রহ. আল্লামা মনজুর নোমানি রহ. মাওলানা জফর আহমদ উসমানি রহ. শাইখুল হাদিস যাকারিয়া রহ. সহ আমাদের আকাবিরে দেওবন্দ হযরতগণের পদচারণায় মুখরিত ছিল সেই পুরানো জায়গা নিজামুদ্দিনে গিয়ে, সেখানে লম্বা লম্বা সময় দেওয়া বর্তমান হালাত ও সময়ের বড় প্রয়োজন।

মাওলানা মনজুর নোমানি রহ. লিখেছেন,
মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলেছেন,

‘যারা আমাদের তাবলিগি কাজ এবং তরিকা শিখার জন্য নিজামুদ্দিন আসতে চায় তাদেরকে প্রথমেই এই কয়েকটি কথা ভালোভাবে অবগত করিয়ে দিতে হবে।

(ক) বেশি থেকে বেশি সময় বের করে নিয়ে আসবে।

(খ) এক দুই বার আসাকেই যথেষ্ট মনে করবে না। বরং আসতেই থাকবে।

(গ) এই ইচ্ছা করে আসবে যে, শুধু নিজামুদ্দিনেই পড়ে থাকা নাও হতে পারে। হেদায়াত মোতাবেক বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া লাগবে। হ্যাঁ, এই মধ্যবর্তী সময়ে কখনো কখনো নিজামুদ্দিনে থাকাও হতে পারে।

(ঘ) এটাও তাদেরকে ভালো করে অবগত করিয়ে দিতে হবে যে, যখন তাদের কিছু সঙ্গি বাড়ী ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করতে শুরু করবে এবং তাদের দেখাদেখি তাদের মনেও বাড়ী ফিরার খাহেশ জন্ম নিতে শুরু করবে তখন ওই সময় নিজের খাহেশ মোতাবিক না চলে, হিম্মত ও দৃঢ়তার সাথে কাজের মধ্যে লেগে থাকার সাওয়াব অপসীম।

বাড়ীতে ফিরে না যাওয়া দৃঢ় সাখীদের উদাহরণ আল্লাহর রাস্তার ওই মুজাহিদগণের মত যারা ওই সময় জিহাদের ময়দানে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে যখন তাঁর ডান বামের লোক ভেগে পলায়ন করে।

(ঙ) এটাও বলে দিবে যে, এই রাস্তায় বহুত মছিবত কষ্ট-ক্ল্যাশ স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়াবলি সামনে আসবে। আখিরাতে প্রতিদান এসমস্ত কষ্ট-ক্ল্যাশের নিসবতে মিলবে।’

(মালফূজাত (উর্দূ): মাওলানা ইলিয়াস রহ. মালফূজ নং-৯৫)

(৩) মেওয়াতে যাওয়া, মেওয়াতিদের হক আদায় করা এবং তাদেরকে মহব্বত করা। নিজামুদ্দিনে গিয়ে নিজের কোনো আমিত্ত্ব ধরে না রাখা। এই বিশাল জামাতের প্রথম কাজকরণেওয়ালা মেওয়াতি মুসলমানদের সাথে মিশা, একজন আরেকজন আপোষে সবকিছু বিনিময় করে বুঝাপড়া করা। ওনাদেরকে মহব্বত করা। ওনাদের থেকে কাজের মেয়াজ সিফাত এবং তারতিব ওনাদের মহল দেখে শিখা।

মাওলানা মন্জুর নোমানি রহ. লিখেছেন, দাওয়াত ও তাবিলগের আন্দোলনে শুরু থেকেই কাজ করণেওয়ালা দুইজন মুখলিছ মেওয়াতিদের দিকে ইশারা করে একদিন

মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলেছেন,

‘এই তাবিলগি কাজের নিসবত দাওয়াতের কারণে আমার দিকে হয়ে গেছে। নতুবা কাজ করণেওয়ালা মূলত এ লোকগুলোই। আমি চাই, যারা এই কাজের কারণে আমাকে মহব্বত করে থাকে তারা যেন মহব্বতের রোখ এই সমস্ত লোকের দিকে করে। যদিও এর জন্য তাদের মনে চাপ সৃষ্টি করতে হয়। মেওয়াতিদের মহব্বত করা এবং তাদের খিদমত করা কবুলিয়াতের উছিলা।’

(মালফূজাত (উর্দূ): মাওলানা ইলিয়াস রহ. মালফূজ নং-১০৬)

এই ধারাবাহিকতায় তিনি আরও বলেছেন,

‘আমার উপর এইসব লোকের (মেওয়াতিদের) অনেক হক রয়েছে। আমি তাদের হকসমূহ আদায় করতে পারিনি। আমাকে যারা মহব্বত করে তারা যেন তাদের হক চিনে নেয়।

(মালফূজাত (উর্দূ): মাওলানা ইলিয়াস রহ. মালফূজ নং-১০৭)

তিনি আরও বলেছেন,

দ্বীনের নিয়ামত যেই মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে তার শুকরিয়া ও স্বীকৃতি এবং তার মহব্বত না করা বঞ্চিত হওয়ার আলামত।

হুযুর সা. বলেছেন,

من لم يشكر الناس لم يشكر الله

অর্থঃ যে ব্যক্তি নিজের উপর ইহসানকারী মানুষদের শুকুর আদায় করে না সে আল্লাহ তা’আলারও শুকুর আদায় করে না।

আবার তাদেরকেই আসল দাতা মনে করা হলো শিরক ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আলামত। প্রথমটা (শুকুর না করা) তাফরিত অর্থাৎ ছাড়াছাড়ি, দ্বিতীয়টা (আসল মনে করা) ইফরাত অর্থাৎ বাড়াবাড়ি। উভয়ের মধ্যখানে হলো সিরাতে মুস্তাকিম অর্থাৎ সঠিক রাস্তা।

(মালফূজাত : মাওলানা ইলিয়াস রহ. (উর্দূ) মালফূজ নং-১৪৮)

তিনি আরও বলেছেন,

ভাইগণ, লোকদের দ্বারা দ্বীনের উপর আমল করানোর জন্য প্রথম তাদের মধ্যে হাকিকি ঈমান, আখিরাতে ফিকির এবং দ্বীনের কদর পয়দা করো। আল্লাহ তা’আলার দান বহুত বড়। কিন্তু তাঁর দরবারে গাইরতও রয়েছে। তিনি কদর না করণেওয়ালাদেরকে দান করেন না। তোমরাও নিজেদের বড়দের নিকট থেকে দ্বীনকে কদরদানির সাথে নাও এবং এই কদরের চাহিদা এটাও যে, তাদেরকে

নিজেদের জন্য অনেক বড় উপকারী মনে করতে হবে। পুরাপুরিভাবে তাদের ইজ্জত ও সম্মান করো।
এইটাই এই হাদিসের উদ্দেশ্য যে হাদিসে হুযুর সা. বলেছেন,

من لم يشكر الناس لم يشكر الله

অর্থঃ যে ব্যক্তি নিজের উপর ইহসানকারী মানুষদের শুকুর আদায় করেনি সে আল্লাহ তা'আলারও শুকুর আদায় করেনি।

(মালফূজাত (উর্দূ) : মাওলানা ইলিয়াস রহ. মালফূজ নং-১৪২)

সমাপ্ত

الله الحمد في النهاية كما في البداية

‘আল- জাদ্দু পাবলিকেশন্স’ থেকে প্রকাশের পরিকল্পনায় রয়েছে নিম্নের ৩ টি কিতাব

১. ওলামায়ে কেরামের লিখিত কুরআন তরজমা সাধারণ শিক্ষিত মানুষের বুঝার জন্য এবং মোটামুটিভাবে কুরআনের তরজমা করার যোগ্যতা হাসিলের জন্য প্রয়োজনী ও গুরুত্বপূর্ণ তাফসির নিয়ে অনদব্য এক সংকলন-----

لفظا لفظا تعليم القرآن والترجمة

লাফজান লাফজান তা'লিমুল কুরআন ওয়াত তারজামা
(শব্দে শব্দে কুরআন ও অনুবাদ শিক্ষা)

২. হযরতজি মাওলানা সা'আদ সাহেব (দাঃবাঃ) হায়াতুস সাহাবার তা'লিমে হাদিসের যে তাকরির ও তাশরিহ করে থাকেন সেসব তাকরির ও তাশরিহের অনবদ্য সংকলন-----

تقرير حياة الصحابة

তাকরিরে হায়াতুস সাহাবা

হযরতজি হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ সা'আদ হাফিজাছল্লাহ

৩. কুরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে তাবিজ-কবজ, ঝাড়ফুক ও জ্বিন তাড়ানো।